মার্কসীয়-লেনিনীয় তত্ত্ব

ল. লেওন্তিয়েভ

অর্থশাস্ত্র

সংক্ষিপ্ত পাঠ্যধারা

মার্কসীয়-লেনিনীয় তত্ত্ব

ল. লেওন্তিয়েভ

প্রগতি প্রকাশন · মস্কো ১৯৭৫

অনুবাদ: বিষ্ণু মুখোপাধ্যায়

Л. ЛЕОНТЬЕВ

КРАТКАЯ

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИЯ

На языке бенгали

সোভিয়েত ইউনিয়নে মুদ্রিত

Л $\frac{10701-897}{014(01)-75}$ 700—75

সূচি

পুঁজিতান্ত্রিক ব্যবস্থা

সমাজতন্ত্র এবং কমিউনিজম

প্রথম পরিচ্ছেদ

অর্থশাস্ত্রের বিষয়বস্তু

যেকোন বিজ্ঞান অধ্যয়ন শুরু করার আগে তার বিষয়বস্তুটা নির্ণয় করা অবশ্যপ্রয়োজনীয়।

মানবসমাজ বিকাশের বিভিন্ন পর্বে তার বৈষয়িক জীবনোপায় উৎপাদন আর বণ্টনের নিয়ামক নিয়মাবলি নিয়ে যে-বিজ্ঞান সেটা হল অর্থশাস্ত্র। এর বিষয়বস্তু হল উৎপাদনের সামাজিক গড়ন।

প্রকৃতিবিজ্ঞান এবং সমাজবিজ্ঞান

চারদিককার জগৎটা রয়েছে মানুষের ইচ্ছা কিংবা চেতনা থেকে স্বাধীনভাবে বিদ্যমান এবং মানুষ নিজেই তার একটা অংশ, — বিভিন্ন বিজ্ঞান এই জগৎটাকে বুঝবার সহায়ক। প্রকৃতি আর সমাজজীবন দুইই জুড়ে আছে এই জগৎটা। মানুষের ক্রিয়াকলাপের বিভিন্ন ক্ষেত্রের বিকাশের নিয়মাবলি

পরীক্ষা-অনুসন্ধান করে যেসব সমাজবিজ্ঞান সেগুলির একটা হল অর্থশাস্ত্র।

সমাজজীবন সম্বন্ধে বিজ্ঞানসম্মত জ্ঞানলাভের সম্ভাবনাটাকে একেবারেই বাতিল করে দিয়ে কেউ-কেউ বলে, প্রাকৃতিক বিকাশের নিয়ামক হল বিভিন্ন যথাযথ নিয়ম, সেখানে একরূপ অবস্থা থেকে সবসময়ে একরূপ ফল সৃষ্টি হয় — সামাজিক বিকাশ প্রাকৃতিক বিকাশ থেকে একেবারেই অসদৃশ। তারা বলতে চায়, সমাজজীবনে প্রাকৃতিক বিকাশের ক্ষেত্রের মতো ব্যাপার ঘটে না — এখানে সবকিছুই আকস্মিক, স্বতঃস্ফূর্ত, কিছুরই পূর্বসংকেত করা যায় না। তার থেকে সিদ্ধান্ত আসে যে, বড়-বড় মনীষী, শাসক, সেনাপতি, ইত্যাদি বিশিষ্ট ব্যক্তিই ইতিহাস গড়ে তাদের মর্জিমাফিক।

এটা ডাহা ভুল। মানুষে ইতিহাস সৃষ্টি করে বটে, উপর-উপর মনে হতে পারে সামাজিক বিকাশ হল বিভিন্ন আকস্মিক ঘটনার ধারা। কিন্তু, তাই বলে, বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সমেত লোকের কার্যকরণের যথার্থ মূল কারণগুলো অবধারণ করা অসম্ভব, তা নয়। সামাজিক বিকাশের বিজ্ঞানসম্মত বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, আপাতদৃষ্টিতে যেটাকে মনে হয় যেন বিভিন্ন অসংলগ্ন ব্যাপারের ধারা, তাতে কাজ করে বিভিন্ন মূর্ত-নির্দিষ্ট নিয়ম। সেক্ষেত্রে, সমাজজীবন সম্বন্ধে বিচার-বিশ্লেষণ প্রকৃতির বিকাশ বিচার-বিশ্লেষণের চেয়ে কম সার্থক হবার নয়।

তাহলে, কিছু লোকে কেন বলে সমাজজীবন সম্বন্ধে বিজ্ঞানসম্মত জ্ঞানলাভ করা অসম্ভব?

কারণটা স্পষ্ট। যেহেতু খাঁটি সমাজবিজ্ঞান দেখিয়ে দেয় যে, পুঁজিতন্ত্রের ঐতিহাসিক বিনাশ এবং কমিউনিজমের জয় অবশ্যম্ভাবী, তাই পুঁজিতান্ত্রিক দেশগুলির শাসক শ্রেণীগুলি সেটাকে প্রত্যাখ্যান করে। যা তাদের আধিপত্যের সাফাই গায়,

তাদের বিশেষ সুবিধা-অধিকারগুলোকে রক্ষা করে এবং পুঁজিতান্ত্রিক ব্যবস্থা চিরন্তন বলে দৃঢ়োক্তি করে, কেবল সেই 'বিজ্ঞানকেই' তারা মানে। বুর্জোয়া মতাদর্শবাদীরা বলে, নিম্নতর থেকে উচ্চতর রূপে সমাজের গতি নিয়মনের সামাজিক বিকাশের কোন নিয়ম নেই।

কিন্তু, সামাজিক বিকাশের নিয়মাবলি আবিষ্কার করতে, সমাজবিজ্ঞানের সাচ্চা স্ফুরণে শ্রমিক শ্রেণী চূড়ান্ত মাত্রায় আগ্রহশীল। মার্কসবাদ-লেনিনবাদ হল এমন বিজ্ঞান—কেননা, সমাজজীবন নিয়ে বিচার-বিশ্লেষণকে সুষ্ঠু বিজ্ঞানসম্মত জমিনে স্থাপন করেছে সর্বপ্রথমে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ। শ্রমিক শ্রেণীর সংগ্রামের চড়ে-চলা চাহিদার ফলে এটা দেখা দেয়।

মানুষের চিন্তন-মননের ইতিহাসে সেই প্রথম সামাজিক বিকাশের নিয়মাবলি প্রকাশ করল বিজ্ঞানসম্মত কমিউনিজমের তত্ত্বই। এইসব নিয়ম সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করে শ্রমিক শ্রেণী নিপীড়ন আর দাসত্বের বিরুদ্ধে, মুক্তি আর মানুষের পক্ষে উপযুক্ত জীবনের জন্যে সংগ্রামে অজেয় অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে গেল।

মার্কসবাদ-লেনিনবাদের মতাবস্থান এই যে, প্রকৃতির মতো মানবসমাজেরও বিকাশ চলে বিভিন্ন মূর্ত-নির্দিষ্ট নিয়ম অনুসারে। এগুলি বাস্তব নিয়ম, সেই হিসেবে তা মানুষের ইচ্ছা আর চেতনার সাপেক্ষ নয়। অধিকন্তু, শেষপর্যন্ত সেগুলিই নির্ধারণ করে চেতনা আর ইচ্ছা এবং, কাজেই, সমাজে মানুষের কার্যকরণ।

সমাজজীবন জটিল এবং বহুমুখী। মার্কসবাদ প্রমাণ করেছে যে, সামাজিক সম্পর্কগুলোর মোট সমষ্টিতে আর্থনীতিক সম্পর্কগুলি একটা বিশেষ ভূমিকায় থাকে। সেগুলি বুনিয়াদী আর মুখ্য, সেইভাবে তা অন্যান্য সমস্ত সম্পর্ক নির্ধারণ করে।

সমাজজীবনের বনিয়াদ — বৈষয়িক উৎপাদন

সমাজজীবনের আর্থনীতিক অবস্থা নির্ভর করে সর্বোপরি বৈষয়িক উৎপাদনের উপর। খাদ্য, কাপড়-জামা, আশ্রয় এবং অন্যান্য অত্যাবশ্যক বৈষয়িক জীবনোপায় ছাড়া মানুষের চলতে পারে না — ঐ সবকিছুই মানুষের শ্রমের সৃষ্টি। বৈষয়িক জীবনোপায়গুলো সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে মানুষের যে শ্রম-ক্রিয়াকলাপ, তাকে বলা হয় উৎপাদন।

বৈষয়িক উৎপাদনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে শ্রম ছাড়াও, সামাজিকভাবে কেজো অন্যান্য ক্ষেত্রে কর্মরত মানুষের শ্রমও সমাজের পক্ষে খুবই গুরুত্বসম্পন্ন। সেটা হল শিক্ষক, ডাক্তার, বিজ্ঞানী, শিল্পী, ম্যানেজার, আইন-বলবৎ-করার অফিসার, ইত্যাদিদের শ্রম।

আধুনিক বৈজ্ঞানিক আর প্রযুক্তিগত বিপ্লবের ফলে বিজ্ঞানীদের কাজ এবং গবেষণার ইনস্টিটিউট আর প্রতিষ্ঠানগুলির ক্রিয়াকলাপ চূড়ান্ত গুরুত্বসম্পন্ন। বিভিন্ন গবেষণা আর উন্নয়ন সংগঠন, কারখানার ল্যাবরেটরি এবং ফলিত বিজ্ঞানে ব্যাপৃত বিশেষিত ইনস্টিটিউটগুলিই শুধু নয়, বিজ্ঞানের বুনিয়াদী গবেষণার কেন্দ্রগুলি সম্বন্ধেও ঐ কথা প্রযোজ্য। যেমন, আধুনিক গণিত ছাড়া পৃথিবীর কৃত্রিম উপগ্রহ, মহাকাশযান, বিভিন্ন স্বয়ংক্রিয় মেশিনটুল আর স্বয়ংক্রিয় নিয়ন্ত্রণব্যবস্থার ডিজাইন করা এবং সেগুলি নির্মাণ করা অসম্ভব হত।

উৎপাদনের প্রধান-প্রধান উপাদান

অতি প্রাচীন কাল থেকে এখন অবধি মানুষের উৎপাদন-প্রতিবেশের বিপুল উন্নতি হয়েছে। আদিম যুগে মানুষে ব্যবহার করত অতি সাদাসিধে বিভিন্ন হাতিয়ার: পাথর আর দন্ড, তা

দিয়ে তারা গাছ থেকে ফল পাড়ত, মূল-কন্দ খুঁড়ে তুলত — এইভাবে প্রাণধারণ করত। এখন প্রকাণ্ড-প্রকাণ্ড কলে-কারখানায় নিযুক্ত মানুষ হাজার-হাজার রকমের জিনিস উৎপন্ন করে।

মনে হতে পারে, আদিম মানুষ এবং এখনকার মানুষের উৎপাদন-ক্রিয়াকলাপের মধ্যে বুঝি একেবারে কোন মিল নেই। কিন্তু, বিজ্ঞান প্রমাণ করেছে, সমাজবিকাশের সমস্ত পর্বেই বৈষয়িক সম্পদ উৎপাদনের প্রক্রিয়ায় তিনটে মূল উপাদান সবসময়েই থেকেছে: মানুষের শ্রম, শ্রমের বস্তু এবং শ্রমের উপকরণ। শ্রম হল মানুষের উদ্দেশ্য অনুযায়ী ক্রিয়াকলাপ; শ্রমের বস্তু হল যার উপর মানুষের শ্রম প্রয়োগ করা হয় সেই জিনিস, আর শ্রমের বস্তুর উপর যার সাহায্যে মানুষ কাজ করে সেটা হল শ্রমের উপকরণ।

এই উপাদানগুলোকে আরও খুঁটিয়ে দেখা যাক।

শ্রম

শ্রম হল প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সংগ্রাম। প্রকৃতির রাজ্যে পাওয়া বিভিন্ন বস্তুকে নিজের প্রয়োজনের উপযোগী করে নেবার জন্যে পশুর শক্তি, স্টীম, বিদ্যুৎ, রাসায়নিক বিক্রিয়া এবং প্রকৃতির অন্যান্য বল মানুষ প্রয়োগ করে এই সংগ্রামে।

শ্রম মানবজীবনের একটা স্বাভাবিক অবস্থা। একটার জায়গায় অন্য সামাজিক-আর্থনীতিক গঠন আসে, কিন্তু মানবসমাজের অস্তিত্বের একটা অপরিহার্য অবস্থা হিসেবে শ্রম থাকে সবসময়েই।

শ্রম একান্তই মানুষের ধর্ম। মানুষের শ্রমের দুটো বুনিয়াদী উপাদান আছে: এক, এটা হল আগে-ধার্য লক্ষ্য সাধনের জন্যে উদ্দেশ্য অনুযায়ী ক্রিয়াকলাপ, আর দুই, শ্রমের হাতিয়ার

উৎপাদনের সঙ্গে এটা অপরিহার্যভাবে সংশ্লিষ্ট। আঠারো শতকের আমেরিকার রাষ্ট্রনায়ক এবং লেখক বেঞ্জামিন ফ্র্যাঙ্কলিন বলেছিলেন যে, মানুষ এমন একটা প্রাণী যে হাতিয়ার উৎপন্ন করে, এটাকে মার্কস সঠিক বলেই বিবেচনা করেছিলেন।

একদিকে, আদিম মানবসমাজ, এবং অন্যদিকে, দীর্ঘ অভিব্যক্তি-প্রক্রিয়ার ফলে যা থেকে মানুষের উদ্ভব হয়েছিল সেই বনমানুষের পাল, এই দুইয়ের মধ্যে সারমূলক পার্থক্য হল শ্রম।

শ্রম এমন একটা প্রক্রিয়া, যার কল্যাণে মানুষের উদ্ভব হল প্রাণিজগৎ থেকে, শুধু তাই নয়, এটা এমন প্রক্রিয়া যা মানুষকে বাস্তবে মিলিত করে বিভিন্ন মূর্ত-নির্দিষ্ট বর্গে কিংবা সমাজে। মানুষের উৎপাদনকর ক্রিয়াকলাপ, প্রকৃতির বিরুদ্ধে মানুষের সংগ্রাম সবসময়েই চলে বিভিন্ন বিশেষ-নির্দিষ্ট সামাজিক সম্পর্কের কাঠামের মধ্যে, তার বনিয়াদ হল শ্রম। তার ফলে মানবসমাজ যার উপর রয়েছে সেই ভিত্তিটা হল শ্রম।

শ্রমের বস্তু

আগেই বলা হয়েছে, যার উপর মানুষের শ্রম প্রয়োগ করা হয়, এমন সমস্ত জিনিসই শ্রমের বস্তু। সেগুলি হতে পারে প্রকৃতির রাজ্যে পাওয়া বস্তু কিংবা এমন বস্তু, যার উপর কিছু শ্রম প্রয়োগ করা হয়েছে। একই বস্তু আকারণের অনেক পর্বের ভিতর দিয়ে যেতে পারে, অনেক পর্বে তাতে মানুষের শ্রম প্রয়োগ করা যেতে পারে। কাজেই, সমস্ত ক্ষেত্রেই সেটা হবে শ্রমের বস্তু।

শ্রমের সর্বব্যাপী বস্তু হল — খনিজ সম্পদ আর জলভাগগুলি সমেত ভূমি। প্রকৃতি যেন একটা সুবিশাল ভাণ্ডার, যাতে রয়েছে শ্রমের বস্তুর অফুরন্ত মজুদ। ভূমি এবং সাগর আর মহাসাগর

যাতে এইসব শ্রমের বস্তু যোগায় তার ব্যবস্থা করাটা হল মানুষের করণীয় কাজ।

ভূমি, তার খণিক সম্পদ, মাটি আর জলবায়ু হল প্রাকৃতিক অবস্থাগুলোর একটা সমষ্টি, যা রয়েছে মানবসমাজের আয়ত্তির মধ্যে।

শ্রমের উপকরণ

শ্রম-প্রক্রিয়ায় মানুষ এবং শ্রমের বস্তুর মধ্যে যেসব জিনিস লাগান হয় সেগুলি হল শ্রমের উপকরণ, — যাকিছুর সাহায্যে মানুষ শ্রমের বস্তুগুলোর উপর কাজ ক'রে সেগুলোকে রূপান্তরিত করে সেইসবই পড়ে শ্রমের উপকরণের মধ্যে।

শ্রমের উপকরণগুলো যতক্ষণ সাদাসিধে ততক্ষণ সেগুলোর ভূমিকা স্পষ্টপ্রতীয়মান — যেমন, খুদে হস্তশিল্পের উৎপাদনে। কিন্তু, অতি সূক্ষ্ম-জটিল যন্ত্রপাতিতে সজ্জিত আধুনিক বৃহদায়তনের উৎপাদনেও সেটা প্রযোজ্য। একটা বিশাল ব্ল্যাস্ট ফার্নেস কিংবা ধাতু-আকারণের একটা প্রকান্ড মেশিনটুল, একটা স্বয়ংক্রিয় লাইন কিংবা কোন রাসায়নিক কারখানার জটিল সরঞ্জাম — এইসবই শ্রমের উপকরণ, যা দিয়ে মানুষ শ্রমের বস্তুর উপর ক্ষমতা খাটায়।

বৈষয়িক উৎপাদনের বিকাশে একটা বিশেষ গুরুত্বসম্পন্ন ভূমিকা পালন করে শ্রমের হাতিয়ার। এগুলি হল শ্রমের উপকরণ, এগুলিকে বলা যায় মানুষের হাত, পা আর মস্তিষ্ক — এইসব স্বাভাবিক অঙ্গের সঙ্গে সংযোজিত অংশ। শ্রমের হাতিয়ারগুলি ইতিহাসে উন্নয়নের একটা দীর্ঘ পথ পার হয়ে এসেছে: আদিম মানুষের পাথর আর দণ্ড থেকে উৎপাদনে, বিজ্ঞানে আর ব্যবস্থাপনে ব্যবহৃত নানা সূক্ষ্ম-জটিল যন্ত্র আর কলকব্জা, ইলেকট্রনিক কম্পিউটার আর নিয়ন্ত্রণ-স্থাপনা পর্যন্ত।

উৎপাদনের উপকরণ

শ্রমের বস্তু এবং উপকরণ, এই দুইয়ে মিলে উৎপাদনের উপকরণ। সমাজ যত বিকশিত হয়, মানুষের শ্রম দিয়ে সৃষ্টি করা উৎপাদনের উপকরণের তাৎপর্যও ততই বাড়ে। সেগুলিতে মূর্ত হয় অতীতের শ্রম। অর্থশাস্ত্রে এই শ্রমকে বলা হয় মূর্ত শ্রম। কিন্তু, উৎপাদনের উপকরণগুলোতে মানুষের শ্রম না লাগানো অবধি সেগুলো এক-গাদা জড় বস্তু ছাড়া কিছু নয়। কাজেই, যেকোন উৎপাদন-প্রক্রিয়ার একটা অপরিহার্য কড়ার হল শ্রমশক্তির সঙ্গে উৎপাদনের উপকরণের মিলন, অর্থাৎ, মূর্ত এবং সক্রিয় শ্রমের সংযোগ।

উৎপাদন-বল

পরস্পর-সক্রিয় উৎপাদনের উপকরণ এবং শ্রমশক্তি মিলে সমাজের উৎপাদন-বল। সমাজের প্রধান উৎপাদন-বল নিশ্চয়ই মানুষ — মানুষের সক্রিয় শ্রমশক্তি।

সমাজের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে উৎপাদন-বলগুলো উন্নততর হয়, বাড়ে। বিজ্ঞান আর প্রযুক্তিবিদ্যার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে শ্রমের হাতিয়ারগুলো আরও নিখুঁত হয়ে ওঠে, উৎপাদনে ব্যবহৃত হতে থাকে ক্রমাগত নতুন-নতুন মালমশলা। আর, তার সঙ্গে সঙ্গে, মানুষের দক্ষতা বাড়ে, উৎপাদনের অভিজ্ঞতা আরও প্রসারিত হয়।

উৎপাদন-বল উন্নয়নের মাত্রা প্রকৃতির উপর মানুষের আয়ত্তির একটা সূচক। কালগতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষ নতুন-নতুন প্রাকৃতিক শক্তিকে বশ করে। সুদূর অতীতে আগুনের আবিষ্কার হয়েছিল প্রকৃতির উপর মানুষের সবচেয়ে বড়

একটা জয়। কিন্তু, আমাদের একালে মানুষ পরমাণুর রহস্যভেদ করেছে, মহাকাশ জয় করতেও মানুষ এগিয়েছে অনেক দূর।

উৎপাদন-সম্পর্ক

মানুষ কখনও একলা-একলা উৎপাদনে লাগে নি। মার্কস বলেছেন, সমাজের বাইরে উৎপাদন, আর লোকের একত্রে থাকা এবং পরস্পরের সঙ্গে কথা বলা ছাড়া ভাষা গড়ে ওঠা, এই দুই সমানই অর্থহীন।

ঐতিহাসিক বিকাশের পর্ব যা-ই হোক না কেন, উৎপাদন সবসময়েই সামাজিক। মানুষের কমবেশি বড়-বড় লোকসমাজ কিংবা লোকসমষ্টি উৎপাদন চালায়।

উৎপাদন-প্রক্রিয়ার মধ্যে মানুষে-মানুষে যে-সম্পর্ক গড়ে ওঠে তাকে বলা হয় উৎপাদন-সম্পর্ক কিংবা উৎপাদন-প্রক্রিয়ায় মানুষে-মানুষে সম্পর্ক। সমাজে উৎপাদন-সম্পর্ক অসংলগ্ন নয়, সেগুলি মিলে হয় এক-একটা মূর্ত-নির্দিষ্ট ব্যবস্থা। প্রত্যেকটা ব্যবস্থায় নিষ্পত্তিকর ভূমিকায় থাকে সমাজের প্রধান শ্রেণীগুলির মধ্যে উৎপাদন-সম্পর্ক। যেমন, পুঁজিতান্ত্রিক সমাজে সেটা হল বুর্জোয়া আর প্রলেতারিয়েতের মধ্যে সম্পর্ক।

উৎপাদন-সম্পর্কগুলোর সমষ্টিটা হল সমাজের আর্থনীতিক কাঠাম। মার্কসের মতে, এটা হল আসল ভিত্তি, যা আইনগত আর রাজনীতিক উপর-কাঠামের অবলম্বন এবং যার অনুযায়ী হয় বিভিন্ন মূর্ত-নির্দিষ্ট রূপের সমাজচেতনা।

যেকোন সমাজে প্রধান উৎপাদন-সম্পর্ক গড়ে একটা মূর্ত-নির্দিষ্ট আর্থনীতিক কাঠাম। এইভাবে, সামন্ততন্ত্র, পুঁজিতন্ত্র, ইত্যাদির আর্থনীতিক কাঠাম।

উৎপাদনপ্রণালী

উৎপাদন-বল এবং উৎপাদন-সম্পর্ক একত্রে ধরলে সেই হল উৎপাদনপ্রণালী। এইভাবে, মানবসমাজের বিকাশের একটা নির্দিষ্ট মাত্রায় উৎপাদন-বল আর উৎপাদন-সম্পর্ক নিয়ে একটা নির্দিষ্ট উৎপাদনপ্রণালী।

ইতিহাসে পাঁচটা বুনিয়াদী উৎপাদনপ্রণালী জানা আছে: আদিম, দাসপ্রথার, সামন্ততান্ত্রিক, পুঁজিতান্ত্রিক এবং সমাজতান্ত্রিক।

আদিম-কমিউন ব্যবস্থা ছিল প্রাক্-শ্রেণীর সমাজ। মানুষের উপর মানুষের শোষণের ভিত্তিতে দাঁড়ানো তিন রকমের সমাজ হল — দাসপ্রথার, সামন্ততান্ত্রিক এবং পুঁজিতান্ত্রিক সমাজ। মানুষের উপর মানুষের শোষণ যেখানে চিরকালের মতো উন্মূলিত হয়েছে সেটা সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা।

সমাজের বিকাশের স্বাভাবিক প্রক্রিয়াটা ঘটে একটা প্রগতিশীল বিচলনের রূপে, তাতে আসে সাদাসিধে থেকে জটিল, নিম্নতর থেকে উচ্চতর। আদিম সমাজ শেষ হয়ে যাবার পরে দাস-মালিকানার ব্যবস্থায় উত্তরণ ছিল একটা অগ্রপদক্ষেপ। সামন্ততন্ত্রকে উৎখাত করল পুঁজিতন্ত্র, তখন পুঁজিতন্ত্র ছিল একটা প্রগতিশীল ব্যবস্থা। ইতিহাসনির্দিষ্ট কাজ সমাধা করার পরে পুঁজিতন্ত্র হয়ে দাঁড়াল মানব-প্রগতির পথে একটা প্রতিক্রিয়াশীল প্রতিবন্ধ। পুঁজিতন্ত্র হঠে যায়, আসে নতুন, উচ্চতর রূপের সমাজ — সমাজতন্ত্র, কমিউনিজমের প্রথম পর্ব।

মানুষের উপর মানুষের শোষণ। তার প্রধান-প্রধান রূপ

মানুষের উপর মানুষের শোষণের অর্থ হল, কিছু লোকের চলে অন্যান্যের ঘাড় ভেঙে। দাসপ্রথার, সামন্ততান্ত্রিক এবং পুঁজিতান্ত্রিক, এই প্রধান তিন রূপের শোষক সমাজের মধ্যে

পার্থক্য হল, সর্বোপরি, উৎপাদনের উপকরণগুলির মালিকেরা এবং সমস্ত সামাজিক সম্পদের স্রষ্টা মেহনতী জনগণের মধ্যে সম্পর্কের ব্যাপারে। উল্লিখিত সমাজগুলোর প্রত্যেকটায় শোষক শ্রেণী আর শোষিত শ্রেণীর মধ্যে সম্পর্কই প্রধান উৎপাদন-সম্পর্ক।

দাসপ্রথা, সামন্ততন্ত্র আর পুঁজিতন্ত্র হল মেহনতী জনগণের আর্থনীতিক দাসত্বের পরপর তিনটে পর্যায়। এই সবকটা উৎপাদনপ্রণালীতে একটা অভিন্ন উপাদান এই যে, উৎপাদন আর জীবনের বৈষয়িক অবস্থাগুলো কোন-না-কোন রূপে শাসক শ্রেণীর সম্পত্তি, এই শাসক শ্রেণী নিজের ভালাইয়ের জন্যে মেহনতীদের কাজ করতে বাধ্য করে।

আদিমকালে শতাব্দীর পরে শতাব্দী মানুষের চলেছিল পরস্পরকে শোষণ না করে; তারা সবাই উৎপাদনে শরিক হত এবং শ্রমের সামান্য ফল ভাগাভাগি করে নিত। তাদের শ্রমে কোন উদ্বৃত্ত উৎপাদ হত না। কেউ-কেউ যদি কাজ না করে অন্যান্যের শ্রমের উপর চলত, তাহলে সেই অন্যান্যের অস্তিত্বই সম্ভব হত না।

আদিম সমাজ ভেঙে পড়ার পরে দেখা দিল শোষণ, তখন উৎপাদকদের নিজেদের যা দরকার তার উপর কিছু উদ্বৃত্ত উৎপন্ন করতে থাকল তাদের শ্রম। কিন্তু, শোষণ কোনক্রমেই চিরন্তন নয়। ঐতিহাসিক বিকাশের সমগ্র ধারায় প্রমাণিত হয়েছে যে, পুঁজিতন্ত্রই শেষ শোষণভিত্তিক সমাজব্যবস্থা।

পুঁজিতন্ত্রের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে মীমাংসার-অসাধ্য বিভিন্ন দ্বন্দ্ব, প্রধানত প্রলেতারিয়েত আর বুর্জোয়ার মধ্যে শ্রেণীগত দ্বন্দ্ব বাড়ে এবং প্রকোপিত হয়, এটা অবশ্যম্ভাবী। পুঁজিতন্ত্র খতম

হবেই — এটাই সমাজ বিকাশের নিয়ম। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব পুঁজিতন্ত্রকে খতম করবে, এটা অবশ্যম্ভাবী। প্রলেতারিয়েত পুঁজিতন্ত্রের কবরখনক এবং নতুন, সমাজতান্ত্রিক সমাজের স্রষ্টা, এ সমাজে মানুষের উপর মানুষের শোষণ নেই।

ইতিহাসের ধারায় প্রকৃতির উপর মানুষের ক্ষমতা অনেক বেড়ে গেছে। কিন্তু, যেসব দেশে শোষণই সমাজব্যবস্থার বনিয়াদ, সেখানে বিদ্যমান সামাজিক সম্পর্ক দিয়ে মেহনতী জনগণ নিপীড়িত। প্রকৃতির উপর মানুষের ক্রমবর্ধমান আয়ত্তির ফলে যেসব সুবিধাদি আসছে সেগুলি পুঁজিতান্ত্রিক দেশগুলির বেশির ভাগ মানুষ ভোগ-ব্যবহার করতে পারে না ঐসব সম্পর্কের দরুন। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে সবকিছু একেবারেই পৃথক, সেখানে প্রগতির ফলগুলির মালিক জনগণ, প্রকৃতির উপর মানুষের আয়ত্তির ক্ষেত্রে প্রত্যেকটা অগ্রগতি শ্রমজীবী জনগণকে উপকৃত করে।

আর্থনীতিক নিয়মাবলি

সামাজিক বিকাশের আর্থনীতিক নিয়মাবলিকে প্রকাশ করা অর্থশাস্ত্রের করণীয় কাজ।

প্রকৃতির কিংবা সমাজজীবনের কোন একটা ক্ষেত্র নিয়ে বিচার-বিশ্লেষণ করতে গেলে যেকোন বিজ্ঞানের লক্ষ্য হয় সেই বিশেষ ক্ষেত্রটাতে সক্রিয় নিয়মগুলোকে প্রকাশ করা। বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যায়, 'নিয়ম' এই ধারণাটায় বুঝায় বিভিন্ন ব্যাপারের মধ্যে একটা অন্তর্নিহিত অপরিহার্য সম্বন্ধ। বিভিন্ন ব্যাপারের মধ্যে অন্তর্নিহিত সম্বন্ধ থাকেই — সেটা আমাদের পছন্দসই হোক, আর না হোক, অর্থাৎ কিনা, প্রাকৃতিক আর সামাজিক নিয়মাবলি বাস্তব, কেননা সেগুলি মানুষের ইচ্ছা আর চেতনার উপর নির্ভর

করে না। কিন্তু, মানুষ এইসব নিয়ম আবিষ্কার করে এবং ব্যবহার করে।

প্রকৃতির নিয়মাবলি সম্বন্ধে জ্ঞান মানুষকে একখানা শক্তিশালী হাতিয়ার দেয় প্রকৃতির অন্ধ শক্তিগুলোকে বশ করার জন্যে, সেগুলোকে মানুষের মঙ্গলে ব্যবহার করার জন্যে; আর সামাজিক প্রগতি ঘটাবার লক্ষ্য অনুসারে প্রয়োগীয় ক্রিয়াকলাপের জন্যে মানুষ একটা ভিত্তি পায় সমাজজীবনে সক্রিয় নিয়মগুলি সম্বন্ধে জ্ঞান থেকে।

পুঁজিতন্ত্রের আর্থনীতিক নিয়মাবলি প্রকাশ ক'রে অর্থশাস্ত্র সেই সমাজের অস্তিত্বের অবস্থাগুলোর এবং তার বিকাশের ধারাগুলোরও সংজ্ঞা নিরূপণ করে। এইভাবে অর্থশাস্ত্র বুর্জোয়া সমাজে শ্রেণীগত দ্বন্দ্বগুলোর আদত ভিতটাকে খুলে ধরে, সেগুলোর প্রকোপন কিছুতেই বন্ধ হতে পারে না এটা প্রমাণ করে এবং শ্রমিক শ্রেণীকে সমাজতন্ত্রের পথ দেখায়। বুর্জোয়া সমাজের আর্থনীতিক বিকাশের নিয়ামক নিয়মাবলি বিজ্ঞানসম্মতভাবে প্রমাণ করে যে, পুঁজিতন্ত্রের বিনাশ এবং কমিউনিজমের জয় ইতিহাসের বিধান।

সমাজতন্ত্রের আর্থনীতিক নিয়মাবলির প্রকৃতি আর মর্ম বিচার-বিশ্লেষণ ক'রে অর্থশাস্ত্র প্রমাণ করে, পুঁজিতন্ত্রের সঙ্গে আর্থনীতিক প্রতিযোগিতায় সমাজতন্ত্রের জয় ইতিহাসনির্দিষ্ট অবশ্যম্ভাবিতা।

সামাজিক বিকাশের বিভিন্ন পর্যায়ে বৈষয়িক সম্পদ উৎপাদন আর বণ্টনের নিয়মগুলো নির্ধারণ ক'রে অর্থশাস্ত্র ঐতিহাসিক বিকাশের সমগ্র জটিল ধারাটাকে বোঝার উপায় করে দেয়। অর্থশাস্ত্র এই শিক্ষা দেয় যে, উৎপাদন-বলগুলির উন্নয়নের একটা নির্দিষ্ট মাত্রায় উদ্ভূত উৎপাদন-সম্পর্ক উৎপাদন-বলগুলির আরও বৃদ্ধি ঘটায় একটা নির্দিষ্ট কালপর্যায় ধরে, তারপরে

সেটা উৎপাদন-বলের অগ্রগতিতে একটা বাধায় পরিণত হয়। তখন পুরন উৎপাদন-সম্পর্ক অপসারিত করে তার জায়গায় নতুন উৎপাদন-সম্পর্ক আনার ঐতিহাসিক আবশ্যকতা দেখা দেয়। শ্রেণীগত-বৈরিতামূলক সমাজে সেটা ঘটে বিপ্লবের রূপে। ক্ষমতা, সম্পদ এবং বিশেষ অধিকার-সুযোগাদি বজায় রাখার চূড়ান্ত গরজে শাসক শ্রেণী নিপীড়িত শ্রেণীগুলির বিপ্লবে বাধা দেয়। সমাজজীবনের সেকেলে রূপগুলোকে চূর্ণবিচূর্ণ ক'রে বিপ্লব উৎপাদন-বলগুলির আরও উন্নয়নের পথ পরিষ্কার করে দেয়।

মানুষের ইতিহাসে বিপ্লব ঘটেছে বহু। কিন্তু, অতীতের সমস্ত বিপ্লবই একরকমের শোষণের জায়গায় এনেছিল অন্যরকমের শোষণ। মানুষের উপর মানুষের সমস্ত শোষণ খতম করে একমাত্র সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব। এই কারণেই সমাজতান্ত্রিক সমাজে পরস্পরের বিরুদ্ধাচরণকারী কোন শ্রেণী নেই। উৎপাদন-বলের উন্নয়নের অভূতপূর্ব সম্ভাবনা খুলে দিয়েছে সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন-সম্পর্ক। উৎপাদন-বলগুলো বেড়ে চলতে থাকার সঙ্গে সঙ্গে সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন-সম্পর্ক উন্নততর হতে থাকে এবং ক্রমে কমিউনিস্ট সমাজের উৎপাদন-সম্পর্কে পরিণত হয়।

অর্থশাস্ত্রের শ্রেণীগত, পার্টিগত প্রকৃতি

শ্রেণীসংগ্রামের চূড়ান্ত গুরুত্বসম্পন্ন সমস্যাগুলো অর্থশাস্ত্রের বিবেচ্য বিষয়। পুঁজিতান্ত্রিক সমাজের প্রধান শ্রেণীগুলির সবচেয়ে জরুরী স্বার্থগুলোকে বিচার-বিশ্লেষণ করে অর্থশাস্ত্র। তার উপর, ঐ সমাজের একেবারে অস্তিত্বেরই প্রশ্ন তুলে তার উত্তর দেয় অর্থশাস্ত্র — কাজেই, তা শ্রেণীসংগ্রামের ব্যাপারে নিরপেক্ষ হতে পারে না। ওটা একটা

শ্রেণীগত, পার্টিগত বিজ্ঞান। শ্রমিক শ্রেণীর অর্থশাস্ত্রই একমাত্র খাঁটি বিজ্ঞানসম্মত অর্থশাস্ত্র। শ্রমিক শ্রেণীর মহান শিক্ষক মার্কস, এঙ্গেলস এবং লেনিনের সৃষ্টি এই অর্থশাস্ত্রকে বিকশিত এবং সমৃদ্ধ করছে পৃথিবীর সমস্ত মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পার্টি, আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের সমষ্টিগত চিন্তন-মনন।

শ্রমিক শ্রেণী এবং সমস্ত প্রগতিশীল সামাজিক শক্তিকে বিজ্ঞানসম্মত দূরদৃষ্টির মতো অমূল্য বস্তুটি দেয় মার্কসীয়-লেনিনীয় অর্থশাস্ত্র, — সার্থক প্রয়োগীয় ক্রিয়াকলাপের জন্যে এই বস্তুটি বিপুল গুরুত্বসম্পন্ন। এটা বিকশিত হয় ঐতিহাসিক বিকাশের সাধারণ ধারার পাশাপাশি, বিভিন্ন প্রয়োগীয় কাজের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সংস্রবে এবং বাস্তব অভিজ্ঞতার সামান্যীকরণের ভিত্তিতে। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে সমাজতান্ত্রিক আর কমিউনিস্ট নির্মাণকাজের অভিজ্ঞতা, পুঁজিতান্ত্রিক দেশগুলিতে জরুরী স্বার্থের জন্যে, সমাজতন্ত্রের জন্যে শ্রমিক শ্রেণীর বৈপ্লবিক সংগ্রামের অভিজ্ঞতা আর্থনীতিক বিজ্ঞানকে নিরবচ্ছিন্নভাবে সমৃদ্ধ করছে নতুন-নতুন সিদ্ধান্ত আর সূত্র দিয়ে, তাতে থাকে নতুন ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতার সামান্যীকরণ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বিভিন্ন প্রাক্‌পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদনপ্রণালী

১। আদিম সমাজ

পৃথিবীর আদিকাল ছিল অতি দীর্ঘ — বহু লক্ষ-লক্ষ বছর, সেটা শেষ হয়েছিল মাত্র ছয় কিংবা সাত হাজার বছর আগে। প্রাণীযূথ থেকে মানবসমাজকে পৃথক করে দিল প্রধানত যে-জিনিসটা তা হল শ্রম, শ্রমের হাতিয়ার উৎপাদন। এক পাল বনমানুষ কোন-একটা জায়গায় সমস্ত ফল খেয়ে ফেলল, তারপরে খিদের তাড়নায় চলে গেল আর-একটা জায়গায়। সহজপ্রবৃত্তি দিয়ে তারা প্রকৃতির সঙ্গে নিজেদের মানিয়ে নিতে পারে নিষ্ক্রিয়ভাবে, তার বেশি কিছু নয়। সম্পূর্ণ বিপরীতে, মানবসমাজ প্রকৃতির উপর সতেজে ক্রিয়া খাটায় শ্রম দিয়ে।

প্রকৃতি থেকে সমাজকে পৃথক করে রাখার মতো কোন অনতিক্রমণীয় গহ্বর নেই। কিন্তু, মানবসমাজের উদ্ভব হল সবচেয়ে বড় একটা বৈপ্লবিক উৎক্রমণ। বিপ্লবের বিপক্ষীয়রা বলে, 'প্রকৃতি কোন উৎক্রমণ করে না', কিন্তু, ব্যাপারটা এই না-বিজ্ঞানসম্মত উক্তির ঠিক বিপরীত: প্রকৃতি উৎক্রমণে ঠাসা।

জীবনোপায় যোগাড় করার বিভিন্ন প্রণালী

আদিম মানুষ কঠোর লড়াই চালাত প্রকৃতির বিরুদ্ধে — তার কোন অন্ত ছিল না। তাদের প্রথম-প্রথম হাতিয়ার ছিল পাথর আর দণ্ড। সেগুলি ছিল তাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কৃত্রিম সংযোজিত অংশ গোছের: পাথর — মুষ্টির আর দণ্ড — সম্প্রসারিত বাহুর। এইসব সাদাসিধে হাতিয়ার দিয়ে আরও খাদ্য পেতে পারত। সাদাসিধে ধরনের শিকার সম্ভব হয়ে উঠল।

লোকে শিকার করত শুধু দল বেঁধে, যাকিছু মারতে পেরে উঠত তাই খেত। খাদ্য ছিল দুষ্প্রাপ্য, কোন মজুদ থাকত না।

কালক্রমে তারা তৈরি করতে শিখল মুগুর, বল্লম, ছুরি, বঁড়শি, হারপুন, এগুলি দণ্ড কিংবা পাথরের চেয়ে বেশি কার্যকর, এগুলি দিয়ে তারা অনেক বড়-বড় জীবজন্তু শিকার করত, মাছ ধরত।

আগুন আবিষ্কারের ফলে একটা নতুন যুগ এসে গেল মানুষের জীবনে — মানুষ চিরকালের মতো বেরিয়ে পড়তে পারল প্রাণিজগৎ থেকে।

আনাড়িভাবে খণ্ড-করা পাথরের জায়গায় সূক্ষ্ম কাজ করে ছাঁটা-কাটা হাতিয়ার তৈরি করতে শিখতে মানুষের লেগেছিল খুবই দীর্ঘ কাল। পাথর, কাঠ, হাড় আর শিঙই বহুকাল যাবত ছিল তাদের প্রধান মালমশলা। অনেক-অনেক পরে লোকে তৈরি করতে শিখেছিল ধাতুর হাতিয়ার — প্রথমে তামার এবং বিশুদ্ধ রূপে পাওয়া অন্যান্য ধাতুর, পরে ব্রোঞ্জের, শেষে লোহার। সুদীর্ঘ প্রাগৈতিহাসিক কালপর্যায়টা বিভিন্ন যুগে বিভক্ত: প্রস্তরযুগ, তাম্রযুগ, লৌহযুগ। এর এক-একটা ‘যুগ’ চলেছিল বহু শতাব্দী ধরে, প্রস্তরযুগের দৈর্ঘ্য ছিল হাজার-হাজার বছর।

সাদাসিধে সহযোগ। সাধারণের শ্রম আর সাধারণের সম্পত্তি

আদিম সমাজে উৎপাদন-সম্পর্কের বুনিয়াদী ধরন ছিল সাদাসিধে সহযোগ : লোকে কাজ করত একসঙ্গে, তাদের শ্রম ছিল একই রকমের, সাধারণের। একসঙ্গে কাজের ফলে তারা এমনসব করণীয় কাজ করতে পারত, যা এক ব্যক্তির ক্ষমতায় কুলোয় না — যেমন, শিকার।

ব্যক্তিগত সম্পত্তি ছিল না। লোকসমষ্টির যাকিছু ছিল, সবই ছিল সাধারণের সম্পত্তি, এজমালি। সেই সময়কার বিশেষক উৎপাদন-বলগুলির বিকাশের মাত্রা দিয়ে সাধারণের শ্রম আর এজমালি সম্পত্তি অবধারিত হয়ে গিয়েছিল। আগে যা বলা হয়েছে, শ্রমে কোন উদ্বৃত্ত উৎপাদ সৃষ্টি হত না, অর্থাৎ, জীবনের পক্ষে যা অত্যাবশ্যক তার চেয়ে বেশি কিছুই উৎপন্ন হত না। শোষণ, অর্থাৎ, অন্যান্যের শ্রমের ফল প্রণালীবদ্ধভাবে আত্মসাৎ করা ছিল অসম্ভব।

শ্রমবিভাগ। ফসলের খামার আর পশুপালনের উদ্ভব

শ্রমের হাতিয়ারগুলোর বিকাশের ফলে শ্রম-সংগঠনে একটা ক্রমপরিবর্তন ঘটেছিল। দেখা দিল একটা প্রাথমিক স্বাভাবিক শ্রমবিভাগ, অর্থাৎ, নারী-পুরুষ আর বয়স অনুসারে শ্রমবিভাগ। বাচ্চাদের, ঘর-গৃহস্থালির দেখাশোনা করত, খাবার তৈরি করত মেয়েরা। কোন লোকসমষ্টি স্থানপরিবর্তন করার সময়ে গোটা সমষ্টির সামান্য জিনিসপত্র বইত মেয়েরা। পুরুষেরা চলার পথে শিকার করতে পারত।

ধনুক-বাণ উদ্ভাবনের ফলে শিকার হয়ে উঠল আরও পয়মন্ত। আর তারই সঙ্গে সঙ্গে, শিকার আর মাছ ধরা আরও বেশি জটিল হয়ে উঠতে থাকল। খাদ্য যোগাড়ের কাজে মেয়েরা

আর শামিল হত না। নারী-পুরুষের মধ্যে শ্রমবিভাগ হয়ে উঠল স্থায়ী।

জীবনোপায় সংগ্রহ করার প্রণালীতে আরও উন্নতি ঘটেছিল প্রাথমিক ধরনের ফসলের খামার এবং পশুপালনের ভিতর দিয়ে। আপতিকভাবে পড়া শস্য শিকড় গাড়ে, তার থেকে চারা গজায়, সম্ভবত এটা লক্ষ্য করেই লোকে কৃষিকাজ ধরেছিল। পশুপালনও দেখা দিয়েছিল অনুরূপভাবেই, তা স্পষ্ট। শিকারে মারা মা-জন্তুটাকে নিয়ে আসবার সময়ে বাচ্চাগুলো সহজপ্রবৃত্তি অনুসারেই লোকের পিছন পিছন যায়, প্রথমে সেগুলোকেই পুষেছিল আদিম মানুষ।

গোষ্ঠীতন্ত্র

কালক্রমে আদিম লোকসমাজ থেকে উদ্ভূত হয়েছিল গোষ্ঠীতন্ত্র। যাদের মধ্যে রক্তের সম্পর্ক আছে, সেই লোকসমষ্টিকে বলে গোষ্ঠী। লোকসমষ্টি হল গোষ্ঠী। প্রথমে এমন সমষ্টিতে থাকত কয়েক ডজন জ্ঞাতি, তাদের বাইরে সবাইকে বিজাতীয় বলে ধরা হত।

গোড়ায়, গোষ্ঠীতন্ত্রে প্রধান ভূমিকা ছিল মেয়েদের। গোষ্ঠী ছিল মাতৃপ্রধান বা মাতৃশাসিত। ঐ সময়ে খাদ্য যোগাড় করা আর শিকারের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল প্রাথমিক ধরনের খামার, সেটা করত প্রধানত মেয়েরা, তারা থাকত বাড়িতে।

উৎপাদন-বলগুলি বিকশিত হয়ে চলবার মধ্যে মাতৃশাসিত সমাজের জায়গায় এলো পিতৃশাসিত সমাজ। প্রধান ভূমিকায় এলো পুরুষ। এই পরিবর্তনটা ঘটেছিল বহুলাংশে যাযাবর পশুপালন দেখা দেবার ফলে, শিকারের মতো এটাও হয়ে উঠেছিল পুরুষের কাজ। কৃষিও নিয়ে নিচ্ছিল পুরুষেরা — কৃষিকাজ পেঁছেছিল ফসল খামারের কাজের পর্যায়ে।

শ্রমিক শ্রেণীর মহান শিক্ষক মার্কস, এঙ্গেলস এবং লেনিন আদিম যুগের সমাজব্যবস্থাটাকে বলেছিলেন 'আদিম কমিউনিজম'। তাঁরা ইতিহাসের তথ্য তুলে ধরে দেখিয়ে দিলেন, বুর্জোয়াদের নোকরেরা যে বলে ব্যক্তিগত সম্পত্তি যেন ছিল বরাবরই, সেটা বানানো কথা। ইতিহাসে দেখা যায়, মানুষ লক্ষ-লক্ষ বছর ধরে ছিল ব্যক্তিগত সম্পত্তি ছাড়াই। ব্যক্তিগত সম্পত্তি না থাকা, এজমালি সম্পত্তির প্রাধান্য, আর সমষ্টিগত শ্রম — এইসব মিলিয়ে আদিম সমাজকে আদিম কমিউনিজম বলে ধরা যায়।

এরই সঙ্গে সঙ্গে, আদিম কমিউনিজমের ইতিহাসনির্দিষ্ট গণ্ডিবদ্ধতার কথা বলেছিলেন এই মহামানবেরা। লেনিন লিখেছিলেন, মানবজাতির সুদূর অতীতে কোন 'স্বর্ণযুগ' ছিল না — প্রকৃতির বিরুদ্ধে সংগ্রামের হাড়ভাঙা বোঝাটাকে বইতে হত আদিম মানুষকে।

উৎপাদন-বল বিকশিত হবার সঙ্গে সঙ্গে আদিম মানুষ ধীরে ধীরে নিজেদের মুক্ত করল প্রকৃতির দমনমূলক প্রভাব থেকে। আর, একই লোকসমাজে মানুষের ঘনিষ্ঠ সংযোগের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা উৎপাদন-সম্পর্কের ক্রমাবনতি ঘটল তার সঙ্গে সঙ্গে।

সামাজিক শ্রমবিভাগ। বিনিময়, ব্যক্তিগত সম্পত্তি আর বিভিন্ন শ্রেণীর উদ্ভব

আগেই দেখা গেছে, একই লোকসমাজের মানুষের নারী-পুরুষ আর বয়সের স্বাভাবিক পার্থক্য ছিল প্রারম্ভিক শ্রমবিভাগের বনিয়াদ। পরে বিভিন্ন লোকসমাজ, আর তারপরে

পৃথক-পৃথক ব্যক্তি উৎপাদনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশেষকর্মী হয়ে উঠতে থাকল। এটা হল সামাজিক শ্রমবিভাগ — এটাকে স্বাভাবিক শ্রমবিভাগের সঙ্গে জড়িয়ে-পাকিয়ে ফেলা চলে না।

ভাল-ভাল চারণভূমির অঞ্চলে বাসিন্দা উপজাতিগুলি ফসলের খামার আর শিকার ছেড়ে ধরল পশুপালন। ফসলের খামার থেকে পশুপালন আলাদা হয়ে যাওয়াটা হল প্রথম মস্ত সামাজিক শ্রমবিভাগ, তার ফলে দেখা দিল বিনিময়।

কৃষি থেকে হস্তশিল্পগুলির পৃথক হয়ে যাওয়াটা হল বড়রকমের দ্বিতীয় সামাজিক শ্রমবিভাগ, এর ফলে বিনিময়ের বনিয়াদটা হল আরও প্রশস্ত। হস্তশিল্পীদের জাতদ্রব্যের সবটাই কিংবা প্রায় সবটাই যেত বিনিময়ে।

গোড়ার পর্যায়গুলিতে বিনিময়ের বন্দোবস্ত করত গোষ্ঠীর সর্দারেরা — মোড়লেরা, গোষ্ঠীপতিরা। কিন্তু, বিনিময়ের বিকাশ আর সম্প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে গোষ্ঠীর সম্পত্তিকে তারা নিজেদেরই বলে ধরতে থাকল। বিনিময়ের প্রধান জিনিস ছিল পশুসম্পত্তি — সেটাই সর্বপ্রথমে ব্যক্তিগত সম্পত্তি হয়েছিল। লোকসমাজের সদস্যদের মধ্যে দেখা দিল সম্পত্তির অসমতা।

উৎপাদন-বলগুলোর বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পশুপালনে কিংবা ফসল খামারে খাটানো শ্রম আরও বেশি ফলপ্রদ হতে থাকল। উদ্বৃত্ত শ্রম আর উদ্বৃত্ত উৎপাদ, অর্থাৎ, একজন মেহনতীর ন্যূনকল্প জীবনোপায়ের অতিরিক্ত শ্রম আর উৎপাদ হবার সম্ভাবনা দেখা দিল।

বন্দীদের আগে মেরে ফেলা কিংবা ছেড়ে দেওয়া হত — কেননা, তাদের দিয়ে অন্যকিছু করার ছিল না। পরে বন্দীদের দাস বানানো হতে থাকল। দাস-শ্রমের ফলে অসমতা হল আরও বেশি। তখন ধনী অভিজাত-সম্প্রদায় দাস বানাত শুধু বন্দীদের

নয়, — লোকসমাজের যারা নিঃস্ব হয়ে কিংবা দেনায় জড়িয়ে পড়ত, তাদেরও তারা দাস বানাত।

এইভাবে, ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিকাশের ফলে স্বভাবতই গড়ে উঠল বিভিন্ন শ্রেণী। আদিম ব্যবস্থার জায়গায় এলো শ্রেণীবিভক্ত সমাজ। তখন থেকে মানবজাতির ইতিহাস হয়ে উঠল শ্রেণীসংগ্রামের ইতিহাস।

২। দাসপ্রথা

দাসপ্রথা হল একেবারে গোড়ার এবং সবচেয়ে উৎকট আর নগ্ন রূপের শোষণ। তারপরের দুই রূপের শোষক সমাজ — সামন্ততন্ত্র আর পুঁজিতন্ত্র — হল, মার্কসের ভাষায়, ঘষা-মাজা দাসপ্রথা ছাড়া কিছু নয়।

পিতৃশাসিত সমাজের দাসপ্রথা থেকে উৎপাদনের দাস্যপ্রণালী

গোড়ায় দাসপ্রথার প্রকৃতি ছিল গোষ্ঠীপতিকেন্দ্রিক। দাসের সংখ্যা থাকত কম, তাদের মালিকেরা তাদের সঙ্গে কাজ করত। গোষ্ঠী পতিশাসিত বড় পরিবারের নানা চাহিদা মেটাবার জন্যে ব্যবহৃত হত দাস-শ্রম।

আরও বিকাশের প্রক্রিয়ায় একটা মূলগত পরিবর্তন ঘটে গেল। লোহা বিগলন উদ্ভাবিত হবার ফলে বিপ্লব ঘটে গেল উৎপাদনের ক্ষেত্রে। লোহার কুড়ুল আর লোহার ফালিওয়ালা লাঙল হওয়ায় বড়-বড় জমিতে চাষআবাদ করা সম্ভব হল। ছোট খামারীরা তত জমি চাষ করতে পারত না, কিন্তু দাস-শ্রম খাটিয়ে দাস-মালিকেরা তা পারত।

পশুপালনও এগোল অনুরূপ ধারায়। ধনী পরিবারগুলোর পশুপাল দ্রুত বেড়ে চলল, সেগুলোকে চরানো-দেখাশোনার জন্যে অতিরিক্ত জনের দরকার হল। এটাও করানো হল দাস-শ্রমের সাহায্যে।

সামাজিক শ্রমবিভাগের বৃদ্ধি এবং বিনিময়ের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে পৃথক গোষ্ঠী আর উপজাতিগুলো বিভিন্ন জোট বাঁধল। মোড়ল আর জঙ্গী সর্দারেরা হল কাউন্ট আর রাজা, — সম্পত্তি-বিত্তবান উপরতলার লোকেদের স্বার্থরক্ষা করার জন্যে, দারিদ্র-দশাগ্রস্ত জ্ঞাতিদের উপর নিপীড়ন চালাতে এবং দাসদের দমন করতে তারা ব্যবহার করতে থাকল নিজেদের ক্ষমতা। সশস্ত্র দঙ্গলগুলো, আদালত আর শাস্তি দিয়ে চলতে থাকল ঐসব কাজ। এইভাবে উদ্ভব হল রাষ্ট্রের — শোষিত জনগণের বিরুদ্ধে বলপ্রয়োগের জন্যে শাসক শ্রেণীর হাতিয়ার।

দাসদের উপর শোষণ

দাসপ্রথার পূর্ণাঙ্গ বিকাশের কালপর্যায়ে দাস-শ্রম হল সামাজিক অস্তিত্বের বনিয়াদ। এমনসব কারবার বসানো হল যেগুলিতে শত-শত, কখনও-কখনও হাজার-হাজার দাসকে খাটানো হত। দাসদের উপর শোষণ চলল বৃহৎ পরিসরে।

দাস-শ্রম ছিল নগ্ন জবরদস্তিতে-করানো শ্রম। উৎপাদনের উপকরণই শুধু নয়, মেহনতীও হল শোষক শ্রেণীর সম্পত্তি। দাসদের কেনা-বেচা হত গরু-ভেড়ার মতো। মনিব তার ক্রীতদাসদের মেরে ফেলতেও পারত। দাসদের শ্রমে পয়দা করা সবকিছুর মালিক ছিল ঐ মনিবেরা।

বিনিময়ের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজন বাড়ল। দাসদের উপর শোষণ তীব্রতর ক'রে মালিকেরা শুধু উদ্বৃত্তটাই নয়, দাসদের অপরিহার্য শ্রমের একটা মোটা অংশও আত্মসাৎ করত।

প্রযুক্তিগত বদ্ধতা

দাসপ্রথার সমাজে প্রযুক্তি (টেকনিক) ছিল চূড়ান্ত মাত্রায় আদিম, তেমনি শ্রমের হাতিয়ারগুলোও। একমাত্র আকর্ষ-বল ছিল মানুষ আর পশু। হাতের হাতিয়ার ছাড়া যন্ত্র বলতে ছিল শুধু লিভার, ব্লক আর গিয়ারের মতো দৈহিক বলে কার্যকারী কল, যা পেশীর শক্তির আনুকূল্য করে।

যেহেতু দাস তার শ্রম-ফলে আগ্রহবান্বিত ছিল না, কাজেই, দাস-শ্রম ছিল অনুৎপাদী। সে যতই কঠোর পরিশ্রম করুক না কেন, তার অবস্থা রয়ে যেত সমানই হতাশাময় আর নিপীড়ন-জর্জরিত। দাস-মালিকদের হাতে ছিল যথেচ্ছভাবে খাটাবার অজস্র মুফত শ্রমশক্তি, — শ্রমের উৎপাদিকাশক্তি বাড়াতে তাদের তেমন কোন গরজ ছিল না। চূড়ান্ত অনুৎপাদী উপায়ে দাস-শ্রম উজাড় করে নেওয়া হত। শাসক শ্রেণীগুলি বিলাস-ব্যসনে ডুবে থাকত — অপচয়-অপব্যয়ের কোন সীমা-পরিসীমা ছিল না।

বিনিময়ের বিকাশ এবং অর্থের উদ্ভব

দাসপ্রথার সমাজে জাতদ্রব্যাদির বেশির ভাগই তৈরি হত বিনিময়ের জন্যে নয় — দাস-মালিক, তার বহু গলগ্রহ আর চাকরবাকরের সরাসরি ভোগ-ব্যবহারের জন্যে। তবে, ক্রমে ক্রমে, পণ্য-বিনিময় অপেক্ষাকৃত বড় ভূমিকায় আসতে আরম্ভ করেছিল।

সরাসরি ভোগ-ব্যবহারের জন্যে নয়, বিনিময়ের জন্যে, বিক্রির জন্যে তৈরি করা জিনিসকে অর্থশাস্ত্রে বলা হয় পণ্য। বিনিময়ের জন্যে, বিক্রির জন্যে উৎপাদনকে বলা হয় পণ্য উৎপাদন। যে-ব্যবস্থায় উৎপাদন হয় বিনিময়ের জন্যে নয়, ভোগ-

ব্যবহারের জন্যে, তাকে বলে স্বাভাবিক অর্থনীতি। স্বাভাবিক অর্থনীতিতে, শ্রমের জাতদ্রব্যাদি যে-সংসারে উৎপন্ন হয় সেখানেই ব্যবহৃত হয়।

বিনিময় প্রথমে ছিল বিক্ষিপ্ত। সাধারণত শ্রমের একটা উৎপাদ অন্য একটার সঙ্গে বিনিময় হত। কিন্তু, কালে কালে, বিনিময় বিস্তৃততর হয়ে নিয়মিত হয়ে উঠেছিল। তখন একটা বিশেষ পণ্যের প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল যে পণ্যটা বিনিময়ের মাধ্যম হতে পারে। স্বতঃস্ফূর্তভাবে, সমস্ত পণ্যের মধ্যে একটা অন্যান্যগুলোর চেয়ে উপযুক্ত বিবেচিত হত — অন্যান্য সমস্ত জিনিসের মূল্য ধার্য করতে ব্যবহৃত হত সেটাই। সর্বজনীন পণ্য হল অর্থ। তেমনি আবার, অর্থ দেখা দেবার ফলে বিনিময় এবং পণ্য উৎপাদনের বিকাশ চাঙ্গা হল।

বাণিজ্য এবং চোটা

হস্তশিল্পের বিকাশ এবং বিনিময়ের প্রসারের ফলে দেখা দিল বিভিন্ন শহর — যদিও প্রথম-প্রথম শহরগুলি ছিল ছোট, গ্রাম থেকে সেগুলির তফাত ছিল সামান্যই। সেগুলি ক্রমে উৎপাদন আর বাণিজ্যের কেন্দ্রে পরিণত হল, সেগুলি আর গ্রামাঞ্চলের মধ্যে তফাত বেড়ে গেল।

শহর আর গ্রামাঞ্চলের মধ্যে বিছিন্নতা ঘটেছিল এইভাবেই।

বিনিময় যখন তেমন বিকশিত হয়ে ওঠে নি, তখন উৎপাদকেরা — ফসলখামারী, পশুপালক এবং কারিগরেরা জিনিসপত্র বিনিময় করত নিজেরাই। কিন্তু, বিনিময়যোগ্য পণ্যসমূহ সমানে বেড়ে চলল, তেমনি বেড়ে চলল বিনিময়ক্ষেত্রের আয়তনও। তখনই দেখা দিয়েছিল সওদাগরেরা। উৎপাদকদের কাছ থেকে জিনিস কিনে নিয়ে যেত বাজারে, সে-বাজার কখনও-

কখনও উৎপাদনস্থল থেকে অনেক দূরে, সেখানে তারা তা বিক্রি করত ব্যবহারকের কাছে।

বাণিজ্যিক পুঁজি দেখা দিয়েছিল এইভাবে।

উৎপাদন আর বিনিময়ের প্রসারের ফলে সম্পত্তির অসমতা বেড়ে গেল বিস্তর। ধনীদের তখন ছিল বহুসংখ্যক দাস শুধু নয়, মোটা-মোটা পরিমাণ অর্থও। গরিবেরা ক্রমাগত বেশি ঘন ঘন তাদের কাছে ধারের জন্যে হাত পাততে বাধ্য হত। চোটা থেকে কেউ-কেউ পেল বিস্তর সম্পদ, আর অন্যান্যের কপালে জুটল দাসত্ববন্ধন আর নিঃস্বতা।

এইভাবেই দেখা দিয়েছিল চোটার পুঁজি।

বাণিজ্যিক আর চোটার পুঁজি স্বাভাবিক অর্থনীতির ভিত ক্ষয়ে দিল। বিনিময়ের প্রসার দাস-মালিকদের খাঁই বাড়িয়ে তুলল। কিন্তু, দাসপ্রথার সমাজে প্রত্যক্ষ উৎপাদনকারী ছিল একটা জিনিস, সে-অবস্থায় বাণিজ্যিক আর চোটার পুঁজি উৎপাদন আয়ত্ত করে সেটাকে মজুরি-শ্রমের বনিয়াদে পরিণত করতে অপারগ ছিল।

দাসপ্রথার দ্বন্দ্বগুলোর বৃদ্ধি

প্রধান হয়ে ওঠার পরে দাসপ্রথা প্রযুক্তিবিদ্যার কোন বিশেষ উন্নয়ন ঘটাতে পারল না। আর তারই সঙ্গে সঙ্গে, ঐ ব্যবস্থা নির্মমভাবে খতম করতে থাকল মানুষের শ্রমশক্তিকে, যেটা হল সমাজের প্রধান উৎপাদন-বল।

দাসপ্রথা শ্রমের প্রতি ভীষণ অবজ্ঞা সৃষ্টি করেছিল। দাস-মালিকেরা ক্রমাগত বেশি-বেশি মাত্রায় উৎপাদনের ব্যবস্থাপন থেকে দূরে সরে গিয়েছিল। এসব কাজ তারা দিয়েছিল ম্যানেজার আর তদারককর্মীদের হাতে, এদের বেশির ভাগকেই

নেওয়া হত দাসদের মধ্য থেকে। দৈহিক শ্রম হয়ে উঠেছিল দাসদের নিয়তি — সে-কাজ স্বাধীন ব্যক্তিকে মানাত না।

দাসপ্রথার উৎপাদনপ্রণালীর বিকাশ ছোট-ছোট স্বাধীন উৎপাদকের সর্বনাশ করল। দাস-মালিকানার রাষ্ট্র তাদের খয়রাত দিত দাস-শ্রমে পয়দা করা উদ্বৃত্ত উৎপাদ থেকে।

দাসপ্রথার পতন

আদিম যুগের সঙ্গে তুলনায় দাসপ্রথা ছিল মানব-ইতিহাসে বেশকিছুটা অগ্রগতি। তবে, দাস-শ্রমের বনিয়াদে গড়ে ওঠা ব্যবস্থাটা পরে উৎপাদন-বলগুলির উন্নয়নের ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সর্বোচ্চ মাত্রায় পৌঁছবার পরে দাসপ্রথা টিকে ছিল তার আয়ুষ্কাল ছাড়িয়ে। ব্যবসা ঝিমিয়ে পড়ল, জনসংখ্যা কমে গেল, একসময়কার সুফলা ভূমিগুলো অনুৎপাদী হয়ে পড়ে রইল, আগেকার ফলাও হস্তশিল্পে ঘটল অতি-মন্দা।

উৎপাদন কমে যেতে থাকবার সঙ্গে সঙ্গে উৎপীড়কদের বিরুদ্ধে দাসত্বে-নিপীড়িত জনগণের সংগ্রাম তীব্রতর হয়ে উঠল। দাসের ধনী মালিকদের উপরতলার বিরুদ্ধে উচ্ছন্ন-যাওয়া ছোট খামারীদের সংগ্রামের সঙ্গে জড়িয়ে-পাকিয়ে গেল দাসদের অভ্যুত্থানগুলো।

দাসরা তাদের উৎপীড়কদের ঘৃণা করত, কিন্তু তাদের কোন স্পষ্ট লক্ষ্য ছিল না, তারা আবার পিতৃশাসনতন্ত্র কায়েম করার কথা ভাবত — যদিও সেটা ছিল একটা অতীতের বস্তু। কাজেই, স্বভাবতই, দাসদের অভ্যুত্থানগুলো শোষণের অবসান ঘটাতে পারল না।

দাসপ্রথাকে উৎখাত করল সামন্ততন্ত্র, এর শোষণের ধরনধারণগুলো সামাজিক উৎপাদন-বলগুলোর বিকাশের অপেক্ষাকৃত বেশি সুযোগ-সম্ভাবনা সৃষ্টি করল।

পুঁজিতন্ত্রের আমলে দাসত্ব

প্রাচীন দুনিয়ার পতনের সঙ্গে সঙ্গে কর্তৃত্বশালী সমাজব্যবস্থা হিসেবে দাসপ্রথার অবসান ঘটলেও খাস দাসত্ব দূর হয়ে গেল না। পুঁজিতন্ত্রের প্রারম্ভে সেটা আবার দেখা দিয়েছিল ব্যাপক পরিসরে। আমেরিকা জয়ের পরে, ষোল শতকের শেষের দিকে নিগ্রো ক্রীতদাসদের নেওয়া হত আমেরিকায়। সতর আর আঠার শতকে দাসব্যবসায় ফলাও হয়ে উঠেছিল। দাস-শ্রমে উৎপন্ন জিনিসের, বিশেষত তুলোর বাজার বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে আমেরিকায় নিগ্রো ক্রীতদাসদের উপর শোষণ হয়ে উঠেছিল চূড়ান্ত মাত্রায় পাশবিক।

১৮৬১—১৮৬৫ সালের আমেরিকার গৃহযুদ্ধে শিল্পে-অগ্রসর উত্তরের কাছে দাস-মালিকদের দক্ষিণের পরাজয় ঘটেছিল। আইনত দাসত্বের অবসান ঘটল, কিন্তু নিগ্রোরা জনসংখ্যার মধ্যে সবচেয়ে নিপীড়িত অংশ হয়েই রইল।

দাসত্ব আমেরিকায় রহিত করা হলেও, বাদবাকি পুঁজিতান্ত্রিক দুনিয়া থেকে সেটা মিলিয়ে গেল না। দাসত্বের নানা জের বজায় রইল উপনিবেশ আর আধা-উপনিবেশগুলিতে। এখন যে-প্রক্রিয়াটা চলছে, তাতে উপনিবেশবাদের চূড়ান্ত বিলুপ্তি ঘটলে একমাত্র তবেই দাসত্বের কলঙ্ক মুছে যাবে সম্পূর্ণত এবং চিরকালের মতো।

৩। সামন্ততন্ত্র

সামন্ততন্ত্রের উদ্ভব

একদিকে, রোমক দাসপ্রথার ধ্বংসাবশেষের উপর এবং, অন্যদিকে, যারা রোমকে পদানত করেছিল তাদের আদিম

কমিউনব্যবস্থা ভেঙে পড়ার ফলে পশ্চিম ইউরোপে সামন্ততন্ত্রের উদ্ভব হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে, সামন্ততন্ত্র দেখা দিয়েছিল এই দুটো প্রক্রিয়ার পরস্পর-ক্রিয়ার ফলেই।

রোমক সাম্রাজ্যের পতন ঘটেছিল পঞ্চম খৃষ্টাব্দের শেষাশেষি। যেসব উপজাতি রোম জয় করেছিল তারা এর রাজ্যক্ষেত্রের একটা বড় অংশ গ্রাস করেছিল। গোড়ায় ভূমি হয়েছিল সাধারণের সম্পত্তি, কিন্তু উপজাতীয় গোষ্ঠীপতিরা অচিরেই সর্বসাধারণের সম্পত্তি আত্মসাৎ করতে আরম্ভ করেছিল। দেখা দিয়েছিল রাজতান্ত্রিক ক্ষমতা।

প্রকান্ড-প্রকান্ড ভূমিখন্ড চলে গিয়েছিল গির্জার দখলে, গির্জা হয়ে উঠেছিল রাজতন্ত্রের প্রধান অবলম্বন। রাজারা তাদের লোক-লশকরদের মধ্যে ভূমি বিলি করে দিয়েছিল — প্রথমে আজীবনস্থায়ী স্বত্বে এবং পরে পুরুষানুক্রমিক ভোগ-দখলের শর্তে।

যাদের ভূমি দেওয়া হত, তারা রাজার জন্যে সামরিক কাজ করতে বাধ্য থাকত। ভূমিতে কাজ করত আগের মতোই পৃথক-পৃথক খামারীরা, কিন্তু তারা নির্ভরশীল ছিল নতুন মনিবের উপর। এই মনিবেরা নানাবিধ কর্তব্যকর্ম চাপিয়ে দিত নির্ভরশীল কৃষকদের উপর। এইসব শর্তে নতুন মালিকেরা যেসব ভূমিখন্ড বিলি করত সেগুলিকে বলা হত ফিউড (জায়গির), আর সেগুলির মালিকদের বলা হত ফিউডাল (জায়গিরদার বা সামন্ত) — তার থেকে ঐ ব্যবস্থাটার নাম ফিউডালিজম (সামন্ততন্ত্র)।

প্রযুক্তির মাত্রা

দাস-মালিকানার অর্থনীতির মতো সামন্ততান্ত্রিক অর্থনীতিও ছিল প্রধানত স্বাভাবিক। কৃষকেরা উৎপাদন করত

প্রধানত নিজেদের ভোগ-ব্যবহারের জন্যে, তারা পণ্য-বিনিময় করত ক্বচিৎ-কদাচিৎ। সামন্ত মনিবও বাণিজ্য করত মোটামুটি কালেভদ্রেই — কেননা, তার প্রয়োজনীয় প্রায় সবকিছুই উৎপন্ন হত ভূমিদাস-শ্রমে।

কৃষিকাজের ধরনধারণ ছিল আদিম — বিশেষত সামন্ততান্ত্রিক কালপর্যায়ের গোড়ার দিকে। পশ্চিম ইউরোপে নবম—দশম শককেও ভূমি দীর্ঘকাল অনাবাদী ফেলে রাখার ব্যবস্থার প্রাধান্য ছিল: কোন জমিখণ্ডে পরপর কয়েক বছর চাষআবাদ চালাবার পরে সেটা ২০—২৫ বছর ধরে 'জিরতে' দেওয়া হত। এগারো শতকে চালু করা তিন-খেতী ব্যবস্থা কৃষিক্ষেত্রে বহু শতাব্দী যাবত প্রধান ছিল। শ্রমের হাতিয়ারগুলো ছিল অতি আদিম ধরনের, ছিল শুধু কোদাল, গাঁইতি, কেঠো লাঙল, কাস্তে এবং অন্যান্য আদিম ধরনের হাতিয়ার; ঘন ঘন যুদ্ধের দরুন পশু ছিল দুষ্প্রাপ্য, কৃষকদের প্রায়ই নিজেদেরই লাঙল টানতে হত।

তবু, সামন্ততন্ত্রের আমলে উৎপাদন-বলগুলি দাস-মালিকানাতন্ত্রের সঙ্গে তুলনায় উচ্চতর মাত্রায় উঠেছিল। শস্যের চাষ, তরিতরকারি জন্মানো, মদ আর মাখন প্রস্তুত করার প্রযুক্তির উন্নতি হয়েছিল — ধীরে কিন্তু নিশ্চিতভাবেই। লোহা বিগলন এবং লোহা দিয়ে জিনিস তৈরি করার প্রণালী উন্নততর হয়েছিল; লোহার লাঙল, জমির মই আর তাঁতের ব্যাপক প্রসার ঘটেছিল। সামন্ততান্ত্রিক যুগের শেষের দিকে হস্তশিল্পের উন্নয়ন এবং কারিকরদের বিভিন্ন হাতিয়ারের সমানে উন্নতি ঘটার ফলে পুঁজিতান্ত্রিক কারখানা দেখা দেবার উপযোগী অবস্থা সৃষ্টি হয়েছিল।

সামন্ততান্ত্রিক শোষণ

সামন্ততান্ত্রিক ভূস্বামিত্বের দরুন জনসাধারণের উপর প্রত্যক্ষ শাসন কায়েম হয়েছিল, — লোকে তখন কোন-না-কোন ভাবে যুক্ত ছিল ভূমির সঙ্গে।

তখন উৎপাদনের প্রধান উপকরণ ছিল ভূমি। ভূমি সামন্ত মনিবের সম্পত্তি হলেও, সামন্তর ক্ষমতাটা তার ভূমিসম্পত্তির আয়তনের চেয়ে তার উপর নির্ভরশীল মানুষের সংখ্যার উপরই নির্ভর করত বেশি পরিমাণে।

সামন্ততন্ত্রের বনিয়াদ ছিল কৃষকের উপর ভূস্বামীর শোষণ, তাতে কৃষকের শ্রমের উদ্বৃত্ত উৎপাদ আত্মসাৎ করত ভূস্বামী। সামন্ততান্ত্রিক শোষণের দুটো প্রধান উপায় ছিল — কোর্‌ভে (বেগার কাজ আদায়) এবং টাকায় কিংবা জিনিসে খাজনা।

কোর্‌ভে অর্থাৎ বেগারী ব্যবস্থায় কৃষক সপ্তাহের একাংশে (ধরা যাক, তিন দিন) কাজ করত নিজের জমিখণ্ডে নিজের উৎপাদনের উপকরণ দিয়ে, আর সপ্তাহের বাকি ক'দিন সেই একই উপকরণ দিয়ে সে কাজ করত মনিবের খেতে।

খাজনার ব্যবস্থা অনুসারে, কৃষক ভূস্বামীকে নিয়মিতভাবে নির্দিষ্ট পরিমাণ শস্য, হাঁস-মুরগি এবং খামারের অন্যান্য জাতদ্রব্য কিংবা বেঁধে-দেওয়া পরিমাণ অর্থ দিতে বাধ্য থাকত।

এইভাবে, খাজনা দেওয়া হত হয় জিনিসে, নইলে টাকায়। খাজনা দেওয়া ছাড়াও, ভূমিদাসদের প্রায়ই ভূস্বামীর তালুকে নানারকমের বেগার খাটতে হত।

ভূস্বামী যে উদ্বৃত্ত উৎপাদ আত্মসাৎ করত, সেটাকে বলে ভূমি-খাজনা, আর সামন্ততন্ত্রের আমলে শাসক শ্রেণীর আত্মসাৎ করা উদ্বৃত্ত উৎপাদকে বলে সামন্তীয় ভূমি-খাজনা।

ভূমিদাসের অবস্থাটা মোটের উপর ক্রীতদাসের অবস্থা থেকে বড় একটা পৃথক ছিল না। তবু, তা ক্রীতদাসের অবস্থা থেকে পৃথক, ভূমিদাস তার কিছুটা সময় দিতে পারত নিজের জমিতে, কাজেই, কিছু পরিমাণে সে নিজেই নিজের মালিক ছিল, এটা সমাজের বিকাশের যে-উপায় সৃষ্টি করেছিল সেটা দাসপ্রথার আমলে কল্পনাও করা যেত না।

সামন্ততান্ত্রিক সমাজে আর্থনীতিক উন্নয়নের সম্ভাবনা

অপরের শ্রম, কিংবা সেই শ্রমের উৎপাদ জমিদারের আত্মসাৎ করাটাই ছিল সমস্ত রকমের সামন্ততান্ত্রিক শোষণের মর্ম। তবে, শোষণের বিভিন্ন রূপ থেকে আসত সমাজের আর্থনীতিক উন্নয়নের বিভিন্ন রকমের সম্ভাবনা।

বেগারী ব্যবস্থায়, ভূস্বামী কিংবা তার গোমস্তার তদারকে কৃষক তার উদ্বৃত্ত শ্রম ঢালত ভূস্বামীর খেতে। খাজনার ব্যবস্থায় কৃষককে উদ্বৃত্ত শ্রম খাটাতে হত নিজের জমিখণ্ডে। আপাতদৃষ্টিতে, কৃষক তার কাজের সময় ব্যবহার করতে পারত নিজের ইচ্ছা অনুসারে, যদিও বাস্তবিকপক্ষে, ঐ সময়ের বেশ একটা অংশকেই তার দিয়ে চলতে হত ভূস্বামীর জমিতে।

বেগারী ব্যবস্থার আমলে ভূমিদাস যখন কাজ করত নিজের জমিখণ্ডে, কেবল সেই সময়েই সে শ্রমের উৎপাদিকাশক্তি বাড়াতে আগ্রহান্বিত থাকত। খাজনা-ব্যবস্থার আমলে সে দেখত, নিজের সমগ্র শ্রমেরই উৎপাদিকাশক্তি বাড়ানো লাভজনক।

টাকায় খাজনা চালু হবার পরে, ভূস্বামীকে নগদে খাজনা দিতে পারবার জন্যে কৃষক তার উদ্বৃত্ত শ্রমের উৎপাদ বাজারে ছাড়তে বাধ্য হত। কৃষকের খামার বাজারের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল

এইভাবে। কৃষকের খামারের স্বাভাবিক প্রকৃতি চলে যেতে থাকল, সেটা ক্রমাগত বেশি মাত্রায় পণ্য উৎপাদনে পরিণত হতে থাকল। পণ্য-বিনিময়ের বিকাশ কৃষকদের মধ্যে স্তরায়ণ ত্বরিত করল। বাজারের জন্যে উৎপাদন চালু হবার পরে কোন-কোন কৃষক ধনী হয়ে উঠল, কিন্তু বেশির ভাগ কৃষকই পড়ল দৈন্যদশায়।

মধ্যযুগীয় শহর। হস্তশিল্প

সামন্ততন্ত্রের গোড়ার পর্যায়গুলিতে শহর আর গ্রামাঞ্চলের মধ্যে তফাত ছিল সামান্যই। গ্রামগুলিতে কৃষকেরা বেশির ভাগ কারিগরী জিনিস তৈরি করত নিজেদের জন্যে আর ভূস্বামীদের জন্যে। শহরগুলির মানুষ কারিগরী আর বাণিজ্যের কাজ করত, আবার জমি চাষও করত।

গোড়ায় কারিগরেরা কাজ করত ফরমাশ অনুসারে, তারা ব্যবহার করত সামন্ত মনিব কিংবা কৃষকদের কাছ থেকে পাওয়া মালমশলা, এরা পারিশ্রমিক দিত সাধারণত জিনিসে। শ্রমের হাতিয়ারগুলো ছিল অতি আদিম ধরনের, সেগুলো ছিল কারিগরের সম্পত্তি। তার তৈরি করা জিনিস বাজারে বড় একটা পড়ত না। ঐ পর্যায়ে হস্তশিল্প ছিল বদ্ধ অবস্থায়, তেমনি কৃষকের ক্ষুদ্রায়তনের খামারের কাজও।

তবে, কালক্রমে, কারিগরেরা পণ্য-বিনিময়ের মধ্যে গিয়ে পড়েছিল। ফরমাশ অনুসারে কাজ করা ছাড়াও, তারা বাজারের জন্যে উৎপাদন আরম্ভ করেছিল। হস্তশিল্পগুলো ক্রমাগত বেশি লাভজনক হয়ে উঠতে থাকলে শহরের বাসিন্দারা কৃষিকাজ ছেড়ে দিয়েছিল। কৃষকেরা কিনতে আরম্ভ করেছিল শহুরে কারিগরদের উৎপন্ন জিনিসপত্র।

হস্তশিল্প আর কৃষিকাজের মধ্যে এবং শহর আর গ্রামের মধ্যে চূড়ান্ত বিভাগ এসেছিল এইভাবে।

কৃষকদের মতো নয় — কারিগর নিজের শ্রমের উৎপাদ ব্যবহার করে বেঁচে থাকতে পারত না। তার জাতদ্রব্যাদির বিনিময়ে পেতে হত আবশ্যক জীবনোপায় এবং কাঁচামাল, যা না হলে তার পেশা চালিয়ে যাওয়া সম্ভব ছিল না। কাজেই, হস্তশিল্পের উন্নয়ন ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট ছিল বাণিজ্যবৃদ্ধির সঙ্গে।

গোড়ায় বাণিজ্য চলত কেবল কারিগর আর ভূমিদাসদের যোগানো জাতদ্রব্য নিয়ে, আর তাছাড়া, দূর-দূর দেশ থেকে আনা জিনিসপত্র নিয়ে। কিন্তু, বাণিজ্যের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে যোগানের এইসব উৎস অপ্রতুল হয়ে দাঁড়াল আর, অন্যদিকে, উৎপাদন সম্প্রসারিত করার প্রয়োজন হয়ে পড়ল, অর্থাৎ কিনা, দরকার হল বৃহদায়তনের উৎপাদন।

প্রথম-প্রথম বড় কারবারগুলি স্থাপিত হয়েছিল ইতালিতে চোদ্দ শতকের শেষে এবং অন্যান্য দেশে ষোল শতকে। এগুলি ছিল পুঁজিতান্ত্রিক কারখানা। এগুলির মালিক ছিল পুঁজিপতিরা, তারা জন খাটাত।

পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদন-সম্পর্ক দেখা দিতে আরম্ভ করেছিল সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার ভিতরেই।

সামন্ততন্ত্রের পতন

দাসপ্রথার সঙ্গে তুলনায় সামন্ততন্ত্র ছিল সামাজিক বিকাশের ক্ষেত্রে একটা অগ্রপদক্ষেপ। সামাজিক শ্রমবিভাগ সম্প্রসারিত হল, পণ্য-বিনিময়ের পরিধি বাড়ল, ধীরে উৎপাদন-প্রযুক্তির উন্নতি ঘটল — বিশেষত শহুরে কারিগরিতে।

স্বাভাবিক অর্থনীতির তলা ক্ষয়ে দিল বিনিময়, এই বিনিময়ের বৃদ্ধি একই সঙ্গে সামন্ততান্ত্রিক উৎপাদনপ্রণালীরও ভিত ক্ষয় করে দিল। এরই সঙ্গে সঙ্গে, বিভিন্ন দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ এবং সর্বনাশা মহামারীর দরুন বিভিন্ন পয়মন্ত অঞ্চল শ্মশানে পরিণত হয়েছিল, জনসংখ্যা অনেক কমে গিয়েছিল।

সামন্ততন্ত্র থেকে এমনসব শক্তি দেখা দিয়েছিল, যেগুলি পরে সামন্ততান্ত্রিক কাঠামের ভিতরে আর আঁটছিল না। সামন্ততন্ত্র খতম হল — যেসব বুর্জোয়া তার ভিতরে সামনে এসে গিয়েছিল তাদের চাপে এবং নিপীড়িত আর নির্মমভাবে শোষিত জনগণের শ্রেণীসংগ্রামের আঘাতে-আঘাতে, — এই জনগণ বুঝতে পেরেছিল, বিদ্যমান অবস্থায় তাদের অস্তিত্ব আর সম্ভব ছিল না।

ভূমিদাসপ্রথার সমগ্র কালপর্যায়ে কৃষকেরা প্রচন্ড লড়াই চালিয়েছিল সামন্ত মনিব আর তাদের শাসনের বিরুদ্ধে। সামন্ততন্ত্রের শেষ কালপর্যায়ে ভূমিদাসদের উপর শোষণের মাত্রা চড়েছিল একেবারে চূড়ান্ত পর্যায়ে — সেই সময়ে ঐ সংগ্রাম হয়ে উঠেছিল আরও বিশেষভাবে তীব্র।

বিভিন্ন কৃষক-যুদ্ধ সামন্ততন্ত্রের তলা ক্ষয়ে দিয়েছিল, তার পতন ঘটিয়েছিল। সামন্ততন্ত্রের পতন ত্বরিত করার জন্যে এবং সামন্ততান্ত্রিক শোষণের জায়গায় পুঁজিতান্ত্রিক শোষণ কায়েম করার জন্যে জায়মান বুর্জোয়ারা ভূমিদাসদের সংগ্রামের সুযোগ ব্যবহার করেছিল। বুর্জোয়া বিপ্লবগুলো সামন্ত মনিবদের শাসন উৎখাত ক'রে পুঁজিতন্ত্রের বিকাশের বিস্তৃত সম্ভাবনা খুলে ধরেছিল -- ঐসব বিপ্লবে বেশির ভাগ লড়িয়ে ছিল কৃষকেরা।

পুঁজিতন্ত্রের আমলে সামন্ততন্ত্রের বিভিন্ন অবশেষ

সামন্ত ভূস্বামীদের হাত থেকে ক্ষমতা দখল করে নেবার পরে শিগগিরই বুর্জোয়ারা সচেতন হয়ে বুঝল উঠতি শ্রমিক শ্রেণী তাদের অস্তিত্ব বিপন্ন করছে, অমনি তারা ঝটিতি তাদের একটু-আগেকার শত্রুদের সঙ্গে রফা করে ফেলল। বেশির ভাগ দেশেই শাসক বুর্জোয়ারা সামন্ততান্ত্রিক ভূমিস্বত্ব ব্যবস্থাটাকে অক্ষত রেখে দিল — ফলে, বিশাল-বিশাল ভূমিখণ্ড রয়ে গেল মুষ্টিমেয় ভূস্বামীদের দখলে। কৃষকদের উপর ভূস্বামীদের শোষণ চলতেই থাকল — শুধু রকমটা বদলালো।

সামন্ততন্ত্রের অবশেষগুলো আরও বিশেষভাবে পীড়াদায়ক হল অর্থনীতিগতভাবে অনগ্রসর দেশগুলিতে — এইসব দেশে মানুষের উপর চাপল পুঁজিতান্ত্রিক আর সামন্ততান্ত্রিক উৎপীড়নের ডবল বোঝা।

পুঁজিতান্ত্রিক ব্যবস্থা

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

পুঁজিতান্ত্রিক পণ্য উৎপাদন

১। ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধীনে পণ্য উৎপাদন

পণ্য উৎপাদনের উদ্ভবের উপযোগী অবস্থা

আগেই বলা হয়েছে, বিক্রির জন্যে, বিনিময়ের জন্যে উৎপন্ন জাতদ্রব্যকে বলা হয় পণ্য ; যে-অর্থনীতিতে জিনিস উৎপন্ন করা হয় বিনিময়ের জন্যে, তাকে বলে পণ্য অর্থনীতি। যে-অর্থনীতিতে জিনিস তৈরি করা হয় সরাসরি ব্যবহারের জন্যে — বিক্রির জন্যে নয়, তাকে বলে স্বাভাবিক অর্থনীতি।

পুঁজিতান্ত্রিক কল-কারখানা তাদের সমস্ত উৎপাদই তৈরি করে বিক্রির জন্যে। পুঁজিতন্ত্রের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে ছোট উৎপাদকেরা তাদের উৎপাদের ক্রমাগত বেশি-বেশি অংশ বাজারে ছাড়ে।

পণ্য উৎপাদনের বনিয়াদ হল সামাজিক শ্রমবিভাগ, তাতে সমাজের পৃথক-পৃথক ব্যক্তি বিভিন্ন উৎপাদ উৎপন্ন করে। কিন্তু, স্বাভাবিক অর্থনীতির পণ্য উৎপাদনে পরিণত হবার জন্যে সামাজিক শ্রমবিভাগ ছাড়াও থাকা চাই উৎপাদনের উপকরণের উপর ব্যক্তিগত মালিকানা।

সাদাসিধে এবং পঁুজিতান্ত্রিক পণ্য উৎপাদন

বড়-বড় পঁুজিতান্ত্রিক কল-কারখানা যখন ছিল না, তখন উৎপাদন চালাত ছোট পণ্য উৎপাদকেরা — কৃষক আর হস্তশিল্পীরা। তারা কাজ করত নিজেরাই, জন খাটাত না, শ্রমের হাতিয়ার ছিল তাদেরই। সাদাসিধে পণ্য উৎপাদন নামে পরিচিত এই রকমের অর্থনীতির একটা গুরুত্বসম্পন্ন উপাদান পঁুজিতান্ত্রিক পণ্য উৎপাদনের সঙ্গে অভিন্ন: উৎপাদনের উপকরণের উপর ব্যক্তিগত মালিকানা উভয়েরই বনিয়াদ। তবে, এরই সঙ্গে সঙ্গে, পঁুজিতান্ত্রিক উৎপাদন থেকে সাদাসিধে পণ্য উৎপাদনের সারবান পার্থক্য আছে: এর বনিয়াদ হল ছোট পণ্য উৎপাদকের ব্যক্তিগত শ্রম, আর পঁুজিতন্ত্রের বনিয়াদ হল মজুরি-শ্রমিকের শ্রম।

পণ্যের দ্বৈত প্রকৃতি

মানুষের কোন-না-কোন প্রয়োজন মেটাতে পারলে, তবেই শ্রমের উৎপাদ হয় পণ্য — এখানেই সেটার উপযোগ। শ্রমের উৎপাদের এই ধর্মটাকে বলা হয় উপযোগ-মূল্য। মাংস আর দুধের উপযোগ-মূল্য এই যে, এইসব জাতদ্রব্য মানুষের খাদ্যের প্রয়োজন মেটায়। ঝরনার জল, বুনো ফল এবং আরও অনেক জিনিস মানুষের শ্রমের জাতদ্রব্য নয়, কিন্তু এগুলিরও উপযোগ-মূল্য আছে।

স্বাভাবিক অর্থনীতি এবং পণ্য অর্থনীতি দুইয়েতেই শ্রমের উৎপাদ মানুষের বিভিন্ন নির্দিষ্ট প্রয়োজন মেটায়। কোন কৃষক নিজের ব্যবহারের জন্যে যে-রুটি তৈরি করে, সেটা তার খাদ্যের প্রয়োজন মেটায় — এইভাবে সেটা একটা উপযোগ-

মূল্য। কিন্তু, রুটি পণ্য হয়ে উঠলে তার আর একটা খুবই গুরুত্বসম্পন্ন ধর্ম দেখা দেয়: এটাকে অন্য যেকোন পণ্যের জন্যে বিনিময় করা যেতে পারে।

কোন পণ্যকে অন্য কোন পণ্যের সঙ্গে নির্দিষ্ট পরিমাণগত অনুপাতে বিনিময় করা যায়, অর্থাৎ, এটা হল যাকে বলা হয় একটা বিনিময়-মূল্য (কিংবা শুধু মূল্য)। শ্রমের কোন উৎপাদ পণ্য হয়ে উঠলে তাতে এই নতুন ধর্মটা জোটে। এইভাবে, কোন পণ্যের দুটো ধর্ম থাকে: উপযোগ-মূল্য এবং মূল্য।

শ্রম — মূল্যের বনিয়াদ

বিনিময়ের সময়ে বিভিন্ন উপযোগ-মূল্যের জিনিসের পরস্পরের মধ্যে সমীকরণ হয়। প্রকৃতপক্ষে, জিনিসপত্রের বিনিময় হয়, কারণ সেগুলির উপযোগ-মূল্য বিভিন্ন। যেসব জিনিস মানুষের বিভিন্ন প্রয়োজন মেটায়, কেবল সেগুলিকেই বিনিময় করা হয়।

বিভিন্ন পণ্য-বিনিময়ের পরিমাণগত অনুপাত প্রায়ই ওঠে-পড়ে। তবু, এইসব ওঠা-পড়া যতই বেশি হোক না কেন, দৃষ্টান্তস্বরূপ, এক টন তামা সবসময়েই এক টন ঢালাই লোহার চেয়ে দামী এবং এক টন রুপো কিংবা, বিশেষত, এক টন সোনার চেয়ে শস্তা। এইভাবে, বিভিন্ন পণ্য-বিনিময়ের পরিমাণগত অনুপাতের একটা কমবেশি মজবুত বনিয়াদ থাকে।

যেকোন পরিমাণগত তুলনায় ধরেই নিতে হয় যে, যেসব জিনিসের মধ্যে তুলনা করা হচ্ছে সেগুলির একটা সাধারণ ধর্ম আছে। অনেক সময়ে একেবারে বিভিন্ন জিনিসের মধ্যে তুলনা করা হয়, কিন্তু সেগুলিতে সাধারণ একটাকিছু থাকলে, একমাত্র তবেই তা করা যায়। এই সাধারণ ধর্মটার পরিমাপ করা চলতে পারে, এটাও আবশ্যক। কী এই সাধারণ ধর্মটা?

একেবারে বিভিন্ন উপযোগ-মূল্যের বিভিন্ন পণ্যে সাধারণ ধর্ম আছে শুধু একটাই: সেগুলি সবই মানুষের শ্রমের উৎপাদ। এই ধর্মটার পরিমাপ করা যায়: কোন একটা পণ্য উৎপাদন করতে যত সময় লাগে, সেটা দিয়ে শ্রমের পরিমাপ হয়। বিভিন্ন পণ্য উৎপাদনে ব্যয় করা শ্রমের পরিমাণ দিয়েই একটা পণ্যের সঙ্গে অন্যটার বিনিময়ের অনুপাত নির্ধারিত হয়।

সামাজিকভাবে আবশ্যক শ্রম-কাল

একই পণ্য উৎপাদন করতে বিভিন্ন উৎপাদক বিভিন্ন পরিমাণ শ্রম ব্যয় করতে পারে। কিন্তু, পণ্যটা উৎপাদন করতে কোন একজন উৎপাদক কতটা শ্রম ব্যয় করেছে, সেটা ক্রেতা গ্রাহ্য করে না।

কোন পণ্য উৎপাদন করতে প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে কতটা শ্রম ব্যয় করা হয়েছে, তার উপর ঐ পণ্যের মূল্য নির্ভর করে না। কোন একটা সমাজে উৎপাদনের প্রযুক্তিগত মাত্রার পক্ষে মানানুযায়ী অবস্থায় এবং দক্ষতা আর শ্রমের তীব্রতার গড় মাত্রায় কোন একটা পণ্য উৎপন্ন করতে যে-পরিমাণ শ্রম-কাল লাগে, সেটা দিয়েই ঐ পণ্যের মূল্য নির্ধারিত হয়।

কোন একটা পণ্য উৎপন্ন করতে যে গড় পরিমাণ শ্রম-কাল দরকার হয়, সেটাকে বলা হয় সামাজিকভাবে আবশ্যক শ্রম-কাল, এটাই ঐ পণ্যের মূল্য নির্ধারণ করে।

কোন পণ্যে অঙ্গীভূত শ্রমের দ্বৈত প্রকৃতি

জানা আছে, পণ্য হল উপযোগ-মূল্য এবং মূল্য, এই দুইই। পণ্যে অঙ্গীভূত শ্রমের প্রকৃতিও দ্বৈত।

শ্রমে উৎপন্ন উপযোগ-মূল্যগুলিরই মতো শ্রমও বহুবিধ।

বিভিন্ন রকমের শ্রমের মধ্যে পার্থক্য হয় সেগুলির উদ্দেশ্য, প্রণালী, উপকরণ, বস্তু এবং ফলাফল অনুসারে। প্রত্যেকটা উপযোগ-মূল্যে অঙ্গীভূত থাকে একটা বিশেষ-নির্দিষ্ট ধরনের শ্রম: কয়লায় অঙ্গীভূত থাকে খনি মজুরের শ্রম, পোশাক-পরিচ্ছদে দরজীর শ্রম, ইস্পাতে ধাতুকরের শ্রম, ইত্যাদি।

কিন্তু, বিনিময়ের সময়ে এইসব বিভিন্ন পণ্যের মধ্যে তুলনা এবং সমীকরণ হয়। বিভিন্ন পণ্যের সমীকরণে সেগুলির উপযোগ-মূল্য গ্রাহ্য করা হয় না — কেননা, সেগুলির তুলনা চলে না। কিন্তু, বিভিন্ন পণ্যের উপযোগ-মূল্য অগ্রাহ্য করার সঙ্গে সঙ্গে উৎপাদকেরা সেগুলির উৎপাদনে অঙ্গীভূত বিভিন্ন মূর্ত-নির্দিষ্ট ধরনের শ্রমের মধ্যে পার্থক্যগুলোকেও উপেক্ষা করে। পণ্য সাধারণভাবে মানুষের শ্রমের উৎপাদ বলে গণ্য। কাজেই, পণ্যে অঙ্গীভূত শ্রম সমসত্ত্ব বলে গণ্য — সাধারণভাবে মানুষের শ্রমশক্তির ব্যয়, অর্থাৎ, বিমূর্ত শ্রম। বিভিন্ন উৎপাদকের খাস শ্রমশক্তিব্যয়ের মধ্যে তফাত গুণিত নয় — পরিমাণগত।

কাজেই, এর থেকে ব্যাপারটা দাঁড়ায় এই যে, পণ্য উৎপাদকের শ্রম হল, একদিকে, খাস উপযোগ-মূল্য সৃষ্টি করা মূর্ত-নির্দিষ্ট শ্রম এবং, অন্যদিকে, সাধারণভাবে শ্রমব্যয়, বিমূর্ত শ্রম, সামাজিক শ্রমের একটা হিস্‌সা, যাতে সৃষ্টি হয় খাস পণ্যের মূল্য।

এইভাবে, পণ্যের দ্বৈত প্রকৃতিটা তাতে অঙ্গীভূত শ্রমের দ্বৈত প্রকৃতির অবশ্যম্ভাবী পরিণতি।

সাদাসিধে এবং জটিল শ্রম

পণ্যের মূল্য হল সাধারণভাবে মানুষের শ্রমব্যয়। কিন্তু, যে-শ্রমে বিভিন্ন উপযোগ-মূল্য সৃষ্টি হয়, সেটা দক্ষতার দিক থেকে বিভিন্ন হতে পারে।

অদক্ষ শ্রমিকের কোন প্রস্তুতিমূলক তালিম থাকে না। কিন্তু, দৃষ্টান্তস্বরূপ, ইস্পাত ঢালাইকর, টার্নার কিংবা তাঁতীর প্রস্তুতিমূলক তালিম পাওয়া আবশ্যক। প্রথম ক্ষেত্রে জিনিসটা হল সাদাসিধে শ্রম, আর দ্বিতীয় ক্ষেত্রে — জটিল শ্রম।

কোন পণ্য হতে পারে অতি জটিল শ্রমের উৎপাদ, কিন্তু তার মূল্যের সমীকরণ হয় সাদাসিধে শ্রমের উৎপাদের সঙ্গে। জটিল শ্রম হল বহুলীকৃত সাদাসিধে শ্রম; এক ঘণ্টার জটিল শ্রমে যে-মূল্য সৃষ্টি হয়, সেটা উৎপন্ন করতে লাগে কয়েক ঘণ্টার সাদাসিধে শ্রম।

সাদাসিধে পণ্য উৎপাদনের দ্বন্দ্ব

ব্যক্তিগত সম্পত্তির বনিয়াদে দাঁড়ানো সমাজে ছোট হস্তশিল্পী কিংবা বড় পুঁজিপতি, প্রত্যেকটি উৎপাদক কাজ করে নিজের ঝুঁকিতে। প্রত্যেকটি উৎপাদক স্বাধীন, উৎপাদন হল তার নিজের ব্যবসা, তার শ্রম — তার নিজের ব্যাপার।

এরই সঙ্গে সঙ্গে, প্রত্যেকটি পণ্য উৎপাদক অন্যান্য পণ্য উৎপাদকের উপর নির্ভরশীল। জীবনোপায় পাবার জন্যে এবং ব্যবসা করার জন্যে তার উৎপন্ন পণ্যগুলোকে বিনিময় করা দরকার, সেগুলোকে বিক্রি করা দরকার কাঁচামাল আর হাতিয়ার কেনার জন্যে এবং নিজের আর নিজের পরিবারের প্রয়োজনীয় ভোগ্য পণ্য কেনার জন্যে। সমাজ তার প্রয়োজনগুলো মেটাবার জন্যে মোট যে-পরিমাণ শ্রমব্যয় করে, ব্যক্তি-উৎপাদকের শ্রম তার একটা বিশেষ-নির্দিষ্ট হিস্সা হওয়া চাই। পণ্যে অঙ্গীভূত সামাজিক শ্রমই পণ্যের মূল্য সৃষ্টি করে। ব্যক্তিগত আর সামাজিক শ্রমের মধ্যেকার দ্বন্দ্বেই নিহিত থাকে সাদাসিধে পণ্য উৎপাদনের দ্বন্দ্ব, সেটা পুঁজিতন্ত্রের আমলে আরও বেড়ে চলে।

২। পংজিতন্ত্রের আমলে অর্থ

অর্থের সারমর্ম

কোন পণ্যের মূল্য প্রকাশ করা যায় কেবল আর-একটা পণ্যের সঙ্গে সেটার সমীকরণ দিয়ে, আর-একটা পণ্যের সঙ্গে সেটাকে বিনিময় ক'রে। উন্নত পণ্য অর্থনীতিতে জিনিসের বিনিময় সাধারণত সরাসরি হয় না। একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থের সঙ্গে সমস্ত পণ্যের সমীকরণ হয়। অর্থ ছাড়া উন্নত ধরনের পণ্য উৎপাদনের কথা কল্পনা করা যায় না — কেননা, পণ্য উৎপাদনের আমলে বিচ্ছিন্ন পৃথক-পৃথক উৎপাদকদের মধ্যে বিদ্যমান সর্বাঙ্গীণ সামাজিক যোগসূত্রটাকে সম্ভব করে অর্থই।

প্রত্যেকটা পণ্যের বিনিময় হওয়া চাই অর্থের জন্যে, অর্থাৎ কিনা, পণ্যটা বিক্রি হওয়া চাই। সেটাকে বিক্রি করা না গেলে উৎপাদকের শ্রম যায় বৃথাই। তার মানে, উৎপাদক তার শ্রম এবং উৎপাদনের উপকরণের অপচয় করেছে এমন পণ্য উৎপাদনে, যার জন্যে কোন সামাজিক চাহিদা নেই। পণ্যটাকে অপেক্ষাকৃত কম দামে বিক্রি করতে হলে, তার মানে, উৎপাদকের শ্রমের একাংশকে সমাজ স্বীকার করে নি। এইভাবে, অর্থের উদ্ভব পণ্যে নিহিত দ্বন্দ্বগুলোর বৃদ্ধি আর বিকাশ ঘটায়।

অর্থের মাধ্যমেই বিনিময় ঘটলে ধরেই নিতে হয় যে, পণ্য উৎপাদকদের মধ্যে সর্বতোমুখী সংযোগ রয়েছে এবং তাদের লেনদেনগুলো সর্বক্ষণ জড়াজড়ি করে চলে। সঙ্গে সঙ্গে, অর্থের মাধ্যমেই বিনিময়ের কল্যাণে কেনা থেকে বেচাকে পৃথক করা সম্ভব হয়। উৎপাদক তার পণ্য বিক্রি

ক'রে আয়টাকে কিছুকালের জন্যে হাতে রাখতে পারে।

কিন্তু, বিনিময়ে অন্যান্য পণ্য না কিনে কোন কোন পণ্য বিক্রি করা হলে, উৎপাদকদের মধ্যে বিদ্যমান সর্বাঙ্গীণ যোগসূত্র এবং উৎপাদকদের পরস্পর-নির্ভরের দরুন কোন-কোন পণ্য বিক্রি হতে দেরি হয় এবং সংকটে-ঠাসা পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়। পণ্য উৎপাদনের আরও বিকাশ এবং সেটার পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদনে রূপান্তরিত হবার ফলে সংকট সম্ভব হয়ে ওঠে শুধু তাই নয়, সেটা হয় অনিবার্য।

বিভিন্ন পণ্যের বিনিময়ের মধ্যে দেখা যায় যারা পণ্য উৎপাদন করে তাদের মধ্যেকার সম্পর্ক। এইভাবে, মূল্য প্রকাশ করে উৎপাদনের সামাজিক সম্পর্ক — উৎপাদন-সম্পর্ক।

মানুষে-মানুষে এই সম্পর্কটা প্রকাশ পায় পণ্যরূপী বিভিন্ন জিনিসের মধ্যে সম্পর্ক হিসেবে, আর পণ্যের মূল্যটাকে মনে হয়, দৃষ্টান্তস্বরূপ, তার রঙ কিংবা ওজনেরই মতো একটা স্বাভাবিক ধর্ম। যেমন, লোকে বলে, একখানা পাউরুটির ওজন এত গ্রাম্, তার দাম এত। কেবল সামাজিক সম্পর্কের একটা নির্দিষ্ট ব্যবস্থার কারণেই পণ্যের যেসব ধর্ম থাকে, সেগুলি ঐসব পণ্যের স্বাভাবিক ধর্ম বলে গণ্য। এটা হল পণ্য নিয়ে বস্তুভক্তি, যা পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদনে স্বাভাবিক। পুঁজিতান্ত্রিক সম্পর্কের মর্মটাকে, তার আসল প্রকৃতিটাকে গোপন ক'রে এই বস্তুভক্তি ঐ সম্পর্কটাকে একটা বিভ্রান্তিকর রূপ দেয়।

অর্থের বিভিন্ন কাজ

পুঁজিতান্ত্রিক সমাজে অর্থ নিম্নলিখিত কাজগুলি করে: (১) মূল্যের পরিমাপ, (২) একটা প্রচলন-মাধ্যম, (৩) সঞ্চয়নের

একটা উপায়, (৪) দেওনের একটা উপায় এবং (৫) সর্বজনীন অর্থ।

প্রত্যেকটা পণ্য একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থে বিক্রি হয়। অর্থের এই পরিমাণটায় প্রকাশ পায় পণ্যের মূল্য, আর কোন পণ্যের দাম হল তার মূল্যের আর্থিক প্রকাশ।

কোন পণ্য কেনার কিংবা বিক্রি করার আগে অর্থের হিসেবে তার মূল্যের পরিমাপ হওয়া, অর্থাৎ, তার দাম ধার্য হওয়া আবশ্যক। কোন পণ্যের যেকোন বিনিময়ের জন্যে, তার কেনা কিংবা বেচার জন্যে একটা পূর্বশর্ত হল অর্থের হিসেবে পণ্যটার মূল্যের পরিমাপ। এইসব লেনদেনে মূল্যের পরিমাপের কাজ করে অর্থ।

অর্থের হিসেবে কোন পণ্যের মূল্যের পরিমাপ হয়ে গেলে আসে চূড়ান্ত মুহূর্তটা: সেটা বিক্রি করা চাই, অর্থাৎ কিনা, সেটাকে বিনিময় করা চাই অর্থের সঙ্গে। অর্থের সাহায্যে সমাধা করা পণ্য বিনিময়কে বলা হয় পণ্য-প্রচলন।

এক্ষেত্রে প্রচলন-মাধ্যমের কাজ করে অর্থ। পণ্য-প্রচলন অর্থ-প্রচলনের সঙ্গে সরাসরি সংশ্লিষ্ট; কোন পণ্য যখন বিক্রেতার কাছ থেকে ক্রেতার হাতে চলে যায়, তখন অর্থ চলে ক্রেতার কাছ থেকে বিক্রেতার হাতে।

মূল্যের একটা পরিমাপ হিসেবে কাজ করার জন্যে অর্থকে যে নগদে থাকতেই হবে এমন কোন কথা নেই। একটাও মুদ্রা কিংবা একখানাও ব্যাঙ্কনোট ছাড়াই কোন দেশের সমগ্র সম্পদের মূল্যায়ন করা যায়। যেমন, আমরা যখন বলি, এত শ' কোটি দামের পণ্য উৎপন্ন হয়েছে এক বছরে, আমরা শুধু ভাবি একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থের কথা। তবে, প্রচলন-মাধ্যম হিসেবে অর্থের কথা উঠলে সেটা একেবারে অন্য ব্যাপার। এই কাজটা করার জন্যে অর্থ পাওয়া দরকার নগদে।

অর্থকে মূল্যের পরিমাপ হতে হলে তার নিজের একটা মূল্য থাকা চাই। তার উলটো, প্রচলন-মাধ্যম হিসেবে কাজ করার জন্যে অর্থের একটা মূল্য থাকতেই হবে, এমন কোন কথা নেই।

বিক্রেতা তার পণ্যের বদলে অর্থ নেয় তার বিনিময়ে অন্য পণ্য পাবার জন্যে, অর্থাৎ অন্য পণ্য কেনার জন্যে। কাজেই, প্রচলন-মাধ্যম হিসেবে কাজে ষোল-আনা-মূল্যের অর্থ সোনার জায়গায় আসতে পারে তার বিভিন্ন বদলি আর জামিন — সেগুলি হল নোট্ (ব্যাঙ্কনোট, কাগজী মুদ্রা) এবং রুপোর আর তামার মুদ্রা।

মূল্যের পরিমাপ হিসেবে কাজের জন্যে অর্থের পরিমাণটা তুচ্ছ। কিন্তু, অর্থ যখন প্রচলন-মাধ্যমের কাজ করে তখন থাকা চাই একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ।

একই সঙ্গে অনেক জায়গায় বিভিন্ন পণ্যের বেচা-কেনা চলে, তাই, কোন সময়ে কী পরিমাণ অর্থ প্রাপ্তিসাধ্য হওয়া দরকার, সেটা নির্ভর করে চলতি পণ্যগুলির মোট দামের উপর। তেমনি, সমস্ত দামের মোট পরিমাণটা নির্ভর করে চলতি পণ্যগুলির মোট পরিমাণ এবং প্রত্যেকটা পণ্যের দামের উপর। যেমন, এক বছরের মধ্যে অর্থের যোগান কতটা আবশ্যক, সেটা নির্ভর করে ঐ দুটো উপাদানের উপরই শুধু নয়, অর্থ-প্রচলনের হারের উপরও। অর্থের প্রচলন যত দ্রুত, ততই কম পরিমাণ অর্থ আবশ্যক হয়, এবং অন্যদিকে তার উলটো কায়দায়।

অর্থ হল সর্বজনীন সম্পদের জামিন। অর্থকে যেকোন সময়ে যেকোন পণ্যে রূপান্তরিত করা যায়। কাজেই, অর্থ ব্যবহৃত হয় সঞ্চয়নের উপায় হিসেবে কিংবা সম্পদ রাশীকৃত করার উপায় হিসেবে।

সঞ্চয়নের একটা উপায় হিসেবে ভূমিকা পালনের জন্যে অর্থের নিজস্ব একটা মূল্য থাকা চাই — যেমন সেটা দরকার মূল্যের পরিমাপ হিসেবে কাজের বেলায়। সঙ্গে সঙ্গে, অর্থ প্রাপ্তিসাধ্য হওয়া চাই নগদে, অর্থাৎ, একটা প্রচলন-মাধ্যমের বিশেষক ধর্ম তার থাকা চাই।

বিভিন্ন পণ্যের কেনা-বেচা প্রায়ই চলে ক্রেডিটে। ক্রেতা পণ্যটা পায়, কিন্তু বিক্রেতাকে দাম দেয় একটা নির্দিষ্ট সময়ের পরে। এক্ষেত্রে অর্থ হয় দেওনের উপায়। অর্থের এই কাজটার মধ্যে দেখা যায় বিনিময়ের সম্প্রসারণ। পৃথক-পৃথক পণ্য উৎপাদকের মধ্যে যোগসূত্রটা হয় আরও ঘনিষ্ঠ, তাদের পরস্পর-নির্ভরশীলতা বাড়ে। ক্রেতা হয়ে দাঁড়ায় দেনদার, আর বিক্রেতা হয় পাওনাদার।

শেষে, অর্থ আসে সর্বজনীন অর্থের ভূমিকায়। বিভিন্ন দেশের মধ্যে বিনিময়ে সোনা মূলত অন্য যেকোন পণ্যের মতো একটা পণ্য। তবে, বিশেষক পার্থক্যটা হল এই যে, এই পণ্যটিকে নেয় সবাই, নিতে নারাজ হয় না কেউই। কাজেই, বিভিন্ন দেশের মধ্যে বাণিজ্যে অর্থের কাজ করে সোনা।

সোনা এবং কাগজী মুদ্রা। মুদ্রাস্ফীতি

পুঁজিতান্ত্রিক সমাজে প্রচলনের জন্যে প্রয়োজনীয় অর্থের পরিমাণ সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে বেঁধে দেওয়া যায় না। বাজারের স্বতঃস্ফূর্তভাবে এদিক-ওদিক করার উপর সেটা নির্ভর করে।

পুঁজিতান্ত্রিক দেশগুলিতে কেনার জন্যে এবং দেওনের জন্যে ব্যবহৃত হয় সোনার মুদ্রার বদলে নোট। কাগজী মুদ্র

অবচিত হতে পারে। কাগজী মুদ্রা যখন ছাড়া হয় অত্যধিক পরিমাণে কিংবা পণ্য প্রচলন যখন ঘেটে যায়, তখন সেটা ঘটে। অত্যধিক পরিমাণে কাগজী মুদ্রা ছাড়ার দরুন অর্থের যে অবচয় তাকে বলা হয় মুদ্রাস্ফীতি।

শোষক শ্রেণীগুলো এবং বুর্জোয়া সরকারগুলো নিজেদের স্বার্থরক্ষার জন্যে অনেক সময়ে জনগণের জীবনযাত্রার মান নামিয়ে দেওয়া এবং মেহনতীদের উপর শোষণ তীব্রতর করার জন্যে ইচ্ছাকৃতভাবে মুদ্রাস্ফীতি ঘটায়।

৩। পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদনে মূল্যের নিয়ম

মূল্যের নিয়ম চালু থাকে কীভাবে

আগেই দেখা গেছে, কোন পণ্যের উৎপাদনে খাটানো সামাজিকভাবে আবশ্যক শ্রমের পরিমাণ দিয়ে ঐ পণ্যের মূল্য নির্ধারিত হয়। তাই বলে, প্রত্যেকটা পণ্যকেই যে বাস্তবে পুরোপুরি তার মূল্য অনুসারে বিনিময় করা হয়, তা কিন্তু নয়। পণ্যের মূল্য প্রকাশিত হয় সেটার দাম দিয়ে, অর্থাৎ, একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ দিয়ে। কিন্তু, বাজারের হাল, অর্থাৎ, যোগান আর চাহিদার মধ্যে পরিবর্তনশীল সম্পর্ক অনুসারে পণ্যের দাম অনবরত ওঠেনামে।

পৃথক-পৃথক পণ্য উৎপাদকদের সমাজে উৎপাদনে অরাজকতা চলে, ঐসব উৎপাদকই কাজ চালায় অন্ধভাবে, এলোপাতাড়ি, কোন পরিকল্পনা ছাড়াই। পণ্য বেশ সহজে বিক্রি হতে থাকলে তারা সেটা যতখানি সম্ভব উৎপন্ন করতে চেষ্টা করে। কিন্তু, কোন উৎপাদকের পণ্য যখন আর বাজার-চল থাকে না, কিংবা সেটা বিক্রি হতে পারে শুধু অলাভজনক কম দামে,

তখন সে সেটার উৎপাদন কমিয়ে কিংবা একেবারে বন্ধ করে দিয়ে অন্য কোন পণ্য উৎপাদন করতে বাধ্য হয়।

মূল্যের চারপাশে দাম অনবরত ওঠানামা করে, একমাত্র এইভাবেই পুঁজিতান্ত্রিক অর্থনীতিতে মূল্যের নিয়ম চালু থাকতে পারে। অসংখ্য ওঠানামার মধ্যে একটা হল, উৎপাদনের বিভিন্ন শাখার মধ্যে সামাজিক শ্রমের বণ্টন, যা যেকোন সমাজের অস্তিত্বের জন্যে একটা অপরিহার্য উপাদান।

পুঁজিতন্ত্রের আমলে পণ্য উৎপাদনের সর্বাত্মক প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে উৎপাদন আর ছোট পণ্য উৎপাদকদের হাতে থাকে না, সেটা চলে যায় পুঁজিপতিদের হাতে। এদের কারখানাগুলিতে খাটে শত-শত, হাজার-হাজার শ্রমিক। পণ্যগুলি প্রায়ই বিক্রি হয় পৃথিবীর অতি সুদূর সব এলাকায়। এমন অবস্থায় উৎপাদনের অরাজকতা প্রকাশ পায় ষোল-আনাই। এটা পুঁজিতন্ত্রের একটা অপরিহার্য অঙ্গ এবং এটা আরও বিশেষভাবে ধ্বংসাত্মক শক্তি হিসেবে দেখা দেয় সংকটের সময়ে।

পুঁজিতন্ত্রের উদ্ভব আর বিকাশে মূল্যের নিয়মের ভূমিকা

সামাজিকভাবে আবশ্যক শ্রম-কাল দিয়ে নির্ধারিত হয় পণ্যের মূল্য — এর বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পরিণতি ঘটে পণ্য উৎপাদকদের পক্ষে। গড় সামাজিক অবস্থায় যা দরকার তার চেয়ে বেশি শ্রম যে-উৎপাদক খাটায় পণ্য উৎপাদনের জন্যে, সে ঐ পণ্য বাবত যে-পরিমাণ অর্থ পায় তাতে অঙ্গীভূত হয় তার ব্যয় করা সময়ের একটা অংশমাত্র। তার বিপরীতে, সামাজিকভাবে আবশ্যক শ্রম-কালের চেয়ে কম শ্রম খাটিয়ে

যে পণ্য উৎপাদন করে সে আগে উল্লেখ-করা উৎপাদকের চেয়ে বেশি সুবিধে পায়।

উৎপাদনের অপেক্ষাকৃত সুবিধাজনক অবস্থা এবং অপেক্ষাকৃত বেশি লাভজনক পণ্য-বিনিময়ের জন্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতার লড়াই বেধে যায় পৃথক-পৃথক উৎপাদকদের মধ্যে, সেটা অবশ্যম্ভাবী, তাতে তাদের কারও-কারও সর্বনাশ হয়ে যায়, আর ধনী হয়ে ওঠে অন্য কেউ-কেউ। ধনীরা উৎপাদন সম্প্রসারিত করে, জন খাটায়, নতুন যন্ত্রপাতি কেনে — পুঁজিপতি হয়ে ওঠে। ছোট উৎপাদকদের বিরাট অংশটা দেনায় জড়িয়ে পড়ে, ধনীদের উপর নির্ভরশীল হয়ে যায়, তাদের সর্বনাশ ঘটে — তারা পড়ে যায় প্রলেতারিয়েতদের মধ্যে।

উৎপাদনের উপকরণে ব্যক্তিগত মালিকানার আওতায় মূল্যের নিয়মে অনিবার্যভাবেই উদ্ভূত এবং বিকশিত হয় পুঁজিতান্ত্রিক সম্পর্ক।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

পুঁজিতান্ত্রিক শোষণের সারবস্তু

১। পুঁজি এবং মজুরি-শ্রম

পুঁজিতন্ত্র উদ্ভবের উপযোগী অবস্থা

ক্ষুদ্র পণ্য উৎপাদনে থাকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা, তাতে কারও-কারও হয় সর্বনাশ, আর ধনী হয় অন্য কেউ-কেউ — সেই ক্ষুদ্র পণ্য উৎপাদনের বনিয়াদে পুঁজিতন্ত্রের উদ্ভব হল।

পুঁজিতন্ত্রের উদ্ভবের জন্যে দুটো প্রধান শর্ত অবশ্যপ্রয়োজনীয়: এক, অল্প কয়েক জনের হাতে সম্পদের সঞ্চয়ন এবং, দুই, বিপুল সংখ্যায় নিঃস্ব মানুষ দেখা দেওয়া, ব্যক্তিগতভাবে স্বাধীন হলেও, এদের না থাকে উৎপাদনের উপকরণ, না থাকে জীবনোপায়, এরা পুঁজিতন্ত্রের দাসত্বে আবদ্ধ হতে বাধ্য হয়।

পুঁজিতন্ত্রের একবার উদ্ভব হলে এই ব্যবস্থার আর্থনীতিক নিয়মাবলি অনুসারে পরস্পরবিরোধী বিভিন্ন শ্রেণীতে সমাজের বিভাগ অনিবার্য: পুঁজিপতিদের সম্পদ জমে উঠতে থাকে, আর, আগেরই মতো, সবকিছু থেকে বঞ্চিত হতে থাকে শ্রমিক শ্রেণী। পুঁজিতান্ত্রিক মালিকেরা এবং বিত্তহীন প্রলেতারিয়ানদের অস্তিত্ব পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদনের অপরিহার্য অবস্থা। পুঁজিতন্ত্রের উদ্ভবের জন্যে ঐতিহাসিক পূর্বশর্তের সৃষ্টি বলতে বুঝায় পুঁজির আদিম সঞ্চয়ন নামে পরিচিত

একটা প্রক্রিয়া — কেননা, এটা ঘটে পুঁজিতান্ত্রিক সঞ্চয়নের আগে।

পুঁজির আদিম সঞ্চয়ন

প্রত্যক্ষ উৎপাদকদের উৎপাদনের উপকরণ থেকে বঞ্চিত করাটা ছিল আদিম সঞ্চয়নের সমগ্র প্রক্রিয়ার বুনিয়াদ: সেটা হল ভূমি থেকে কৃষকদের বেদখল করা। সামন্ততন্ত্রের ভাঙনের কালপর্যায়ে ঘটেছিল সামন্ততান্ত্রিক অধীনতা থেকে কৃষকের মুক্তি, তার সঙ্গে এসেছিল আর-একটা 'মুক্তি', যা গুরুত্বে খাটো নয়, সেটা হল, কৃষক যে-ভূমিতে চাষ করত সেটা থেকে তার 'মুক্তি'। 'উদ্বৃত্ত' খেটে-খাওয়া মানুষ গ্রাম ছেড়ে গিয়ে হয়ে দাঁড়াল পুঁজির সহজলভ্য মজুরি-শ্রমিকবাহিনী।

কিন্তু, কেবল এরই ফলে পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদন দেখা দিতে পারত না, সেজন্যে অল্পসংখ্যক লোকের হাতে বিপুল পরিমাণ সম্পদ রাশীকৃত হওয়া দরকার ছিল। এই প্রক্রিয়াটা খুবই চাঙ্গা হয়ে উঠেছিল বড় বড় ভৌগোলিক আবিষ্কারের যুগে (পঞ্চদশ—ষোড়শ শতক)। আমেরিকা আবিষ্কারের পরে, অনায়াসে লক্ষ্মীলাভের সন্ধানে দলে দলে লোক গিয়ে জুটেছিল ঐ মহাদেশটিতে। ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলো পাঠিয়েছিল বিভিন্ন অভিযাত্রিদল, তারা পয়মন্ত দেশগুলিকে বিধ্বস্ত করেছিল, সেখানে লুটতরাজ চালিয়েছিল।

ইউরোপে, সর্বোপরি বৃটেনে পুঁজির আদিম সঞ্চয়নের সবচেয়ে ফলপ্রদ একটা উৎস ছিল সাগরপারের সমৃদ্ধ দেশগুলিতে লুটতরাজ। সব দেশেই মুষ্টিমেয় লোকের হাতে বিপুল পরিমাণ সম্পদ রাশীকৃত করাতে কর্তৃপক্ষ উৎসাহ যোগাত।

পুঁজিতন্ত্রের আমলে উৎপাদনের উপকরণের প্রধান অংশটা হল ছোট্ট একদল পুঁজিপতি আর ভূস্বামীদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি। জনসংখ্যার বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ মেহনতী জনগণের নিজেদের কোন উৎপাদনের উপকরণ নেই, তারা কল-কারখানা, খনি আর ভূমির মালিকদের দাসত্ববন্ধনে পড়তে বাধ্য।

পুঁজি কী?

একজন বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদ প্রশ্নটার উত্তর দিয়েছিলেন এইভাবে:

'আদিম অবস্থার মানুষ তার তাড়া-করা বুনো জানোয়ারটার উপর যে প্রথম পাথরখানা ছুড়ে মারল, প্রথম যে-দণ্ডখানাকে চেপে ধরে সে নাগালের বাইরেকার ফল পাড়ার জন্যে ব্যবহার করল, তাতে আমরা দেখতে পাই, একটা জিনিস বাগিয়ে নেবার উদ্দেশ্য হাসিল করতে অন্য একটা জিনিস বাগিয়ে নেবার ব্যাপার, এইভাবে আমরা আবিষ্কার করি পুঁজির উৎপত্তি।'

পুঁজির এই সূত্রটা বুর্জোয়াদের পক্ষে খুবই সুবিধের— কেননা, পুঁজি যেন ছিল বরাবরই, আর থাকবেও যেন বরাবর, এমনটা লোককে বিশ্বাস করানোই এর মতলব। কিন্তু, এটা আগাগোড়া ভুয়ো। ঐ পাথর আর দণ্ড হল শ্রমের হাতিয়ার— মানুষের উপর মানুষের শোষণের উপকরণ নয়। সাদাসিধে পণ্য উৎপাদনের আমলে বিভিন্ন পণ্যের মালিক তার জিনিসপত্র বিক্রি করে অন্যান্য জিনিস কেনার জন্যে। পণ্যের মালিকদের প্রয়োজনগুলো মেটানোই এই বিনিময়ের উদ্দেশ্য।

অর্থ বিনিয়োগ করায় পুঁজিপতিদের উদ্দেশ্য একেবারেই পৃথক। একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থের মালিক হয়ে তারা সেই পরিমাণটাকে বাড়াতে, অর্থাৎ, লাভ করতে সচেষ্ট হয়। তাদের বিনিয়োগ করা অর্থের পরিমাণ পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদনের প্রক্রিয়ায় বেড়ে চলে।

পুঁজি একটা বস্তু নয়, পুঁজি হল উৎপাদনের উপকরণের মালিক শ্রেণী এবং ঐসব উপকরণ থেকে বঞ্চিত, কাজেই, শোষণাধীন হতে বাধ্য শ্রেণীর মধ্যেকার একটা মূর্ত-নির্দিষ্ট সামাজিক সম্পর্ক। দালান-কোঠা, যন্ত্রপাতি, কাঁচামাল, তৈরি মাল — এসব জিনিস আপনাতেই পুঁজি নয়। কিন্তু, এগুলি হয়ে ওঠে শোষণের উপায়, অর্থাৎ পুঁজি, সেটা মূর্ত-নির্দিষ্ট সামাজিক সম্পর্কের আওতায় — যখন সমাজে দেখা দেয় দুটো পরস্পরবিরোধী শ্রেণী: উৎপাদনের উপকরণের ব্যক্তি-মালিকদের শ্রেণী এবং বিত্তহীন শ্রমিক — প্রলেতারিয়ানদের শ্রেণী। এই সামাজিক সম্পর্ক চিরস্থায়ী নয়। বরং তার উলটো : সামাজিক বিকাশের একটা বিশেষ নির্দিষ্ট পর্বে উদ্ভূত হয়ে সেটা বিকাশের অন্য একটা পর্বে, একটা পরবর্তী-পর্বে বিলুপ্ত হয়ে যায়।

রাশিয়ায় অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক মহাবিপ্লব এবং তারপরে কতকগুলি দেশে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের জয় কার্যক্ষেত্রেই প্রমাণ করে দিয়েছে যে, বুর্জোয়ারা যখন ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত হয় এবং উৎপাদনের উপকরণে ব্যক্তিগত মালিকানা বিলুপ্ত হয়ে যায়, তখন উৎপাদনের উপকরণ আর শোষণের উপায় থাকে না।

শ্রমশক্তি যখন একটা পণ্য

যে-সমাজে ব্যক্তিগত পংজিতান্ত্রিক সম্পত্তির প্রাধান্য, সেখানে জনসমষ্টির বেশির ভাগই মালিক শুধু একটা জিনিসের, সেটা তাদের শ্রমশক্তি, অর্থাৎ কিনা, কাজ করার সামর্থ্য। এই সামর্থ্য মানুষের থাকে যেকোন সমাজব্যবস্থায়ই। কিন্তু, একমাত্র পংজিতন্ত্রের আমলেই শ্রমশক্তি হয়ে ওঠে একটা পণ্য, অর্থাৎ, একটা বেচা-কেনার বস্তু। পংজিতন্ত্র হল পণ্য উৎপাদন বিকাশের সর্বোচ্চ পর্ব, তখন শ্রমশক্তিও একটা পণ্য।

পংজিতন্ত্র লোপ করার পরে শ্রমশক্তি আর পণ্য থাকে না। সমাজতান্ত্রিক সমাজে উৎপাদনের উপকরণ সমাজতান্ত্রিক সম্পত্তি। এক্ষেত্রে শ্রমজীবীরা শ্রমশক্তি বেচে না, তারা সেটাকে খাটায় বিভিন্ন কল-কারখানায়, যেগুলি সাধারণের সম্পত্তি।

শ্রমশক্তি, এই পণ্যটার বিভিন্ন বিশেষ-নির্দিষ্ট উপাদান

পংজিতান্ত্রিক কারখানায় শ্রমিক তার শ্রমশক্তি বিক্রি করে বরাবরকার জন্যে নয়, — দৈনিক, সাপ্তাহিক এবং মাসিক মজুরির বিনিময়ে সে সেটা করে একদিন, এক সপ্তাহ, এক মাস, এই রকমের নির্দিষ্ট সময়ের জন্যে।

যেকোন পণ্যের মতো শ্রমশক্তিরও একটা উপযোগ-মূল্য থাকে। আগেই দেখা গেছে, কোন পণ্য উৎপাদনে প্রয়োজনীয় সামাজিকভাবে আবশ্যক শ্রমের পরিমাণের উপর নির্ভর করে ঐ পণ্যের মূল্য। কাজেই, শ্রমশক্তি এই পণ্যটার মূল্য হল,

কোন শ্রমিকের প্রাণধারণ এবং কাজ করার সামর্থ্য পুনরুৎপাদনের জন্যে প্রয়োজনীয় পণ্যগুলির মূল্যের সমান। অর্থাৎ কিনা, শ্রমশক্তির মূল্য হল তার মালিকের অত্যাবশ্যক জীবনোপায়ের মূল্য।

পুঁজি চায় শ্রমশক্তির অবিরাম আগম। এই কারণে, শুধু নিজের নয়, পরিবারের ভরণপোষণেরও সুযোগ শ্রমিকের থাকা চাই। পুঁজির চাই অদক্ষ শ্রমিক এবং আধুনিক সূক্ষ্ম-জটিল যন্ত্রপাতি চালাবার দক্ষ শ্রমিক, এই দুইই — তাই, উঠতি পুরুষ-পর্যায়ের শ্রমিকদের তালিম বাবত কিছু খরচ-খরচাও শ্রমশক্তির মূল্যের অন্তর্ভুক্ত।

পণ্য হিসেবে শ্রমশক্তির মূল্যের ব্যাপারটা এমনই। কিন্তু, পণ্য হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে শ্রমশক্তির একটা উপযোগ-মূল্যও থাকে। যে-পুঁজিপতি শ্রমশক্তি কেনে, তার কাছে এটা একটা উপযোগ-মূল্য কিসে? তার কারণ, পুঁজিপতি শ্রমিককে কাজ করায় এবং শ্রমিকের শ্রম যে-মূল্য সৃষ্টি করে সেটা শ্রমশক্তি এই পণ্যটার মূল্যের চেয়ে বেশি। পুঁজিতান্ত্রিক শোষণের বন্দোবস্তটা বোঝা যায় শ্রমশক্তি এই পণ্যটার ঐ উপাদানটা দিয়ে।

২। উদ্বৃত্ত মূল্য উৎপাদন

শ্রমিকের উদ্বৃত্ত শ্রম — পুঁজিপতির সম্পদের উৎস

কারবার করতে নেমে পুঁজিপতি কেনে কিংবা গড়ে কারখানার ঘর-বাড়ি, কেনে যন্ত্রপাতি, মেশিনটুল, কাঁচামাল আর অন্যান্য মালমশলা, জালানি এবং উৎপাদনের অন্যান্য

অত্যাবশ্যক উপকরণ। কিন্তু, মানুষের জীবন্ত শ্রম যতক্ষণ খাটানো না হয় ততক্ষণ এসব জিনিস অসাড়, অনুৎপাদী।

পুঁজিপতি শ্রমিকদের মজুরি খাটায়, এই শ্রমিকেরা যন্ত্রপাতিগুলোকে চালু করে কাঁচামালগুলোকে পরিণত করে তৈরী জিনিসে, পণ্যে। তারপরে পুঁজিপতি এইসব পণ্য বিক্রি করে পাওয়া পয়সা দিয়ে কেনে কাঁচামাল আর অন্যান্য মালমশলা, শ্রমিকদের মাইনে দেয়, ইত্যাদি।

উৎপন্ন পণ্যের মূল্য কত?

প্রথমত এবং সর্বোপরি এই মূল্যের মধ্যে থাকে এটা উৎপাদনে ব্যবহৃত পণ্যগুলির মূল্য: কাঁচামালের আকারণ করা হয়, জালানি পোড়ানো হয়, যন্ত্রপাতির অবচয় ঘটে। ধরা যাক, এইসব পণ্যের মূল্য হল ২,০০,০০০ কর্ম-ঘণ্টা, কিংবা, অর্থের হিসেবে, ৪,০০,০০০ ডলার।

তাছাড়া, উৎপন্ন পণ্যের মূল্যের অন্তর্ভুক্ত থাকে কোন একটা কারখানায় শ্রমিকদের শ্রমে সৃষ্টি করা নতুন মূল্যটা। ধরা যাক, কারখানাটায় ২০০ লোক ১০০ দিন কাজ করেছে দিনে ৮ ঘণ্টা করে। ঐ সময়ে তারা যে নতুন মূল্য সৃষ্টি করেছে, তার পরিমাণ ১,৬০,০০০ কর্ম-ঘণ্টা, বা, অর্থের হিসেবে, ৩,২০,০০০ ডলার।

এইভাবে, উৎপন্ন পণ্যটার পূর্ণ মূল্য হল ৩,৬০,০০০ কর্ম-ঘণ্টা, বা, অর্থের হিসেবে, ৭,২০,০০০ ডলার।

এখন দেখা যাক, পণ্যটার জন্যে ঐ পুঁজিপতির খরচ পড়ল কত। উৎপাদনের জন্যে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি আর মালমশলা বাবত সে দিয়েছে ৪,০০,০০০ ডলার, অর্থাৎ, ২,০০,০০০ কর্ম-ঘণ্টার সমতুল পরিমাণ অর্থ। এই ২,০০,০০০ কর্ম-ঘণ্টা ছাড়াও, নতুন পণ্যটার মূল্যের অন্তর্ভুক্ত আছে ঐ পুঁজিপতির কারখানায় মজুরি খাটানো

শ্রমিকদের ব্যয় করা ১,৬০,০০০ কর্ম-ঘণ্টা। শ্রমিকদের শ্রম ৩,২০,০০০ ডলারের সমান নতুন মূল্য সৃষ্টি করেছে।

পুঁজিপতি কি এই মূল্যের সম-পরিমাণ পয়সা দিয়েছে শ্রমিকদের? এই প্রশ্নটার উত্তরের মধ্যে পুঁজিতান্ত্রিক শোষণের গোপনকথাটা ফাঁস হয়ে যায়। শ্রমিকের শ্রমে উৎপন্ন মূল্য, এবং তার শ্রমশক্তির মূল্য — এ হল দুটো পৃথক পরিমাণ। আগেরটা পরেরটার চেয়ে অনেক বেশি। এই দুইয়ের মধ্যে পার্থক্যটা শ্রমের উপর পুঁজির শোষণের অত্যাবশ্যক শর্ত — কেননা, শ্রমশক্তির মূল্য এবং শ্রমিকের শ্রম দিয়ে উৎপন্ন জিনিসগুলোর মূল্যের যে-পরিমাণ পার্থক্য সেটাকে পুরোপুরি আত্মসাৎ করে পুঁজিপতি।

পুঁজিপতি শ্রমিকদের পয়সা দেয় শুধু তাদের শ্রমশক্তির মূল্য বাবত। ধরা যাক, শ্রমিকটির অত্যাবশ্যক প্রয়োজনগুলি মেটাতে জীবনোপায় যা দরকার, তার জন্যে খরচ দিনে ৮ ডলার। সেক্ষেত্রে, ১০০ দিন কাজের জন্যে ২০০ শ্রমিককে মালিকটি দেয় ১,৬০,০০০ ডলার।

ঐ সময়ে কারখানায় উৎপন্ন পণ্য বাবত পুঁজিপতিটি পায় ৭,২০,০০০ ডলার। পণ্যটা উৎপাদনে তার খরচখরচা হয় ৪,০০,০০০ ডলার আর তার উপর ১,৬০,০০০ ডলার — অর্থাৎ, ৫,৬০,০০০ ডলার। তার পুঁজির পরিমাণ বাড়ল ১,৬০,০০০ ডলার।

আমাদের উদাহরণটায় একজন শ্রমিক দিনে ৮ ঘণ্টা কাজ করে ১৬ ডলার দামের নতুন মূল্য সৃষ্টি করল। শ্রমিকটির ৮-ঘণ্টার কর্ম-দিন বাবত তাকে দিল ৮ ডলার, অর্থাৎ, সে পয়সা দিল শুধু শ্রমশক্তির মূল্য বাবত, তার মানে, ৪-ঘণ্টার কাজে সৃষ্টি করা মূল্য বাবত। এইভাবে যা দাঁড়াল সেটা হল এই: শ্রমিকটি ৪ ঘণ্টা কাজ করল তার

শ্রমশক্তির মূল্যের ক্ষতিপূরণ বাবত, আর বাকি ৪ ঘণ্টা কাজ করল অমনি — পুঁজিপতির ভালাইয়ের জন্যে।

কাজেই, এর থেকে দেখা যাচ্ছে, পুঁজিতান্ত্রিক কারখানায় শ্রমিকের ব্যয় করা শ্রমকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। কর্ম-দিনের একাংশে সে তার শ্রমশক্তির মূল্যের সমান মূল্য উৎপন্ন করে। এটা আবশ্যক শ্রম। অপরাংশে সে যে-মূল্য উৎপন্ন করে সেটাকে কোন ক্ষতিপূরণ না দিয়েই পুঁজিপতি আত্মসাৎ করে। এটা উদ্বৃত্ত শ্রম।

শিল্পপতি আর সওদাগরদের লাভ, শেয়ারহোল্ডারদের ডিভিডেন্ড, সুদখোর আর ব্যাঙ্কারদের সুদ, ভূমি বাবত ভূস্বামীকে দেওয়া খাজনা এবং বুর্জোয়া সমাজের অন্যান্য সমস্ত বিনাশ্রমে পাওয়া আয়ের উৎস হল শ্রমিকের উদ্বৃত্ত শ্রম।

উদ্বৃত্ত মূল্য

শ্রমিকের উদ্বৃত্ত শ্রম দিয়ে সৃষ্টি করা মূল্য হল উদ্বৃত্ত মূল্য। শ্রমিকদের মাগনা শ্রম দিয়ে উৎপন্ন হয় উদ্বৃত্ত মূল্য। উদ্বৃত্ত মূল্য উৎপাদন এবং সেটাকে পুঁজিপতিদের আত্মসাৎ করাই পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদনপ্রণালীর চালিকাশক্তি।

উদ্বৃত্ত শ্রম ছিল পুঁজিতন্ত্র উদ্ভবের আগেও। মানুষের উপর মানুষের যেকোন শোষণই, বাস্তবিকপক্ষে, শোষিত শ্রেণীর উদ্বৃত্ত শ্রমটাকে শোষক শ্রেণীর আত্মসাৎ করার ব্যাপার। কিন্তু, দাসপ্রথা আর ভূমিদাসত্বের আমলে স্বাভাবিক অর্থনীতি ছিল প্রধান, তখন উদ্বৃত্ত শ্রম আত্মসাৎ করাটা ছিল সীমাবদ্ধ। নিজেদের প্রয়োজন আর খেয়ালখুশি মেটাবার জন্যে যত

দরকার, তত শ্রমই ক্রীতদাস-মালিক কিংবা ভূমিদাস-মনিবেরা নিঙড়ে নিত ক্রীতদাস কিংবা ভূমিদাসদের থেকে।

অন্যদিকে, পুঁজিপতিরা শ্রমিকদের উদ্বৃত্ত শ্রমের উৎপাদকে নগদ পয়সায় রূপান্তরিত করে। আরও উদ্বৃত্ত মূল্য উৎপাদনের জন্যে অতিরিক্ত পুঁজি হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে ঐ অর্থ।

এই অবস্থায়, পুঁজিতন্ত্রের আমলে উদ্বৃত্ত শ্রমের জন্যে লালসার কোন সীমাপরিসীমা থাকে না। মজুরি-দাসদের উপর শোষণ প্রচণ্ডতর করার জন্যে পুঁজিপতিরা যেকোন এবং যাবতীয় উপায়ই ধরে। মার্কস বলে গেছেন, উদ্বৃত্ত শ্রমের জন্যে পুঁজির লালসা নেকড়ের মতোই হিংস্র।

স্থির এবং চল পুঁজি

উদ্বৃত্ত মূল্য উৎপাদনে পুঁজির বিভিন্ন উপাদানের ভূমিকা বিভিন্ন। পুঁজিপতি তার পুঁজির একাংশকে রূপান্তরিত করে উৎপাদনের উপকরণে: কারখানার দালান-কোঠা, যন্ত্রপাতি আর সরঞ্জাম, কাঁচামাল আর জ্বালানি। পণ্য উৎপাদনে ব্যয়িত এই সমস্ত দফার মূল্য তৈরি মালের মূল্যের অন্তর্ভুক্ত করা হয়, তার পরিমাণে কোন পরিবর্তন ছাড়াই। পুঁজির এই অংশটার মূল্যের পরিমাণ বদলায় না বলে এটাকে বলা হয় স্থির পুঁজি। *c* অক্ষরটা দিয়ে বুঝানো হয় স্থির (কনস্ট্যান্ট) পুঁজি।

পুঁজিপতি তার পুঁজির অন্য অংশটাকে ব্যয় করে শ্রমিক খাটাবার জন্যে — অর্থাৎ, শ্রমশক্তি কেনার জন্যে। শ্রম দিয়ে শ্রমিকেরা সৃষ্টি করে একটা নতুন মূল্য, সেটা শ্রমশক্তির মূল্যের চেয়ে বেশি, তা দেখানো হয়েছে আগেই। কাজেই,

এর থেকে দেখা যাচ্ছে, শ্রমিক খাটাবার জন্যে প‍ুঁজির যে-অংশটা খরচ হয় তার পরিমাণটা প‍ুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদনের প্রক্রিয়ায় বদলায় (বাড়ে)। তাই, শ্রমশক্তি কেনার জন্যে প‍ুঁজির যে-অংশটাকে খরচ করা হয় সেটাকে বলা হয় চল (ভ্যারিয়েবল) প‍ুঁজি, সেটাকে ব‍ুঝানো হয় v অক্ষরটা দিয়ে।

শোষণের হার

প‍ুঁজিতান্ত্রিক শোষণের তীব্রতা কতখানি? কর্ম-দিনটাকে যে-অন‍ুপাতে উদ্বৃত্ত আর আবশ্যক শ্রম-কালে ভাগ করা হয়, সেটা থেকে এ সম্বন্ধে একটা ধারণা পাওয়া যেতে পারে। যখন উদ্বৃত্ত শ্রম-কাল বাড়ে, আর আবশ্যক শ্রম-কাল কমে, তখন প‍ুঁজির শ্রম-শোষণের হার বাড়ে।

উদ্বৃত্ত (মাগনা) শ্রম উদ্বৃত্ত ম‍ূল্যের অঙ্গীভূত হয়, আর আবশ্যক (পারিশ্রমিক-দেওয়া) শ্রম হয় চল প‍ুঁজির সমতুল। চল প‍ুঁজির সঙ্গে উদ্বৃত্ত ম‍ূল্যের অন‍ুপাতকে বলা হয় উদ্বৃত্ত ম‍ূল্যের হার, সেটা হল শ্রমিকের উপর প‍ুঁজিপতির শোষণের হারের একটা স‍ূচক।

আমাদের উদাহরণটায় উদ্বৃত্ত ম‍ূল্যের হার হল:

$$\frac{\text{১,৬০,০০০ ডলারের উদ্বৃত্ত ম‍ূল্য}}{\text{১,৬০,০০০ ডলারের চল প‍ুঁজি}}$$

অর্থাৎ, ১০০%।

উদ্বৃত্ত ম‍ূল্য ব‍ুঝানো হয় m অক্ষরটা দিয়ে।

এইভাবে, উদ্বৃত্ত ম‍ূল্যের হার হল $\frac{m}{v}$।

প‍ুঁজিতন্ত্রের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে উদ্বৃত্ত ম‍ূল্যের হার বাড়ে। আজকাল প‍ুঁজিতান্ত্রিক দেশগ‍ুলিতে সেটা শতকরা ২০০ কিংবা ৩০০ ভাগ, কখনও-কখনও আরও বেশি।

যন্ত্রপাতির পুঁজিতান্ত্রিক প্রয়োগ এবং শ্রমিক শ্রেণী

লাভের সন্ধানে পুঁজিপতিরা সামাজিক উৎপাদনের গোটা ব্যবস্থাটাকে নতুন ছাঁচে ঢেলে নিয়েছে। আগে ছিল ক্ষুদ্রায়তনের উৎপাদন, তার বনিয়াদ ছিল কায়িক শ্রম, সেটার জায়গায় তারা সৃষ্টি করেছে বৃহদায়তনের শিল্প, এর বনিয়াদ হল যন্ত্রে-উৎপাদন।

পুঁজিতান্ত্রিক যন্ত্রশিল্প প্রথম দেখা দিয়ে বিকশিত হয়েছিল বৃটেনে। অল্পকালের মধ্যেই (অষ্টাদশ শতকের শেষ তৃতীয়াংশে এবং উনবিংশ শতকের গোড়ার দিকে) বৃটেনে বহুসংখ্যক যন্ত্র দেখা দিয়েছিল। শিল্প বিপ্লবে দেশের চেহারাটা আমূল বদলে গেল। কৃষিপ্রধান দেশ থেকে বৃটেন শিল্পসমৃদ্ধ শক্তিতে পরিণত হল। বৃহদায়তনের শিল্প শিগগিরই দেখা দিল অন্যান্য দেশেও।

পুঁজিপতিরা কি সব সময়েই তাদের কল-কারখানায় নতুন যন্ত্রপাতি বসাতে চেষ্টা করে? না, মোটেই তা নয়। কোন যন্ত্র পুঁজিপতির পক্ষে লাভজনক একমাত্র যখন যেসব শ্রমিকের জায়গায় যন্ত্রটা আসছে তাদের মজুরির চেয়ে যন্ত্রটা চালাবার খরচা কম পড়ে। তার মানে, মজুরি যত কম হয়, পুঁজিপতিদের নতুন যন্ত্রপাতি চালু করার আগ্রহের হারও ততই কম, তেমনি তার উলটো ধারায়।

পুঁজিতান্ত্রিক বিকাশের গোড়ার দিকে শ্রমিকেরা যন্ত্র প্রবর্তনের প্রচণ্ড বিরোধিতা করেছিল। কিন্তু, শ্রমিকেরা ইতস্তত বিক্ষিপ্ত স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিবাদ থেকে জরুরী স্বার্থের জন্যে সচেতন সংগ্রামে প্রবৃত্ত হলে তারা ষোল-আনাই বুঝতে

পারে, খাস যন্ত্রই শত্রু নয় — যন্ত্র ব্যবহৃত হয় যে পুঁজিতান্ত্রিক ব্যবস্থার আওতায় সেটাই তাদের শত্রু।

যন্ত্র শ্রমলাঘব করে বটে। কিন্তু, পুঁজিতন্ত্রের আমলে যন্ত্র শ্রমের তীব্রতা বাড়ায় যৎপরোনাস্তি।

প্রাকৃতিক শক্তিগুলোকে কায়দা করার লড়াইয়ে মানুষের বিশ্বস্ত মদতদার হয়েও, পুঁজিতান্ত্রিক সমাজে যন্ত্র শোষিতদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে শোষকদের হাতে একখানা ভয়ঙ্কর অস্ত্র। যন্ত্রপাতির সাহায্যে পুঁজিপতিরা শ্রমের অবস্থা আরও নিকৃষ্ট করে দেয় এবং বেড়ে-চলা শোষণের বিরুদ্ধে শ্রমিকদের প্রতিরোধটাকে ভেঙে দিতে চেষ্টা করে।

শ্রমের উৎপাদিকাশক্তি বাড়িয়ে যন্ত্র সামাজিক সম্পদ বাড়িয়ে তোলে। কিন্তু, তারই সঙ্গে সঙ্গে, পুঁজিতান্ত্রিক সমাজে শ্রমের বেড়ে-চলা উৎপাদিকাশক্তির সমস্ত ফলই যায় পুঁজিপতিদের হাতে।

এইভাবে, পুঁজিতন্ত্রের আমলে যন্ত্রপ্রয়োগের মধ্যে থাকে গভীর অন্তর্দ্বন্দ্ব, পুঁজিতান্ত্রিক ব্যবস্থা বজায় থাকলে সেটার মীমাংসা করা যায় না।

পুঁজিতন্ত্রের আমলে মজুরি
গোপন রাখে শোষণকে

আগেই দেখানো হয়েছে, পুঁজিতান্ত্রিক কল-কারখানায় মজুরি-শ্রমিকের শ্রমের দুটো অংশ আছে: মাগনা এবং পারিশ্রমিক-দেওয়া শ্রম। কিন্তু, পুঁজিপতি মজুরি দেবার সময়ে শ্রমিক দেখতে পায় না যে, ঐ মজুরি তার শ্রমের শুধু একটা অংশের ক্ষতিপূরণ করে, আর অন্য অংশটাকে পুঁজিপতি আত্মসাৎ করে। বরং উলটো, মজুরিটা দেওয়া হয়

এমনভাবে, যাতে মনে হয় শ্রমিক যেন পয়সা পেল তার গোটা শ্রম বাবতই।

মজুরি হিসেব করার উপায় আছে দুটো: হয়, কর্ম-কালের দৈর্ঘ্য অনুসারে — ঘণ্টা কিংবা সপ্তাহ (সময়-মজুরি), নইলে, উৎপন্ন জিনিসের পরিমাণ অনুসারে (ফুরনের মজুরি)। উভয় ক্ষেত্রেই ধারণা জন্মে যে, শ্রমিক যেন বিক্রি করল শ্রমশক্তি নয় — শ্রম, আর সে যেন ব্যয়-করা শ্রমের সবটা বাবতই পয়সা পেল।

শ্রমিকের উপর পুঁজিপতির শোষণ গোপন রাখে মজুরি, আর মনে হয় শ্রমিক বুঝি তার সবটা শ্রম বাবতই পুরো পারিশ্রমিক পেল — এই ব্যাপারটায় একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে পুঁজিতান্ত্রিক সমাজে। শ্রমিকেরা যতক্ষণ বুর্জোয়াদের মতাদর্শগত প্রভাবটাকে ঝেড়ে ফেলতে পারে না, ততক্ষণ অবধি তাদের মনে চেপে থাকে ঐ ভুয়ো ধারণাটা।

মজুরি-দাসত্ব

পুঁজিতান্ত্রিক সমাজে মজুরি-শ্রম মূলত মজুরি-দাসত্ব। রোমক ক্রীতদাসকে শিকল দিয়ে বেঁধে রাখা হত, আর, মার্কসের ভাষায়, মজুরি-শ্রমিক বাঁধা থাকে তার মালিকের অদৃশ্য সূত্রগুলো দিয়ে। উৎপাদনের পুঁজিতান্ত্রিক প্রণালীর অপ্রতিরোধ্য নিয়মগুলো শ্রমিককে পুঁজির রথচক্রে শৃঙ্খলিত রাখে ক'ষে।

পুঁজিতান্ত্রিক ব্যবস্থার সমর্থকেরা মেহনতীদের বুঝাতে চায় যে, পুঁজিতন্ত্রের আওতায় তারা শোষণের অবসান ঘটাতে পারবে। তারা দেখাতে চায়, পুঁজিতন্ত্র এমন একটা সমাজব্যবস্থা, যা সবাইকেই দেয় 'সমান সুযোগ'। এইসবই একেবারে ভুয়ো।

বাস্তবে, জনসংখ্যার বেশির ভাগকে, মেহনতী জনগণকে নগণ্য সংখ্যালঘুর শোষণের শিকার করে তোলে পুঁজিতন্ত্র। অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ, অপ্রতুল রোজগার, ক্রমে আরও নিকৃষ্ট হয়ে পড়া জীবনযাত্রার অবস্থা — এইগুলিই জোটে পুঁজিতান্ত্রিক সমাজে কোটি-কোটি মেহনতীর কপালে।

পুঁজিতান্ত্রিক সমাজে বন্দোবস্তটাই এমন, যাতে শ্রমিকেরা সর্বক্ষণই হয়ে থাকে বিত্তহীন প্রলেতারিয়ান — তাদের শ্রমশক্তি বিক্রি করা ছাড়া গত্যন্তর থাকে না।

বুর্জোয়া দেশগুলির আইন অনুসারে, আনুষ্ঠানিকভাবে, শ্রমিকেরা 'স্বাধীন'। শ্রমিক কোন একটা কারখানা ছেড়ে যেতে পারে, কিন্তু তাকে কাজ নিতে হয় অন্য পুঁজিপতির অধীনে। এইভাবে, পুঁজিতন্ত্রের আমলে 'স্বাধীনতা' হল শ্রমিকের উপর পুঁজিপতির শোষণ চালাবার পূর্ণাঙ্গ আর অবাধ স্বাধীনতা এবং পুঁজিপতিদের দাসত্ববন্ধনে নিজেদের বিকিয়ে দেবার জন্যে শ্রমিকদের 'স্বাধীনতা'।

পুঁজিতন্ত্রের আমলে 'সমানতার' সমস্ত বুলিই সমানই ভুয়ো। বিভিন্ন বুর্জোয়া বিপ্লব আইনের কাছে সমস্ত নাগরিকের সমানতা ঘোষণা করেছে। কিন্তু, যতক্ষণ শোষণ রয়েছে, ততক্ষণ মানুষের কোন সাচ্চা সমানতা থাকে না, তা থাকতে পারেও না, এটা দেখা যায় সহজেই।

পুঁজিতন্ত্রের বুনিয়াদী দ্বন্দ্ব

ব্যক্তিগত আর সামাজিক শ্রমের মধ্যে একটা পার্থক্য থাকে — সেটা সাদাসিধে পণ্য উৎপাদনের বেলায়ও। পুঁজিতন্ত্রের আমলে এই দ্বন্দ্বটা অন্য একটা দ্বন্দ্বে পরিণত হয় — সেটা হল উৎপাদনের সামাজিক প্রকৃতি এবং উৎপাদনের

ফলগুলিকে ব্যক্তিগতভাবে পুঁজিতান্ত্রিক কায়দায় আত্মসাৎ করার মধ্যেকার দ্বন্দ্ব।

আধুনিক শিল্পের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে উৎপাদন ক্রমাগত বেশি পরিমাণে সামাজিকীকৃত হয়ে ওঠে। প্রত্যেকটা কারখানায় কাজ করে শত-শত, হাজার-হাজার লোক। পৃথক-পৃথক কারখানাগুলোর মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ থাকে। এইভাবে, উৎপাদন-প্রক্রিয়ার মধ্যে লক্ষ-লক্ষ, কোটি-কোটি মানুষ সরাসরি সংশ্লিষ্ট হয় পরস্পরের সঙ্গে। কিন্তু, এই সামাজিক উৎপাদনের ফল গোটা সমাজের হাতে যায় না — সেটাকে আত্মসাৎ করে মুষ্টিমেয় ব্যক্তি মালিকেরা।

পুঁজি পৃথক-পৃথকভাবে প্রত্যেকটা কারখানায় শত-শত এবং হাজার-হাজার শ্রমিককে সংগঠিত করে, কিন্তু সমগ্রভাবে সামাজিক উৎপাদনের উপর চলে উৎপাদনের অরাজকতার রাজত্ব। পুঁজিতন্ত্রের এই বুনিয়াদী দ্বন্দ্বটা প্রকাশ পায় বিভিন্ন রূপে: উৎপাদনে অরাজকতা, প্রসার্যমান উৎপাদন থেকে ক্রয়ক্ষমতাসম্পন্ন বাস্তবিক চাহিদার পিছিয়ে পড়া এবং শ্রমিক শ্রেণী আর পুঁজিপতিদের মধ্যে শ্রেণীসংগ্রাম।

উদ্বৃত্ত মূল্য তত্ত্বের তাৎপর্য

পুঁজিতন্ত্রের আমলে শোষণটাকে ঢেকে-গুঁজে রাখা হয়। শ্রমের উপর পুঁজির শোষণের মর্মবস্তুটাকে খুলে ধরল মার্কসীয় অর্থশাস্ত্রই। মার্কসের গড়ে-তোলা উদ্বৃত্ত মূল্যের তত্ত্বে প্রকাশ করে দেওয়া হল পুঁজিতান্ত্রিক শোষণের গোপনকথাটাকে।

পুঁজিতান্ত্রিক দেশগুলিতে শ্রমিক শ্রেণী এবং সমস্ত মেহনতী মানুষের দৈন্যদশা আর দুর্ভোগের আসল কারণগুলোকে লক্ষ্য করতে তাদের শেখায় উদ্বৃত্ত মূল্যের

তত্ত্বটি। এই তত্ত্ব দেখিয়ে দেয় যে, শ্রমিক শ্রেণীর উপর, সমস্ত মেহনতী মানুষের উপর নিপীড়নটা চলে কোন আপাতিক কারণেও নয়, কিংবা পৃথক-পৃথক পুঁজিপতিদের খামখেয়ালী শাসনের দরুনও নয় — সেটা আসে পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদন-সম্পর্কের মর্ম থেকেই।

উদ্বৃত্ত মূল্যের তত্ত্ব খুলে ধরে পুঁজিতান্ত্রিক শোষণের মর্মটাকে। লেনিন বলেছিলেন, উদ্বৃত্ত মূল্যের তত্ত্ব হল মার্কসের অর্থনীতি-তত্ত্বের ভিত্তিপ্রস্তর। পুঁজিতান্ত্রিক সমাজে শ্রেণীগত দ্বন্দ্ব-বিরোধ এবং শ্রেণীসংগ্রামের মূলগুলোকে বের করে ধরে এই তত্ত্ব।

৩। পুঁজিতন্ত্রের বিকাশ এবং মেহনতী জনগণের অবস্থা

পুঁজির সঞ্চয়ন

লাভের জন্যে পুঁজির লালসা কখনও তৃপ্ত হবার নয়। কোন পুঁজিপতি যতই ধনী হোক, তার লাভ হোক যতই মোটা, তবু সে সব সময়েই চায় আরও ধনী হতে। সবার বিরুদ্ধে সবার খাওয়াখায়ি লড়াইয়ে তলায় পড়ে যেতে না হলে পুঁজিপতিকে লাভের একটা বড় অংশ তার পুঁজির সঙ্গে জোড়া চাই, সেটাকে উৎপাদনে বিনিয়োগ করা চাই।

উদ্বৃত্ত মূল্যের একটা অংশকে পুঁজির সঙ্গে যুক্ত করাটাকে বলে পুঁজির সঞ্চয়ন। উদ্বৃত্ত মূল্যের একটা অংশকে বছর-বছর সঞ্চিত ক'রে পুঁজিপতি হয়ে ওঠে সমানে বেড়ে-চলা পুঁজির মালিক।

পুঁজি বাড়ে আরও একটা উপায়ে। ক্ষুদ্রায়তন উৎপাদনের চেয়ে বৃহদায়তনের উৎপাদন বেশি লাভজনক। প্রতিদ্বন্দ্বিতার

লড়াইয়ের মধ্যে বৃহৎ পুঁজিপতিরা তাদের চেয়ে ছোট আর দুর্বল প্রতিদ্বন্দ্বীদের গিলে খায়। এই সংগ্রামে কেউ-কেউ হয় বিজয়ী, আর কারও-কারও হয় সর্বনাশ — ফলে, পুঁজির বৃদ্ধি ঘটে — কয়েকটা পুঁজি মিলেমিশে এক হয়ে যায়। বৃহদায়তনের উৎপাদনের সুবিধেগুলো রয়েছে বলে পুঁজিপতিরা অনেক সময়ে কয়েকটা অপেক্ষাকৃত ছোট পুঁজি মিলিয়ে গড়ে তোলে এক-একটা বৃহৎ পুঁজি।

ফলে, বিপুল পরিমাণের সব পুঁজি হয়ে দাঁড়ায় অতি ক্ষুদ্রসংখ্যক ধনকুবেরদের সম্পত্তি। মুষ্টিমেয় এই কোটিপতি আর বহুকোটিপতিরা হয় সুবিপুল ঐশ্বর্যের মালিক, তারা হয় হাজার-হাজার, লক্ষ-লক্ষ মানুষের ভাগ্যবিধাতা।

শ্রমিক শ্রেণীর অবস্থার আপেক্ষিক এবং অনপেক্ষ অবনতি

নতুন সরঞ্জাম বসিয়ে প্রত্যেকটা পুঁজিপতি চেষ্টা করে নিজ কারখানায় লাভজনকতা বাড়াতে। বিভিন্ন প্রযুক্তিগত নবপ্রবর্তন শ্রমিকদের জীবনোপায়ের মূল্য কমিয়ে দেয়: সেগুলির উৎপাদনের জন্যে শ্রম লাগে আগের চেয়ে কম। তার মানে, শ্রমশক্তি-মূল্যের ক্ষতিপূরণ করতে শ্রমিকের কাজের সময় লাগে আরও কম। এইভাবে, পুঁজির সঞ্চয়নের সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিকের উপর পুঁজিপতির শোষণের হার সমানে বেড়ে চলে।

শ্রমের উপর পুঁজির শোষণের ক্রমবর্ধমান হারের অর্থ হল, শ্রমিক শ্রেণী যে-সম্পদ উৎপন্ন করে, তার ক্রমাগত-কমে-চলা একটা অংশই তারা পায়।

কোন একটা নির্দিষ্ট কালপর্যায়ে, ধরা যাক এক বছরে, সর্বমোট উৎপন্ন মূল্যের পরিমাণটাকে বলা হয় কোন একটা

দেশের জাতীয় আয়। পংজিতান্ত্রিক দেশগুলিতে জাতীয় আয়ে শ্রমিক শ্রেণীর হিস্‌সা ক্রমাগত কমে আসছে। আর, তারই সঙ্গে সঙ্গে, জাতীয় আয়ে বুর্জোয়াদের এবং তাদের আশ্রিতদের হিস্‌সাটা বেড়ে চলে সর্বক্ষণ।

শ্রমিক শ্রেণীর অবস্থার আপেক্ষিক অবনতিটা এখানেই। এটাকে আপেক্ষিক বলা হয়, তার কারণ, মেহনতী জনগণ এবং কাজ-না-করা শ্রেণীগুলির আয়ের মধ্যে অনুপাত, শ্রমিক শ্রেণী এবং বুর্জোয়াদের জীবনযাত্রার মানের মধ্যে অনুপাত পরিবর্তিত হয়। জীবনযাত্রার অতি নিচু মানে বাঁধা পড়ে থাকে শ্রমিক শ্রেণী, কিন্তু বুর্জোয়াদের উচ্ছৃঙখল অপচয়ের কোন সীমাপরিসীমা থাকে না।

শ্রমিক শ্রেণীর অবস্থার আপেক্ষিক অবনতির জন্যে এবং সময়ে-সময়ে অনপেক্ষ অবনতির জন্যেও দায়ী পংজিতন্ত্র — কাজেই, পংজিতন্ত্র শ্রমিক শ্রেণীর জীবনযাত্রা আর কাজের অবস্থার অবনতি ঘটায় সরাসরিই।

এইসব তথ্যের সামনে প'ড়ে পংজিতন্ত্রের সমর্থকেরা কখনও-কখনও শ্রমিক শ্রেণীর অবস্থার আপেক্ষিক অবনতির কথা স্বীকার করে নেয়, কিন্তু অনপেক্ষ অবনতি ঘটার ব্যাপারটাকে তারা তেড়েফুঁড়ে অস্বীকার করে। তারা প্রশ্ন তোলে, কেন, বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে শ্রমিকেরা তো এমন বহু সুবিধাদি পাচ্ছে, যেগুলো দেড় শ', এক শ' কিংবা পঞ্চাশ বছর আগে কল্পনাও করা যেত না — ঠিক কিনা? এর পরে সাধারণত উল্লেখ করা হয় নানা জিনিসের কথা: বাইসিকেল, মোটরসাইকেল, মোটরগাড়ি, রেডিও আর টেলিভিশন সেট, ধোলাইকল, রেফ্রিজারেটর এবং অপেক্ষাকৃত সম্প্রতি উদ্ভাবিত অন্যান্য টেকসই জিনিস।

পংজিতন্ত্রের আমলে শ্রমিক শ্রেণীর অবস্থা-সংক্রান্ত প্রশ্নটাকে গুলিয়ে দেওয়াই তাদের মতলব। কিন্তু, লোকের প্রয়োজন যে

অপরিবর্তনীয় নয়, এটা তো যেকোন বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তির কাছে স্পষ্ট।

প্রযুক্তিগত অগ্রগতি, উৎপাদন-বলগুলির উন্নয়ন এবং সামাজিক সম্পদের বৃদ্ধির ফলে সমাজে সবারই, তাদের মধ্যে নিশ্চয়ই মেহনতী জনগণেরও ক্রমাগত নতুন-নতুন প্রয়োজন দেখা দেয়।

ঐতিহাসিক বিকাশ ঘটতে থাকার সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিক শ্রেণীর প্রয়োজনগুলোও বেড়ে যায়। কিন্তু, পুঁজিতান্ত্রিক অবস্থার মধ্যে শ্রমিক শ্রেণীর সাধারণ প্রয়োজনগুলো মেটানো ক্রমাগত আরও বেশি দুরূহ হয়ে উঠছে।

পুঁজিপতিরা মজুরি নামাতে চেষ্টা করে ন্যূনতম মাত্রায়। এটা তো সবারই জানা কথা, পণ্যের দাম ওঠানামা করে — সেটা হয় কখনও মূল্যের চেয়ে বেশি, কখনও মূল্যের চেয়ে কম। কিন্তু, মজুরি, অর্থাৎ, শ্রমশক্তির দাম অন্যান্য পণ্যের দামের থেকে পৃথক, — মজুরির ঝোঁকটা হল মূল্যের চেয়ে নিচে নামার দিকে।

শ্রমিকের পকেটকাটার, তার আসল আয় কমিয়ে দেবার বহু ফন্দিই বের করেছে পুঁজিপতিরা — এইভাবে, তারা শ্রমিককে খাদ্য, কাপড়-জামা আর বাসস্থানের ব্যাপারে ব্যয়সংকোচ করতে বাধ্য করে।

পুঁজিতান্ত্রিক দেশগুলিতে বেড়ে-চলা জীবনযাত্রার ব্যয় থেকেই শ্রমিকদের দুর্ভোগ হয় বেশি। শ্রমশক্তি বিক্রি করে শ্রমিক যে-পয়সাটা পায় — নামিক মজুরি — সেটা এক জিনিস; আর যে-পয়সা সে রোজগার করে সেটা দিয়ে কত পরিমাণে এবং কী গুণের খাদ্যসামগ্রী, কাপড়-জামা, গৃহস্থালির জিনিস, ইত্যাদি কিনতে পারে — সেটা একেবারে অন্য জিনিস। পাওয়া পয়সাটা দিয়ে শ্রমিক কী পরিমাণ জীবনোপায় কিনতে পারে, সেটা

দিয়েই তার আসল মজুরি নির্ধারিত হয়। জীবনযাত্রার ব্যয় চড়ার সঙ্গে সঙ্গে, কর বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আসল মজুরি কমে যায়, শ্রমিক শ্রেণীর অবস্থার অবনতি ঘটে। চড়া মাত্রায় ভাড়া ইত্যাদি এবং মজুরি থেকে হরেকরকমের কেটে নেবার দরুন মেহনতীদের আসল আয় আরও কমে যায়। শ্রম হয়ে উঠছে আরও বেশি কষ্টসাধ্য, শিল্পে জখম ঘটছে ক্রমাগত আরও ঘন ঘন। জীবনযাত্রার মানটাকে চূড়ান্ত নিম্নতম মাত্রায় নামিয়ে দেবার জন্যে পুঁজিপতিদের মতলবটাকে শ্রমিক শ্রেণী রুখতে পারে শুধু কঠোর সংগ্রাম দিয়েই।

পুঁজিতান্ত্রিক দেশগুলিতে বহু বর্গের কম-মজুরি-পাওয়া শ্রমিক আছে, উৎপাদনের গোটা-গোটা শাখাতেই মজুরি কম। কথাটা খাটে সর্বোপরি কৃষিক্ষেত্রের পক্ষে, এবং কোন-কোন শিল্পেও — যেমন, টেক্সটাইল শিল্পে। নারীরা সাধারণত পুরুষের চেয়ে কম মজুরি পায়। কোন-কোন ক্ষেত্রে মেয়েদের মজুরি পুরুষের মজুরির মাত্র অর্ধেক।

অগ্রসর পুঁজিতান্ত্রিক দেশগুলিতে জরুরী স্বার্থের জন্যে শ্রমিক শ্রেণীর সংগ্রাম বৃথা যায় নি। গত কয়েক দশকে সোভিয়েত ইউনিয়নে এবং অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশে নতুন জীবন গড়ার কাজে অর্জিত সাফল্যগুলি পুঁজিতান্ত্রিক দেশে-দেশে শোষকদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম আরও দুর্দম করে তুলতে শ্রমিকদের অনুপ্রাণিত করেছে — তার ফলে বুর্জোয়ারা সুবিধাদি দিতে বাধ্য হয় বারবার।

তবে, বুর্জোয়াদের কাছ থেকে শ্রমিক শ্রেণী যাকিছু সুবিধাদি আদায় করুক না কেন, পুঁজিতান্ত্রিক ব্যবস্থার মর্মটা তাতে বদলায় নি। শ্রমের উপর পুঁজির শোষণই এই ব্যবস্থাটার বনিয়াদ। শ্রম আর পুঁজির মধ্যেকার ব্যবধানটা ঘুচে যায় নি, সেটা বরং বেড়েই গেছে বিস্তর। পুঁজিতন্ত্রের বিকাশের ধারায়

বুর্জোয়াদের ছোট-ছোট দল সমৃদ্ধিশালী হয়ে ওঠে, আর জনসমষ্টির বেশির ভাগ মানুষ প্রলেতারিয়েতে পরিণত হয় — অর্থাৎ কিনা, তারা নিঃস্ব হয়ে পড়ে, তারা শ্রমশক্তি বেচে প্রাণধারণ করে।

প্রলেতারিয়েতের উপর অভিশাপ — বেকারি

উৎপাদন সম্প্রসারিত করতে গিয়ে পুঁজিপতিরা এমন যন্ত্রপাতি বসায়, যাতে মানুষের শ্রম লাগে অপেক্ষাকৃত কম। এর ফলে, পুঁজির দুটো অংশের মধ্যে — স্থির আর চল পুঁজির মধ্যে অনুপাতটা বদলে যায়। স্থির পুঁজি বাড়ে চল পুঁজির চেয়ে ঢের বেশি দ্রুত। যাদের জায়গায় আসে যন্ত্র, সেইসব শ্রমিক উৎপাদনক্ষেত্র থেকে উচ্ছন্ন হয়ে যায়।

এইভাবে, পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদনের ধারায় পুঁজিপতিদের ব্যবহারের জন্যে খাটিয়ে মানুষ মজুত থাকার ব্যবস্থা হয়ে যায়। কিন্তু, শুধু তাই নয়। বেকারবাহিনীটাকে বাড়িয়ে চলার অন্যান্য অফুরন্ত উৎসও আছে পুঁজিতন্ত্রের। গ্রামাঞ্চলে কৃষকেরা উচ্ছন্ন হয় ব্যাপক হারে — তারা সমানে চলে আসে, তাদের পাওয়া যায় খাটিয়ে হিসেবে। তার উপর, বহুতর কারিগর, ছোট ব্যাপারী এবং ছোট-ছোট কর্মশালার মালিক দেউলিয়া হয়ে গিয়ে পড়ে বেকারদের মধ্যে।

বেকারবাহিনী ছাড়া পুঁজিতন্ত্র টিকতে পারে না, — যখনই বাজারের হাল হয় উৎপাদন সম্প্রসারিত করার উপযোগী, তখন পুঁজিপতিরা খাটিয়ের যোগান পায় ঐ বাহিনী থেকে। পুঁজিতান্ত্রিক ব্যবস্থার পক্ষে বেকারি অবশ্যপ্রয়োজনীয়, — এটা বুর্জোয়া রাজনীতিকেরা স্পষ্টই স্বীকার করে। পুঁজিতান্ত্রিক মনিবেরা আর তাদের মোসাহেবেরা বলে, 'সুস্থ আর্থনীতিক

বন্দোবস্তের' জন্যে লক্ষ-লক্ষ বেকার অবশ্যপ্রয়োজনীয়। তারা বেকারির মহিমাকীর্তন করে, তার কারণ, এটা হল শ্রমিক শ্রেণীর বিরুদ্ধে একটা শক্তিশালী অস্ত্র। কর্মনিযুক্ত শ্রমিকদের উপর চাপ দেওয়া, তাদের কাজের আর জীবনযাত্রার অবস্থা নিকৃষ্টতর করার জন্যে এবং এইভাবে লাভ বাড়াবার জন্যে পুঁজিপতিরা বেকারি ব্যবহার করে সব সময়ে এবং সর্বত্রই।

বেকারি শ্রমিক শ্রেণীর উপর একটা অভিশাপ। পুঁজিতন্ত্রের আমলে বেকারি অনিবার্য — এর ফলে, সমস্ত মজুরি-শ্রমিকের, যাদের কাজ আছে তাদেরও নিরাপত্তা থাকে না, ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে থাকে সর্বক্ষণের অনিশ্চয়তা।

এই সবকিছু কোন আপতিক কারণের ফল নয়, এসব ঘটে সম্পূর্ণতই পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদনপ্রণালীর আর্থনীতিক নিয়মাবলির দরুন।

পুঁজিতান্ত্রিক সঞ্চয়নের সাধারণ নিয়ম

পুঁজিতন্ত্রের সন্ধানী ঐতিহাসিক পরীক্ষা এবং তত্ত্বগত বিশ্লেষণ ক'রে মার্কস এই সিদ্ধান্তে পৌঁছন যে, পুঁজিতন্ত্রের আমলে সামাজিক সম্পদ হয় যত বেশি, ততই বাড়ে বেকারবাহিনী, যাদের কপালে জোটে গরিবি আর ভুখা। সমাজের এক মেরুতে সম্পদের সঞ্চয়নের মানে, সঙ্গে সঙ্গে, বিপরীত মেরুতে, অর্থাৎ, যে-শ্রেণী সমাজের সমস্ত সম্পদ সৃষ্টি করে সেখানে জমে ওঠে দুর্দশা; নিরাপত্তাবিহীনতা আর কষ্টসাধ্য শ্রম।

এমনই পুঁজিতান্ত্রিক সঞ্চয়নের সাধারণ নিয়ম, যা আবিষ্কার করেছেন মার্কস। পুঁজিতন্ত্রের অন্যান্য আর্থনীতিক নিয়মের মতো এটার ক্রিয়ার উপরও পড়ে বহু উপাদানের প্রভাব — মুখ্যত প্রলেতারিয়েতের শ্রেণীসংগ্রামের প্রভাব।

পুঁজিতন্ত্রের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে সমাজ ক্রমাগত বেশি স্পষ্টত বিভক্ত হয়ে যায় দুটো বৈরকার শিবিরে, দুটো পরস্পরবিরোধী শ্রেণীতে — প্রলেতারিয়েত আর বুর্জোয়া। সমস্ত সম্পদ আর ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হয় বুর্জোয়াদের হাতে: উৎপাদনের উপকরণের প্রায় সবটারই মালিক হয় তারা, কাজেই, তারা সামাজিক শ্রমের উৎপাদ আত্মসাৎ করে। ক্ষমতা থাকে বুর্জোয়াদের হাতে, কিন্তু শ্রমিক শ্রেণীকে ছাড়া তারা থাকতে পারে না। কলে-কারখানায় শ্রমিকেরা না থাকলে পুঁজিপতির শ্রীবৃদ্ধি হয় না। পুঁজিপতিদের জন্যে অপরিমেয় সম্পদ উৎপন্ন করে দিয়ে শ্রমিক শ্রেণী বঞ্চিত, নিপীড়িত শ্রেণী হয়ে থাকে।

বুর্জোয়া আর প্রলেতারিয়েত হল পুঁজিতান্ত্রিক সমাজে প্রধান শ্রেণীদুটো। কিন্তু, সমস্ত পুঁজিতান্ত্রিক দেশেই অন্যান্য শ্রেণী এবং মধ্যবর্তী স্তরও আছে। বেশির ভাগ পুঁজিতান্ত্রিক দেশে জনসমষ্টির বিশেষ বড় একটা অংশ হল কৃষককুল। তবে, পুঁজিতন্ত্রের বিকাশের ফলে অনিবার্যভাবেই গ্রামাঞ্চলের খেটে-খাওয়া মানুষের বেশির ভাগই নিঃস্ব হয়ে পড়ে, তাদের সর্বনাশ হয়ে যায়, — পুঁজিপতি, ভূস্বামী আর কুলাকদের (ধনী কৃষকদের) শোষণ চলে তাদের উপর।

বৃহদায়তনের উৎপাদনের প্রসারের ফলে শহরে আর গ্রামাঞ্চলে শ্রেণীগত দ্বন্দ্বগুলো তীব্রতর হয়। মধ্যবর্তী স্তরটা ক্ষয়ে যায়, পেটি বুর্জোয়াদের মধ্যে স্তরায়ণ বেড়ে চলে, তার ফলে অল্প কিছু লোক হয় পুঁজিপতি, আর বহু হাজার মানুষ পড়ে যায় শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে। পুঁজিতন্ত্রের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে জনসমষ্টির ক্রমে-বেড়ে-চলা একটা ভাগ হয়ে যায় মজুরি-শ্রমিক বা প্রলেতারিয়ান। ১৯৬৯ সালে সমস্ত পুঁজিতান্ত্রিক দেশ

মিলিয়ে সমস্ত রোজগেরে মানুষের মধ্যে মজুরি-পাওয়া আর বেতনভুক্ কর্মী ছিল শতকরা ৭৯·৫ জন। এই সংখ্যাটা ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ৯১·৬, বৃটেনে ৯৩·৫, জার্মান ফেডারেল প্রজাতন্ত্রে ৮২·৬, ফ্রান্সে ৭৬·৮, ইতালিতে ৬৭·৫। কানাডা, সুইজারল্যাণ্ড, হল্যাণ্ড, অস্ট্রেলিয়া এবং নিউ জিল্যাণ্ডের বেলায় অঙ্কটা ছিল মোটামুটি শতকরা ৮০ জন এবং আরও বেশি। শিল্প শ্রমিক আর আপিস কর্মচারীদের একই বর্গে ধ'রে এইসব দেশের সরকারী পরিসংখ্যানে আরও কিছুসংখ্যক লোককে এই বর্গের অন্তর্ভুক্ত করা হয়, এরা বাস্তবিকপক্ষে বিভিন্ন উচ্চতর বর্গের বেতনভুক্ কর্মী। তবে, প্রলেতারিয়েতের বিপুল সংখ্যার মধ্যে এরা সংখ্যায় নগণ্য।

পুঁজিতান্ত্রিক ব্যবস্থা সৃষ্টি করেছে বৃহদায়তনের শিল্প, তাতে আছে সর্বাধুনিক সরঞ্জাম, পরিবহণ আর যোগাযোগের উপকরণ; এই ব্যবস্থা বের করেছে বিপুল মণিক সম্পদ। গত ১৫০—২০০ বছরে প্রকৃতির উপর মানুষের ক্ষমতা অনেক বেড়েছে। প্রাকৃতিক শক্তিগুলোকে আয়ত্ত করায় এই অগ্রগতির মূল্য দিতে হয়েছে বহু পুরুষ-পর্যায়ের মেহনতী মানুষের গায়ের রক্ত জল ক'রে, সেই অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের উপর মানুষের শোষণ তীব্রতর হয়ে উঠেছে।

জনসাধারণকে পদানত রাখার জন্যে বলপ্রয়োগ আর ভাঁওতাবাজির একটা প্রকাণ্ড যন্ত্র গড়ে তুলেছে বুর্জোয়ারা। যেকোন রূপে বুর্জোয়া রাষ্ট্রটা হল শ্রমের উপর পুঁজির আধিপত্যের একটা হাতিয়ার, — পুলিস, সশস্ত্র আরক্ষী, ফৌজ, আদালত আর জেলখানার সাহায্যে এই রাষ্ট্র বুর্জোয়ার শাসন বলবৎ করে।

প্রলেতারিয়েতের আর্থনীতিক এবং রাজনীতিক সংগ্রাম

পুঁজিতান্ত্রিক কারবারিদের কাজকর্ম প্রথমে চলত পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন শ্রমিক জনগণ নিয়ে। কাজের অবস্থার অবনতি ঘটতে থাকার বিরুদ্ধে কোন শ্রমিক প্রতিবাদ করলে পুঁজিপতি অনায়াসেই তার জায়গায় অন্য লোককে নিতে পারত। কিন্তু, কালক্রমে শ্রমিকেরা তাদের স্বার্থের ঐক্যটা দেখতে পেয়ে ট্রেড ইউনিয়নে সম্মিলিত হতে শুরু করল। তখন আর পৃথক-পৃথক প্রলেতারিয়ান নয়, প্রলেতারিয়ানদের সংগঠনের সম্মুখীন হল পুঁজিপতিরা। ওদিকে, পুঁজিপতিরাও নিজেদের জোট বাঁধল। তারা সবচেয়ে বশংবদ ট্রেড ইউনিয়ন নেতাদের ঘুষ দিয়ে হাত করে, ধর্মঘট ভাঙতে ভাড়াটে লোক লাগায়।

অগ্রসর পুঁজিতান্ত্রিক দেশগুলিতে জীবনযাত্রার মান নামিয়ে দেবার অপচেষ্টার বিরুদ্ধে শ্রমিক শ্রেণী ক্রমবর্ধমান প্রতিরোধ গড়ে তুলছে। বহু বছরের সংগ্রামের মধ্যে তারা পুঁজিপতিদের কাছ থেকে কোন কোন সুবিধাদি আদায় করে নেয়। তবু, প্রলেতারিয়েতের লড়ে নেওয়া সুবিধাগুলো সর্বক্ষণ বিপন্ন হয়ে থাকে: যেকোন অনুকূল অবস্থার সুযোগে পুঁজিপতিরা নিজেদের প্রতিশ্রুতি লঙ্ঘন করতে এবং শ্রমিকদের সুবিধাদি থেকে বঞ্চিত করতে চেষ্টা করে।

প্রলেতারিয়েতের আর্থনীতিক সংগ্রাম চূড়ান্ত গুরুত্বসম্পন্ন। সঠিক শ্রেণীগত অবস্থানে অবিচলিত কর্মদক্ষ নেতৃত্ব থাকলে ট্রেড ইউনিয়নগুলি পুঁজিপতিদের হামলা রুখতে পারে। আর তারই সঙ্গে সঙ্গে, ট্রেড ইউনিয়ন হল শ্রমিক জনগণের শ্রেণীসংগ্রামের একটা পাঠশালা।

আর্থনীতিক সংগ্রামের গুরুত্বটাকে মঞ্জুর করেও মার্কস বরাবর এই কথাটার উপর জোর দিয়ে গেছেন যে, এই সংগ্রাম

পরিচালিত হয় পুঁজিতন্ত্রের পরিণতিগুলোর বিরুদ্ধে — প্রলেতারিয়েতের উপর নিপীড়ন আর তার গরিবির মূল কারণের বিরুদ্ধে নয়, সেই মূল কারণটা হল খাস পুঁজিতান্ত্রিক ব্যবস্থাটাই। কেবল ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনগুলির আর্থনীতিক সংগ্রামের ভিতর দিয়েই পুঁজিপতিদের বাড়িয়ে-চলা শোষণের অবসান ঘটতে পারে না। সেটা ঘটাতে হলে প্রলেতারিয়েতের অটল রাজনীতিক সংগ্রাম চালানো চাই। বুর্জোয়াদের ক্ষমতা উচ্ছেদ ক'রে, একমাত্র তবেই, প্রলেতারিয়েত নির্মূল করতে পারে শ্রেণীগত শোষণ, যেটা হল তার গরিবি আর দৈন্যদশার উৎপত্তিস্থল।

কাজেই, প্রলেতারিয়েত সংগ্রাম চালায় বুর্জোয়া ব্যবস্থাটাকে উৎখাত করতে, পুঁজিতান্ত্রিক দাসত্বের অবসান ঘটাতে এবং নতুন, সমাজতান্ত্রিক সমাজ গড়তে। এইসব লক্ষ্য হাসিল করতে হলে প্রলেতারিয়েতের থাকা চাই সংগ্রামী রাজনীতিক সংগঠন, তাদের বৈপ্লবিক পার্টি, এই পার্টিকে সামাজিক বিকাশের নিয়মাবলির জ্ঞানে সজ্জিত হওয়া চাই, পুঁজিতান্ত্রিক শোষণ-ব্যবস্থাটাকে বিনষ্ট করে তার জায়গায় নতুন ব্যবস্থা কমিউনিজম কায়েম করার সংগ্রামে শ্রমিকদের, সমস্ত মেহনতী মানুষকে পরিচালিত করার ক্ষমতা থাকা চাই এই পার্টির।

এমন পার্টি হল মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পার্টি। শ্রমিক শ্রেণীর আগুয়ান বাহিনী হিসেবে এই পার্টি প্রলেতারিয়েতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের নেতৃত্বে থাকে, পুঁজিতন্ত্রের দ্বারা শোষিত সমস্ত মেহনতী মানুষকে প্রলেতারিয়েতের চারধারে সমবেত করে এবং কমিউনিজমের চূড়ান্ত বিজয়ের মহান লক্ষ্য সাধনের জন্যে সংগ্রামটাকে পরিচালিত করে।

পঁুজিতন্ত্রের কবর-খোঁড়াইকার — প্রলেতারিয়েত

ঐতিহাসিক বিকাশের সমগ্র ধারাটা প্রলেতারিয়েতকে তার মহান ঐতিহাসিক ভূমিকা পালনের জন্যে প্রস্তুত করে তোলে — এই ভূমিকাটা হল বুর্জোয়া ব্যবস্থার কবর-খোঁড়াইকারের ভূমিকা, নতুন, সমাজতান্ত্রিক সমাজ-নির্মাতার ভূমিকা।

পঁুজিতন্ত্র শ্রমিকদের একত্রিত করে যুক্ত শ্রমে। বাস্তব জীবনই, পঁুজিতান্ত্রিক সমাজে বিদ্যমান অবস্থাটাই শোষকদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে শ্রমিকদের একাট্টা করায়। পঁুজিতন্ত্রের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে, উচ্ছিন্ন হওয়া ক্ষুদ্র উৎপাদকেরা — কৃষক আর কারিগরেরা — এসে প্রলেতারিয়েতের সংখ্যা বাড়ায়। পঁুজিতান্ত্রিক দাসত্বের মর্মটা সম্বন্ধে ক্রমাগত বেশি সচেতন হয়ে উঠে শ্রমিকেরা নিজেদের জরুরী স্বার্থগুলোর জন্যে সংগ্রাম চালাতে আরও দৃঢ়সংকল্প হয়ে ওঠে। শ্রমিক শ্রেণী হয়ে ওঠে এমন একটা শক্তি, যা সমস্ত মেহনতী মানুষকে নিজের চারপাশে সমবেত ক'রে পঁুজিতন্ত্র উচ্ছেদ করার এবং সমাজতান্ত্রিক ধারায় সমাজের বৈপ্লবিক পুনর্গঠনের চূড়ান্ত সংগ্রামে তাদের পরিচালিত করতে সক্ষম।

পঁুজিতান্ত্রিক সমাজে প্রলেতারিয়েতই সবচেয়ে অগ্রসর শ্রেণী। উৎপাদনের উপকরণ থেকে বঞ্চিত এই শ্রেণী ব্যক্তিগত সম্পত্তি জীইয়ে রাখতে আগ্রহান্বিত নয়। সমস্ত শোষণের অবসানের জন্যে, সমাজতন্ত্রের জন্যে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে এবং শেষ অবধি লড়ে একমাত্র প্রলেতারিয়েতই। প্রলেতারিয়েত তার শ্রম দিয়ে সৃষ্টি করে বিপুল সম্পদ: কল-কারখানা, রেলপথ, ইমারত, সাধারণের ভবন। বড়-বড় কলে-কারখানায় সম্মিলিত, কঠোর পঁুজিতান্ত্রিক শ্রম-শৃঙ্খলায় তালিম-পাওয়া এবং দশকের

পর দশকের ধর্মঘট সংগ্রাম আর বৈপ্লবিক সংগ্রামের পোড়-খাওয়া প্রলেতারিয়েত হয়ে ওঠে সমগ্র মেহনতী জনগণের প্রকৃত নেতা। শোষিত জনগণের অন্যান্য স্তরগুলি পুঁজিতন্ত্রের জোয়াল ছুড়ে ফেলে মানুষের উপযুক্ত মুক্ত জীবনের পথে পা বাড়াতে পারে একমাত্র শ্রমিক শ্রেণীরই নেতৃত্বে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

শোষকদের বিভিন্ন দলের মধ্যে উদ্বৃত্ত মূল্যের বণ্টন

মজুরি-শ্রমিকদের শ্রম দিয়ে সৃষ্টি করা উদ্বৃত্ত মূল্যই বুর্জোয়া সমাজে বিনাশ্রমে পাওয়া সমস্ত আয়ের উৎস। অবিরাম লড়াই আর হিংস্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার ভিতর দিয়ে, পুঁজিতন্ত্রের আর্থনীতিক নিয়মাবলির স্বতঃস্ফূর্ত ক্রিয়ার ফলে শোষকদের বিভিন্ন দলের মধ্যে বণ্টিত হয় এই উদ্বৃত্ত মূল্য।

১। শিল্প পুঁজিপতিদের লাভ

পণ্যের মূল্য এবং তার উৎপাদন-পরিব্যয়

কোন পুঁজিতান্ত্রিক কারখানায় উৎপন্ন পণ্যের মূল্যের দুটো উপাদান আছে। এক, এটা হল উৎপাদনের উপকরণ থেকে স্থানান্তরিত মূল্য (যন্ত্রপাতির মূল্যের একাংশ, কাঁচামাল আর জালানির মূল্য, ইত্যাদি), এবং, দুই, এটা হল শ্রমিকদের শ্রম দিয়ে নতুন সৃষ্টি-করা মূল্য।

পণ্য উৎপাদনে পুঁজিপতি নিজের শ্রম ব্যয় করে না — সে ঐ উদ্দেশ্যে ব্যয় করে শুধু তার পুঁজি। এই ব্যয়টাই তার সবচেয়ে

বেশি আগ্রহের বিষয় — এরও আছে দুটো উপাদান। এক, এটা হল স্থির পুঁজি থেকে ব্যয় (তার মধ্যে পড়ে যন্ত্রপাতির মূল্যের একাংশ, কাঁচামাল আর জালানির মূল্য, ইত্যাদি), আর, দুই, চল পুঁজি থেকে ব্যয় (শ্রমিকদের মজুরি)। এই দুটো উপাদান নিয়ে পণ্যের পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদন-পরিব্যয়।

পণ্যের উৎপাদন-পরিব্যয়ের সঙ্গে তার মূল্যের তুলনা করলে দেখা যায়, পণ্য-মূল্যের প্রথম উপাদানটা আর উৎপাদন-পরিব্যয় একই। দ্বিতীয় উপাদানটার বেলায়, পণ্য-মূল্যের মধ্যে এটা হল শ্রমিকের শ্রম দিয়ে নতুন যুক্ত করা মূল্য, আর উৎপাদন-পরিব্যয়ের মধ্যে এটা হল শ্রমশক্তির মূল্য।

কিন্তু, যা আগেই দেখানো হয়েছে, শ্রমশক্তির মূল্য শ্রমিকদের শ্রম দিয়ে সৃষ্টি করা মূল্যের চেয়ে কম। শ্রমিকদের শ্রম দিয়ে সৃষ্টি করা মূল্যের অঙ্গীভূত থাকে — (১) শ্রমশক্তির মূল্যের বাবত ক্ষতিপূরণ, এবং (২) উদ্বৃত্ত মূল্য।

এর থেকে দেখা যায়, পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদন-পরিব্যয় পণ্য-মূল্যের চেয়ে বা আসল উৎপাদন-পরিব্যয়ের চেয়ে কম। পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদন-পরিব্যয় এবং আসল উৎপাদন-পরিব্যয়ের মধ্যে পার্থক্যটা হল উদ্বৃত্ত মূল্য।

পুঁজিতান্ত্রিক লাভ এবং তার হার

পুঁজিপতিরা যখন পণ্য বিক্রি করে, তারা উৎপাদন-পরিব্যয়টা তুলে নেয় শুধু তাই নয়, পায় উদ্বৃত্ত মূল্যও — এটা হয় উৎপাদন-পরিব্যয়ের উপরি কিছু উদ্বৃত্ত। এই উদ্বৃত্তটার হিসেব কষা হয় কারখানায় বিনিয়োজিত মোট পুঁজির সঙ্গে অনুপাত অনুসারে। সমগ্র পুঁজির সঙ্গে উদ্বৃত্ত মূল্যের অনুপাত হল লাভ।

একটা ভুল ধারণা সৃষ্টি হয় যে, চল আর স্থির সমগ্র পুঁজিই বুঝি লাভ সৃষ্টি করে, আর পুঁজির সমস্ত অংশই যেন সম-মাত্রায়ই লাভের উৎস।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, চল পুঁজির সঙ্গে শ্রমিকদের থেকে নিঙড়ে নেওয়া উদ্বৃত্ত মূল্যের শতকরা অনুপাত হল উদ্বৃত্ত মূল্যের হার। সমগ্র পুঁজির সঙ্গে উদ্বৃত্ত-মূল্যরাশির শতকরা অনুপাত হল লাভের হার।

দৃষ্টান্ত হিসেবে ধরা যাক, একটা পুঁজির পরিমাণ ৩,০০,০০০ ডলার, আর মনে করা যাক, স্থির পুঁজি হল ২,৮৫,০০০ ডলার এবং চল পুঁজি হল ১৫,০০০ ডলার। উদ্বৃত্ত মূল্য হোক ৪৫,০০০ ডলার। তাহলে, উদ্বৃত্ত মূল্যের হার হবে ৪৫/১৫ বা শতকরা ৩০০ ভাগ। লাভের হার হবে ৪৫/৩০০ বা ১৫ শতাংশ।

মোট পুঁজিটা তার চল অংশের চেয়ে বেশি ব'লে লাভের হারটা উদ্বৃত্ত মূল্যের হারের চেয়ে নিচু মাত্রার। উদ্বৃত্ত মূল্যের একই হারে, চল পুঁজি যত কম, আর স্থির পুঁজি যত বেশি, ততই কম হয় লাভের হার।

কোন একটা কারখানা পুঁজিপতির পক্ষে কতখানি লাভজনক, সেটা দেখা যায় লাভের হার থেকে — খাস উদ্বৃত্ত মূল্য থেকে নয়।

লাভের হারের সমানতা

শিল্পের বিবিধ শাখার বহুসংখ্যক কল-কারখানা নিয়ে পুঁজিতান্ত্রিক অর্থনীতি। বিভিন্ন কল-কারখানায় বিনিয়োগ করা পুঁজির পরিমাণ বিভিন্ন। কিন্তু, পরিমাণের পার্থক্য ছাড়াও, এইসব পুঁজি অঙ্গীয় গঠনের দিক দিয়েও বিভিন্ন।

পুঁজির অঙ্গীয় গঠন হল — স্থির আর চল পুঁজির মধ্যে অনুপাত ($c : v$)।

বহুসংখ্যক শ্রমিক খাটানো যেসব কারখানায় ঘর-বাড়ি, যন্ত্রপাতি, সরঞ্জাম আর কাঁচামাল বাবত খরচ কম, সেগুলিতে পুঁজির অঙ্গীয় গঠন নিচু মাত্রার। তেমনি, তার উলটো, যেসব কারখানায় বেশির ভাগ কাজ হয় সূক্ষ্ম-জটিল সরঞ্জাম দিয়ে, কিংবা যেখানে খুবই ব্যয়বহুল কাঁচামালের আকারণ হয় এবং শ্রমশক্তি কেনার বাবত খরচ হয় অপেক্ষাকৃত কম পয়সা, সেগুলিতে পুঁজির অঙ্গীয় গঠন উঁচু মাত্রার।

পুঁজিপতিদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফলে সম-পরিমাণের পুঁজিতে লাভের মাত্রা সমান হয়ে আসে।

সরলীকরণের জন্যে ধরা যাক, কোন একটা দেশে শাখা আছে মাত্র তিনটে, প্রত্যেকটা পুঁজির পরিমাণ একই, কিন্তু পুঁজির অঙ্গীয় গঠন পৃথক-পৃথক। প্রত্যেকটা শাখায় পুঁজি আছে ১০ কোটি (ডলার, পাউন্ড স্টার্লিং কিংবা অন্য যেকোন মুদ্রা)। মোট পুঁজি হল — প্রথম শাখায় ৭ কোটি স্থির পুঁজি আর ৩ কোটি চল পুঁজি, দ্বিতীয় শাখায় সেটা ৮ আর ২ কোটি, আর তৃতীয় শাখায় যথাক্রমে ৯ আর ১ কোটি। তিনটে শাখায়ই উদ্বৃত্ত মূল্যের হার ধরা যাক শতকরা ১০০ ভাগ।

সেক্ষেত্রে, তিনটে শাখার প্রত্যেকটায় শ্রমিকদের থেকে নিঙড়ে-নেওয়া উদ্বৃত্ত মূল্যের হার হবে চল পুঁজির সমান, অর্থাৎ, উদ্বৃত্ত মূল্য উৎপন্ন হবে প্রথম শাখায় ৩ কোটি, দ্বিতীয় শাখায় ২ কোটি, তৃতীয় শাখায় ১ কোটি।

পণ্যগুলো মূল্য অনুসারে বিক্রি হলে পুঁজিপতিদের লাভ হবে প্রথম শাখায় ৩ কোটি, দ্বিতীয় শাখায় ২ কোটি, আর তৃতীয় শাখায় ১ কোটি। কিন্তু, পুঁজির সমগ্র পরিমাণ তিন শাখায় একই। লাভের এই রকমের বণ্টন প্রথম শাখার পুঁজিপতিদের

পক্ষে সুবিধাজনক, কিন্তু তৃতীয় শাখার পুঁজিপতিদের পক্ষে একেবারেই প্রতিকূল। পুঁজি তৃতীয় শাখা থেকে চলে যাবে প্রথম শাখায়। পুঁজিপতিদের মধ্যে যে-প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখা দেবে তার ফলে প্রথম শাখার পুঁজিপতিরা তাদের পণ্যের দাম কমাতে বাধ্য হবে, আর, তারই সঙ্গে সঙ্গে, তৃতীয় শাখার পুঁজিপতিরা তাদের পণ্যের দাম এমন মাত্রায় চড়াতে পারবে, যাতে তিনটি শাখায়ই লাভ হয়ে দাঁড়াবে মোটামুটি একই।

এইভাবে, পুঁজিপতিদের মধ্যে প্রতিযোগিতার ফলে লাভের সাধারণ বা গড় হার-সংক্রান্ত নিয়মের প্রাধান্য ঘটে। পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদনপ্রণালীর সমস্ত নিয়মের মতো এই নিয়মটাও খাটে স্বতঃস্ফূর্তভাবে এবং শেষ পর্যন্ত বলবৎ হয় অসংখ্য বিচ্যুতির ভিতর দিয়ে গিয়ে।

উৎপাদন-দাম

উপরকার উদাহরণটায়, তিনটে শাখায় উৎপন্ন মোট পণ্য বিক্রি হয় ১২০ মুদ্রায়। তারই সঙ্গে, পণ্যগুলোর মূল্য হল — প্রথম শাখায় ১৩০, দ্বিতীয় শাখায় ১২০ এবং তৃতীয় শাখায় ১১০ মুদ্রা। এইভাবে, পণ্যগুলোর দাম সেগুলোর মূল্য থেকে পৃথক।

উৎপাদন-পরিব্যয়ের (১০০) সঙ্গে গড় লাভ (২০) যোগ করে পাওয়া যায় তিনটে পণ্যেরই দাম। উৎপাদন-পরিব্যয় এবং গড় লাভের যোগফলের সমান দামকে বলা হয় উৎপাদন-দাম।

পুঁজিতান্ত্রিক সমাজে পণ্য বিক্রি হয় উৎপাদন-দামে — সেগুলির মূল্য হিসেবে নয়। তাই বলে কিন্তু পুঁজিতান্ত্রিক ব্যবস্থায় মূল্যের নিয়ম আর চালু থাকে না, তা নয়। তার উলটো — সেটা চালু থাকে পুরাদমে।

উৎপাদন-দাম মূল্যের একটা পরিবর্তিত রূপমাত্র। নিম্নলিখিত বিবরণে সেটা দেখা যাবে।

এক, শিল্পপতিদের কেউ-কেউ তাদের পণ্য বিক্রি করে মূল্যের চেয়ে বেশি দামে, আবার মূল্যের চেয়ে কমে বিক্রি করে কেউ-কেউ, কিন্তু সমগ্র সমাজের পরিসরে দেখলে উৎপাদন-দামগুলোর যোগফলটা পণ্যগুলোর মূল্যের যোগফলের সমান।

দুই, পুঁজিপতিদের গোটা শ্রেণীটার লাভ প্রলেতারিয়েতের সমগ্র মাগনা শ্রমে সৃষ্টি করা উদ্বৃত্ত মূল্যের সমান।

তিন, বিভিন্ন পণ্যের মূল্য পড়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে সেগুলোর উৎপাদন-দাম পড়ে যায়। তেমনি, তার উলটো, পণ্যগুলোর মূল্য চড়লে, তার সঙ্গে সঙ্গে সেগুলোর উৎপাদন-দামও চড়ে।

লাভের হার সমান হয়ে আসার অর্থ হল পুঁজির নিচু মাত্রার অঙ্গীয় গঠনের শাখাগুলোতে শ্রমিকদের উৎপন্ন উদ্বৃত্ত মূল্যের একাংশ চলে যায় পুঁজির উঁচু মাত্রার অঙ্গীয় গঠনের শাখাগুলোতে। এইভাবে, যেসব পুঁজিপতি তাদের নিযুক্ত করে তারাই শুধু নয়, তার উপর সমগ্রভাবে পুঁজিপতি শ্রেণীও শ্রমিকদের শোষণ করে। বুর্জোয়া ব্যবস্থাটাকেই বিনষ্ট করার জন্যে সমগ্র পুঁজিপতি শ্রেণীর বিরুদ্ধে যে-সংগ্রাম, একমাত্র সেটার ফলেই ঘটে শ্রমিক শ্রেণীর মুক্তি।

লাভের হার কমার দিকে ঝোঁক

পুঁজিতন্ত্রের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে পুঁজির অঙ্গীয় গঠনের উন্নতি ঘটে। প্রযুক্তিগত অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে কল-কারখানায় কাঁচামাল, যন্ত্রপাতি আর সরঞ্জামের রাশটা বাড়ে; মূর্ত শ্রম

বাবত দেওয়া পংজির অংশটা বাড়ে দ্রুত, আর মানুষের শ্রমের বাবত দেওয়া চল পংজির পরিমাণ বাড়ে অনেক শ্লথ হারে।

আগেকার উদাহরণটা আবার ধরা যাক। পংজির মোট পরিমাণের মধ্যে ২৪ কোটি (ডলার, পাউন্ড স্টার্লিং কিংবা অন্য যেকোন মুদ্রা) স্থির পংজি, আর চল পংজি ৬ কোটি। শতকরা ১০০ ভাগ হারের উদ্বৃত্ত মূল্যে উদ্বৃত্ত মূল্যের পরিমাণ দাঁড়ায় ৬ কোটি, তার মানে, আমাদের উদাহরণটায়, লাভের হার ২০ শতাংশ।

ধরা যাক, দশ বছরের সঞ্চয়নের পরে পংজির মোট পরিমাণ ৩০ কোটি থেকে বেড়ে হল ৫০ কোটি। তারই সঙ্গে সঙ্গে, প্রযুক্তিগত অগ্রগতির ফলে পংজির অঙ্গীয় গঠন উন্নততর হয়েছে, তখন ঐ ৫০ কোটি হল ৪২ কোটি ৫০ লক্ষ স্থির পংজি এবং ৭ কোটি ৫০ লক্ষ চল পংজি নিয়ে।

সেক্ষেত্রে, উদ্বৃত্ত মূল্যের সমান হারে (শতকরা ১০০ ভাগ) উদ্বৃত্ত মূল্য উৎপন্ন হবে ৭ কোটি ৫০ লক্ষ। লাভের হার হবে ৭৫/৫০০ = ১৫ শতাংশ। অর্থাৎ কিনা, উদ্বৃত্ত মূল্যের অপরিবর্তিত হারে লাভের রাশটা বাড়বে (৬ কোটি থেকে ৭ কোটি ৫০ লক্ষ), আর লাভের হার কমবে (২০ থেকে ১৫ শতাংশ)।

এইভাবে, পংজির অঙ্গীয় গঠনের উন্নতির ফলে লাভের সাধারণ বা গড় হার নেমে যাবার ঝোঁক দেখা দেয়। পংজিতান্ত্রিক উৎপাদনপ্রণালীর সমস্ত নিয়মের মতো এই ঝোঁকটাও বলবৎ হয় খুবই জটিল আঁকাবাঁকা পথে গিয়ে।

কিন্তু, লাভের গড় হারটার পড়ে যাওয়া ঠেকাবার কতকগুলো উপাদান আছে। এইসব উপাদান ঐ ঝোঁকটায় বাধা দেয়, লাভের হারের পড়ে যাওয়াটাকে ব্যাহত করে এবং অংশত রুখে দেয়। শ্রমিকদের উপর শোষণের মাত্রার বৃদ্ধি হল তার সর্বপ্রধান

উপাদান। পুঁজিতন্ত্রের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে উদ্বৃত্ত মূল্যের হার বাড়ে। তার উপর, শ্রমের উৎপাদিকাশক্তি বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেকটা যন্ত্রের মূল্য, প্রত্যেকটা সরঞ্জামের মূল্য কমে যায়। লাভের হার নেমে যাবার প্রক্রিয়াটাকে ব্যাহত করার জন্যে আরও কয়েকটি উপাদানও আছে।

তবে, লাভের হার নেমে যেতে থাকলে লাভের মোট পরিমাণ কমে যায় না, অর্থাৎ, শ্রমিক শ্রেণী থেকে নিঙড়ে-নেওয়া উদ্বৃত্ত মূল্যের মোট পরিমাণটা কমে যায়, তা নয়। লাভের হার নেমে যাবার মূলে কারণ হল শ্রমের ক্রমবর্ধমান উৎপাদিকাশক্তি, আর সেই একই কারণে লাভের পরিমাণবৃদ্ধি চাঙ্গা হয়।

লাভের হার নেমে চলার ঝোঁকটা পুঁজিতন্ত্রের দ্বন্দ্বগুলোকে চূড়ান্ত মাত্রায় প্রকোপিত করে তোলে।

শ্রমিকদের উপর শোষণ তীব্রতর ক'রে পুঁজিপতিরা ঐ ঝোঁকটাকে রুখতে চেষ্টা করে — তার ফলে প্রলেতারিয়েত আর বুর্জোয়াদের মধ্যেকার দ্বন্দ্ব আরও সঙিন হয়ে ওঠে।

লাভের হার কমে যাবার এই ঝোঁকটা বুর্জোয়াদের নিজেদের ভিতরকার সংগ্রামটাকেও তীব্রতর করে। উচ্চতর লাভের হার কুড়োবার চেষ্টায় পুঁজিপতিরা পুঁজি রপ্তানি করে অন্যান্য দেশে, যেখানে শ্রমশক্তি অপেক্ষাকৃত শস্তা এবং পুঁজির অঙ্গীয় গঠন শিল্পে-অগ্রসর দেশগুলির চেয়ে নিচু মাত্রায়।

দাম চড়া-মাত্রায় বজায় রাখার জন্যে শিল্পপতিরা হরেক রকমের জোট বাঁধে। তারা সেইভাবে লাভের অঙ্ক বাড়াতে এবং লাভের হার নেমে যাওয়া ঠেকাতে পারবে বলে আশা রাখে।

লাভের হার কমে যাবার ঝোঁক থেকে উদ্ভূত দ্বন্দ্বগুলো বিশেষভাবে সঙিন হয়ে ওঠে বিভিন্ন সংকটের সময়ে।

২। বাণিজ্যিক পঁুজি এবং ঋণের পঁুজি

বাণিজ্যিক পঁুজি এবং বাণিজ্যিক লাভ

শ্রমিকদের শ্রম দিয়ে সৃষ্টি করা উদ্বৃত্ত মূল্য আত্মসাৎ করে প্রধানত শিল্প পঁুজিপতিরা, তারা লাভের বখরা দেয় প্রথমত এবং সর্বোপরি বাণিজ্যিক পঁুজিপতিদের আর ঋণের পঁুজিপতিদের।

কোন পঁুজিতান্ত্রিক শিল্প প্রতিষ্ঠানে উৎপন্ন পণ্যগুলো বিক্রি হওয়া চাই — তাহলে শিল্পপতি উৎপাদনের নতুন উপকরণ কিনতে পারে, শ্রমিক খাটাতে পারে, উৎপাদন চালিয়ে যেতে পারে এইভাবে। ব্যবহারকের কাছে পণ্য বিক্রি যদি শিল্পপতির নিজেই করতে হত, তাহলে বাণিজ্যের ঘর-বাড়ি সাজাতে, বিক্রয়-কর্মিদল খাটাতে এবং অন্যান্য ব্যাপারে তার খরচ করতে হত পঁুজির একটা অংশ। এই সমস্ত কাজ বণিকের হাতে দিয়ে শিল্পপতি তাকে লাভের কিছুটা বখরা দেয়। বণিকের কাছে সে পণ্য বেচে কারখানার দামে, সেটা উৎপাদন-দামের চেয়ে কম।

কাজেই, বাণিজ্যিক লাভ হল উদ্বৃত্ত মূল্যের একটা অংশ, যা শিল্পপতি বণিককে ছেড়ে দেয়। কিছু পরিমাণ পঁুজি খরচ ক'রে বণিকের তার পঁুজির উপর চলতি পরিমাণের লাভ পাওয়া চাই। বাণিজ্যিক লাভ চলতি গড় হারের কম হলে বাণিজ্য করা অ-লাভজনক হত।

ঋণের পুঁজি

পণ্য বিক্রি করে পাওয়া অর্থটাকে পুঁজিপতিদের অবিলম্বে খরচ করতে হয় না। তাদের হাতে এমন অর্থ থাকে, যা উপস্থিত সময়ে তাদের দরকার থাকে না।

এইভাবে, প্রত্যেকটি পুঁজিপতিরই কোন-কোন সময়ে কিছু উদ্বৃত্ত অর্থ-পুঁজি থাকে, যা সে অবিলম্বে খাটাবার উপায় পায় না। এটা হল অকেজো পুঁজি, অর্থাৎ, যে-পুঁজি লাভ আনে না। আবার, কোন-কোন সময়ে পুঁজিপতিদের অর্থের ঘাটতি পড়ে — যেমন, নতুন সরঞ্জাম কেনার সময়ে। শিল্প প্রতিষ্ঠানের কাজ অব্যাহত রাখার জন্যে তাদের রিজার্ভে অর্থ থাকা চাই, ঘাটতি পড়লে তার থেকে খরচ করতে পারে, কিন্তু অন্যান্য সময়ে সেটা অকেজো পড়ে থাকে।

পুঁজিপতি আছে বহু, তাই, যখন একজনের অর্থ-পুঁজি সাময়িকভাবে উদ্বৃত্ত হয়, তখন আর-একজনের অর্থের সাময়িক ঘাটতি পড়ে। পুঁজির প্রত্যেকটা অংশ থেকেই যাতে লাভ আসে, তার ব্যবস্থা করতে পুঁজিপতিরা বাধ্য হয় প্রতিযোগিতার দরুন। কাজেই, পুঁজিপতিরা তাদের পড়ে-থাকা অর্থটাকে ঋণ দেয়। টাকা ধার দেওয়া যেতে পারে ব'লে শিল্প পুঁজিপতিদের মোটা-মোটা টাকা অকেজো ফেলে রাখতে হয় না। তার উপর, ঋণ ব্যবহার করে তারা তাদের শোষণ-করা শ্রমিকদের সংখ্যা বাড়াতে পারে এবং, এইভাবে, আরও বেশি উদ্বৃত্ত মূল্য পেতে পারে।

ঋণদাতা পুঁজিপতি কোন শিল্পপতির ব্যবহারের জন্যে যে অর্থ-পুঁজিটা দেয় তার বাবত পারিতোষিক হিসেবে ঐ শিল্পপতি দেয় উদ্বৃত্ত মূল্যের একটা অংশ। উদ্বৃত্ত মূল্যের এই অংশটাকে বলা হয় সুদ। যে-পুঁজি থেকে সুদ আসে সেটা হল ঋণের পুঁজি।

ঋণের পুঁজির চলাচল ঘটায় ব্যাঙ্কগুলো। ব্যাঙ্কগুলো, একদিকে, সমস্ত অকেজো টাকা সংগ্রহ করে, আর, অন্যদিকে, যেসব পুঁজিপতির টাকার ঘাটতি পড়ে, সাময়িকভাবে তাদের হাতে টাকা পেঁছে দেয়।

গোড়ায় ব্যাঙ্কগুলো প্রধানত ছিল দেওন মেটাবার মধ্যস্থ। কারবারিরা সাধারণত তাদের টাকা রাখে ব্যাঙ্কে, সেই ব্যাঙ্ক তাদের কথামতো বিভিন্ন দেওন চালায়। এইজন্যে ব্যাঙ্কগুলো হরেক রকমের অর্থ-আয় জড়ো ক'রে সেটাকে ঋণ দেয় পুঁজিপতিদের।

এইভাবে পুঁজি একটা পণ্য হয়ে ওঠে, সেটা ব্যবহৃত হয় হিসাব মেটাতে। ব্যাঙ্কগুলো পুঁজির কারবারি।

পুঁজি ঋণের কাজ করলে সেটা একটা পণ্য, কাজেই, তার একটা দাম আছে। এর দাম হল সুদ, অর্থাৎ, নির্দিষ্ট কালপর্যায়ের জন্যে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ পুঁজি ব্যবহার করার বাবত দেয় অর্থ। এক বছরের জন্যে ১০০ ডলার ঋণের বাবত ৩ ডলার আদায় করা হলে, তার মানে, সুদের হার (কিংবা শুধু সুদ) হল ৩ শতাংশ।

বিভিন্ন রকমের আর্থিক লেনদেনে ব্যাঙ্ক সুদের হার ধার্য করে বিভিন্ন রকমের। আমানতে (নিষ্ক্রিয় আর্থিক লেনদেন) তারা সুদ দেয় ঋণ (সক্রিয় আর্থিক লেনদেন) বাবত যা দেয় তার চেয়ে অপেক্ষাকৃত কম। যে কালপর্যায়ের জন্যে তারা ঋণ দেয় তদনুসারে এবং অন্যান্য শর্ত অনুসারেও তারা ঋণের উপর বিভিন্ন রকমের সুদ ধার্য করে। তেমনি, আমানত বাবতও ব্যাঙ্ক সুদ দেয় বিভিন্ন রকমের।

সুদের হার প্রায়ই ওঠানামা করে। অর্থের যোগান তার

চাহিদার চেয়ে বেশি হলে সুদের হার কমে যায়, তেমনি চলে তার উলটোভাবে। সাধারণ অবস্থায় সুদের হার সীমাবদ্ধ হয় গড় লাভের হার দিয়ে। কোন-কোন ব্যতিক্রমী অবস্থায়, দৃষ্টান্তস্বরূপ, কোন পুঁজিপতি যখন দেউলিয়া হয়ে যাবার মুখে, তখন সুদের হার লাভের গড় হারের উপরে উঠতে পারে।

সাধারণত, যেকোন একটা সময়ে মাত্র অল্পসংখ্যক আমানতকারীই আমানত উঠিয়ে নেয়। টাকা উঠিয়ে নেওয়া হলে সাধারণত নতুন-নতুন আমানত এসে ক্ষতিপূরণ করে দেয়। কাজেই, যারা চায় তাদের সবারই আমানত ব্যাঙ্ক ফিরিয়ে দিতে পারে — যদিও, তাদের সিন্দুকে টাকা রাখে অপেক্ষাকৃত কম পরিমাণই, আর অর্থ-পুঁজির বেশির ভাগটাকে ঋণ হিসেবে দিয়ে রাখা থাকে পুঁজিপতিদের হাতে।

সংকট, যুদ্ধ এবং অন্যান্য ওলটপালটের সময়ে অবস্থাটা মূলগতভাবেই বদলে যায়। আমানতকারীদের প্রধান অংশটা আমানত উঠিয়ে নিতে ব্যাঙ্কে ছুটে যায়। এমন আকস্মিকতার জন্যে ব্যাঙ্ক প্রস্তুত না থাকলে — অন্যান্য ব্যাঙ্ক কিংবা সরকারের কাছ থেকে ধার নিয়ে সিন্দুকে যথেষ্ট টাকা জমিয়ে না রাখলে — ব্যাঙ্ক দেউলিয়া হয়ে যায়।

জয়েন্ট-স্টক কম্পানি

বিপুল পরিমাণ খরচ দরকার হয় কোন-কোন কারবারে। এই রকমের সব কাজের জন্যে মোটা-মোটা পরিমাণ পুঁজি সংগ্রহ করতে স্থাপিত হয় বিভিন্ন জয়েন্ট-স্টক কম্পানি।

জয়েন্ট-স্টক কম্পানিগুলো ব্যাপক হয়ে উঠেছিল উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে — এইসব প্রতিষ্ঠানের মালিক হয় বহু লোক। প্রত্যেকটি মালিক নির্দিষ্ট-সংখ্যক শেয়ার ধরে। কোন

ব্যক্তি কোন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে যে-পরিমাণ অর্থ-বিনিয়োগ করে সেটা অনুমোদন করে দেওয়া সার্টিফিকেট হল শেয়ার।

আনুষ্ঠানিকভাবে, জয়েন্ট-স্টক কম্পানিকে চালায় শেয়ারহোল্ডারদের সাধারণ সভা, এই সভা ডিরেক্টরদের বোর্ড এবং বিভিন্ন কর্মকর্তা নিয়োগ করে, কম্পানির কাজকর্ম সম্বন্ধে বিবরণ শুনে সেটাকে অনুমোদন করে, বিভিন্ন গুরুত্বসম্পন্ন বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়।

বুর্জোয়া মতাদর্শবাদীরা বলতে চায়, জয়েন্ট-স্টক কম্পানিগুলোর প্রসারের ফলে ঘটে, তারা যাকে বলে, 'পুঁজির গণতন্ত্রায়ন'। এই বক্তব্য তুলে তারা ছোট-ছোট শেয়ার, অর্থাৎ, অপেক্ষাকৃত ছোট ইউনিটের শেয়ার ছাড়ার অশেষ প্রশংসা করে। তারা বলতে চায়, যেসব শ্রমিক এইসব শেয়ার কেনে তারা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের যৌথ মালিকের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। তাদের মতে, এর মানে হল, পুঁজি ছড়িয়ে পড়ে — পুঁজি 'জনগণের' পুঁজির প্রকৃতি লাভ করে।

কিন্তু, আসলে, কম্পানির ক্রিয়াকলাপের উপর ছোট-ছোট শেয়ারহোল্ডারদের কোন প্রভাবই থাকে না। সাধারণ সভাগুলোতে প্রত্যেকটি শেয়ারহোল্ডারের যত শেয়ার ততগুলো ভোট থাকে, কাজেই, কম্পানির আসল মালিক হল বড় শেয়ারহোল্ডাররা, অর্থাৎ, যাদের শেয়ার থাকে বহুসংখ্যক। ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের রূপটা জয়েন্ট-স্টক হলে পুঁজির গণতন্ত্রায়ন হয়ে যায়, তা নয়। বরং তার উলটো, এতে বৃহৎ পুঁজি ছোট আর মাঝারি পুঁজিপতিদের সঞ্চিত অর্থ এবং উপরের স্তরের শ্রমিক আর কর্মচারীদের বাঁচানো অর্থের একটা অংশকেও নিজেদের অধীন ক'রে নিজেদের উদ্দেশ্য অনুসারে ব্যবহার করতে পারে। ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের জয়েন্ট-স্টক রূপের ফলে পুঁজির বৃদ্ধি এবং উৎপাদনের একত্রীকরণ খুবই চাঙ্গা হয়।

উৎপাদনে প‌ুঁজি-বিনিয়োগ থেকে প‌ুঁজির মালিকানার বিচ্ছেদ

একটা কালপর্যায় অবধি প‌ুঁজিপতি ছিল কারখানার মালিক আর ম্যানেজার দ‌ুইই। ক্রেডিটের এবং, বিশেষত, জয়েন্ট-স্টক কম্পানিগ‌ুলোর প্রসারের ফলে এই অবস্থাটা বদলে গেল।

ঋণের প‌ুঁজির বিশেষক উপাদানটা হল এই যে, এটার মালিক ছাড়া কোন ব্যক্তি কিংবা একাধিক ব্যক্তি এটাকে উৎপাদনে ব্যবহার করে। এইভাবে, উৎপাদনে প‌ুঁজি-বিনিয়োগ থেকে প‌ুঁজির মালিকানার বিচ্ছেদ ঘটে।

প‌ুঁজিপতি হয়ে পড়ে এমন মালিক, উৎপাদনের ব্যাপারে যার কিছ‌ুই করার নেই, উৎপাদন চালায় মাইনে দিয়ে লাগানো লোকজন — ম্যানেজারেরা আর ডিরেক্টরেরা। প‌ুঁজিতন্ত্রের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে, ক্রমাগত বেড়ে চলা সংখ্যায় লোক প‌ুঁজি থেকে বিপ‌ুল পরিমাণ লাভ পায়, যদিও তা আয় করতে তারা আঙ‌ুলটাও তোলে না।

প‌ুঁজির বিনিয়োগ থেকে প‌ুঁজির মালিকানার বিচ্ছেদ খ‌ুবই স্পষ্ট দেখিয়ে দেয় যে, উৎপাদনের জন্যে প‌ুঁজিতান্ত্রিক মালিকানা অপ্রয়োজনীয়, এই মালিকানার প্রকৃতিটা পরজীবীয়।

৩। প‌ুঁজিতন্ত্রের আমলে ভূমিরাজস্ব

ভূমিতে ব্যক্তিগত মালিকানা এবং প‌ুঁজিতান্ত্রিক রাজস্ব

প্রায় সমস্ত প‌ুঁজিতান্ত্রিক দেশেই সামন্ততন্ত্রের বিভিন্ন অবশেষ আছে, সেগ‌ুলির মধ্যে সবচেয়ে গ‌ুর‌ুত্বসম্পন্ন হল ভূমিতে ব্যক্তিগত মালিকানা। বিশাল-বিশাল এলাকার মালিক ভূস্বামীরা সম্পত্তিতে অধিকার খাটিয়ে সমাজের কাছ থেকে কিছ‌ু আদায় করে নেয়। এই আদায়টা প‌ুঁজিতান্ত্রিক ভূমিরাজস্ব।

রাজস্ব হিসেবে ভূস্বামীরা আত্মসাৎ করে উদ্বৃত্ত সামাজিক উৎপাদের একটা অংশমাত্র, উদ্বৃত্ত মূল্যের একটা অংশ।

রাজস্ব-সংক্রান্ত তত্ত্বটা আসে নিম্নলিখিত উপস্থাপনা থেকে। ভূস্বামী ভূমি ইজারা দেয়। মজুর খাটিয়ে যে-পুঁজিপতি খামার চালায়, সে হল প্রজা। এই মজুরেরা যে উদ্বৃত্ত মূল্য উৎপন্ন করে, সেটা যায় প্রথমত এবং সর্বোপরি পুঁজিতান্ত্রিক প্রজার হাতে। সে তার একাংশ রেখে দেয় — সেটা তার পুঁজির বাবত লাভ, আর অপর অংশটা, একটাকিছু উদ্বৃত্ত লাভ তাকে জোর করে দেওয়ানো হয় ভূস্বামীকে, ভূমিরাজস্ব হিসেবে। উদ্বৃত্ত মূল্যের এই অংশই রাজস্ব হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

প্রায়ই এমন হয় যে, ভূস্বামী ভূমি ইজারা না দিয়ে নিজেই মজুর খাটিয়ে খামার চালায়। সেক্ষেত্রে রাজস্ব আর লাভ আত্মসাৎ করে একই লোক। তার উপর কৃষকদের কাছ থেকে আদায় করা রাজস্ব থাকে একটা বিরাট ভূমিকায়। এইসব জটিল সম্পর্ক সম্বন্ধে সুষ্ঠু ধারণা পেতে হলে পুঁজিতান্ত্রিক ভূমিরাজস্বের মর্মটা জানা দরকার।

ভূমিরাজস্ব আছে দু'রকমের — সাপেক্ষ এবং অনপেক্ষ।

সাপেক্ষ রাজস্ব

বিভিন্ন জমিখণ্ডের মধ্যে উর্বরাশক্তির পার্থক্য থাকে। একই পরিমাণ শ্রম দিয়ে অপেক্ষাকৃত উর্বর জমিখণ্ডে ফসল হয় অপেক্ষাকৃত বেশি। বড় শহর, নদী, সাগর কিংবা রেলপথ থেকে জমিখণ্ডের দূরত্বও একটা বিশেষ গুরুত্বসম্পন্ন উপাদান। যে খামারের অবস্থান অপেক্ষাকৃত সুবিধাজনক, তার মালিকের জাতদ্রব্যের পরিবহণে অনেক টাকা বেঁচে যায়।

ধরা যাক, তিনটে সমান পরিমাণের জমিখণ্ড আছে —

সেগুলির উর্বরতা বিভিন্ন রকমের। প্রত্যেকটা জমিখণ্ডের পাট্টাদার শ্রমিকদের মজুরি, বীজ কেনা আর গবাদি-পশু পালনের জন্যে খরচ করে বছরে ১,০০০ ডলার। আরও ধরা যাক, গড় লাভ হয় ২০ শতাংশ।

কিন্তু, জমিখণ্ডগুলোর উর্বরাশক্তি বিভিন্ন বলে শস্য ফসল একই হবে না: প্রথম খামারে হবে ১০০ সেন্টনার, দ্বিতীয় খামারে ১২০ সেন্টনার, তৃতীয় খামারে ১৫০ সেন্টনার। জমিখণ্ডগুলোতে উৎপাদন-দাম একই — ১,২০০ ডলার (উৎপাদন-পরিব্যয় যোগ গড় লাভ)। তার মানে, এক সেন্টনার শস্যের দাম হবে প্রথম খামারে ১২ ডলার, দ্বিতীয় খামারে ১০ ডলার এবং তৃতীয় খামারে ৮ ডলার।

কিন্তু, বাজার তো জমিখণ্ডগুলোর উর্বরতার বিষয়টা গ্রাহ্য করে না। যেখানেই জন্মানো হোক না কেন, এক সেন্টনার শস্যের দাম একই। সাধারণত, ঐ তিনটে জমিখণ্ডেরই শস্য বাজারের দরকার। কাজেই, বাজার-দর হতে হবে ১২ ডলার, অর্থাৎ, সবচেয়ে নিকৃষ্ট জমিটাতে যা দামের মাত্রা। তিনটে জমিখণ্ডেরই জাতদ্রব্য সমাজের চাই বলে বাজারে দাঁড়িয়ে যাবে এই দামটাই।

জমিখণ্ডের অবস্থানের পার্থক্যও জমির উর্বরাশক্তির চেয়ে কম গুরুত্বসম্পন্ন নয়। এক সেন্টনার শস্যের উৎপাদন আর বাজারে পেঁছে দেবার জন্যে বাজার থেকে সবচেয়ে দূরের জমিখণ্ডের প্রজার খরচ হয় সবচেয়ে কাছের জমিখণ্ডের প্রজার চেয়ে বেশি।

শিল্পে উৎপাদন-দাম নির্ধারিত হয় গড় উৎপাদন-অবস্থা দিয়ে। কৃষিজাত জিনিসের উৎপাদন-দাম স্থির হয় অন্য উপায়ে। সবচেয়ে নিকৃষ্ট আবাদী জমিখণ্ডে উৎপাদন-অবস্থা দিয়ে সেটা নির্ধারিত হয়। ভূমির আয়তন সীমাবদ্ধ। এই কারণে বাঞ্ছিত সংখ্যায় সমানই সরেস জমিখণ্ড ইচ্ছামতো পত্তন করা

অসম্ভব, কিন্তু শিল্পক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত বেশি ফলপ্রদ যন্ত্র সৃষ্টি করা যায় যেকোন সংখ্যায়। অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট জমিখণ্ডে পুঁজির খরচা থেকে পাওয়া উদ্বৃত্ত লাভ, বা পুঁজির অপেক্ষাকৃত বেশি ফলপ্রদ ব্যবহারে পাওয়া উদ্বৃত্ত লাভ সৃষ্টি করে সাপেক্ষ রাজস্ব।

আমাদের সেই উদাহরণটা আবার তুলে ধরা যাক, শস্যের বাজার-দর হল এক সেন্টনারে ১২ ডলার।

প্রথম (সবচেয়ে নিকৃষ্ট) জমিখণ্ডের প্রজা তার ১০০ সেন্টনার ফসল বাবত পাবে ১,২০০ ডলার। এই অংকটা তার উৎপাদন-পরিব্যয় (১,০০০ ডলার) আর গড় লাভের (২০০ ডলার) যোগফলের সমান। দ্বিতীয় জমিখণ্ডের প্রজা তার ১২০ সেন্টনার বাবত পাবে ১,৪৪০ ডলার। সে তার উৎপাদন-পরিব্যয় আর গড় লাভের উপরি পাবে ২৪০ ডলার।

তৃতীয় জমিখণ্ডের প্রজা তার ১৫০ সেন্টনার বাবত পাবে ১,৮০০ ডলার, অর্থাৎ, উৎপাদন-পরিব্যয় আর গড় লাভের উপরি তার প্রাপ্তি ঘটবে ৬০০ ডলার।

পুঁজিপতিদের মধ্যে প্রতিযোগিতা আছে। যেকোন পুঁজিপতি সাগ্রহেই নিজের গড় লাভটা রেখে দিয়ে গড় লাভের উপরি উদ্বৃত্তটা ভূস্বামীকে ফেরত দেবে খাজনা হিসেবে। কাজেই, গড় লাভের উপরি উদ্বৃত্তটাকে ভূস্বামীরা আদায় করে সাপেক্ষ খাজনা হিসেবে। অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট মাটিতে পুঁজি ব্যয় করে পাওয়া উদ্বৃত্তটা গড় সাপেক্ষ খাজনা।

ভূমি ব্যক্তির হাতে থাকুক কিংবা না-ই থাকুক, সেটা নির্বিশেষে অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট জমিখণ্ডগুলো থেকে পাওয়া গড় লাভের উপরি উদ্বৃত্ত ওঠেই। তবে, ভূমিতে ব্যক্তিগত মালিকানার ফলে ভূস্বামী এই উদ্বৃত্তটাকে সাপেক্ষ রাজস্ব হিসেবে আত্মসাৎ করতে পারে।

সাধারণভাবে সমস্ত উদ্বৃত্ত ম্ল্যের মতোই, এই উদ্বৃত্ত লাভটাকেও সৃষ্টি করে কেবল শ্রমই। কম উর্বর জমিখণ্ডের চেয়ে বেশি উর্বর জমিখণ্ডে শ্রম বেশি ফলপ্রসূ। উর্বরাশক্তির পার্থক্যের দরুন শ্রমের উৎপাদিকাশক্তির পার্থক্য পূর্বনির্ধারিত হয়ে থাকে।

অনপেক্ষ রাজস্ব

ভূস্বামীরা সাপেক্ষ রাজস্ব ছাড়াও পায় অনপেক্ষ রাজস্ব।

সেই উদাহরণটা আবার তোলা যাক। প্রথম, সবচেয়ে নিকৃষ্ট জমিখণ্ড থেকে কোন উদ্বৃত্ত লাভ ওঠে না। আমরা ধরে নিয়েছি, সবচেয়ে নিকৃষ্ট জমিখণ্ডের প্রজাকে শস্য যে-দামে বেচতে হবে, সেটা হল তার খরচ আর গড় লাভের যোগফল, অর্থাৎ, উৎপাদন-দামে।

কিন্তু, ভূস্বামী তো প্রজাকে এটা মুফত ব্যবহার করতে দেবে না। কাজেই, ভূমিতে পুঁজি-বিনিয়োগ করার অধিকার বাবত ভূস্বামীকে পয়সা দেবার জন্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট জমিখণ্ডের প্রজাকে শস্য বিক্রি করার সময়ে গড় লাভের উপরি একটা উদ্বৃত্ত তোলা দরকার। তার মানে, কৃষিজাত জিনিসের বাজার-দর হওয়া চাই সবচেয়ে নিকৃষ্ট জমিখণ্ডে উৎপাদন-দামের চেয়ে বেশি।

কাজেই, কৃষিজাত দ্রব্যসামগ্রী বিক্রি হয় উৎপাদন-দামের চেয়ে বেশি দামে। এইভাবে পাওয়া উদ্বৃত্তটা যায় ভূস্বামীর হাতে। এটা হল অনপেক্ষ ভূমিরাজস্ব। সাপেক্ষ রাজস্বের মতো অনপেক্ষ রাজস্বও উদ্বৃত্ত মূল্যের একটা অংশ।

ভূমিরাজস্ব এমন একটা দেওন, যা পুঁজিতন্ত্রের আমলে সমাজ ভূস্বামী শ্রেণীকে দিতে বাধ্য। পুঁজিতন্ত্রের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে এই দেওনের পরিমাণটা বাড়ে। অথচ, পুঁজিতান্ত্রিক

উৎপাদনের জন্যে ভূস্বামীদের অস্তিত্বের একেবারে কোন দরকারই নেই। ভূস্বামীদের আয়টার প্রকৃতি নিছক পরজীবীয়।

মাটির প্রাকৃতিক উর্বরাশক্তিতে উদ্ভূত সমস্ত সুবিধা থেকে সমাজকে বঞ্চিত ক'রে সাপেক্ষ রাজস্ব ঐ সুবিধাগুলোকে তুলে দেয় ভূস্বামীদের হাতে। শ্রমিকদের খাদ্য এবং শিল্পের কাঁচামাল, এইসব কৃষিজাত দ্রব্যকে আরও ব্যয়বহুল করে তোলে অনপেক্ষ রাজস্ব। অনপেক্ষ রাজস্ব না থাকলে এইসব কৃষিজাত দ্রব্য উৎপাদন-দামে বিক্রি হত। কিন্তু, অনপেক্ষ রাজস্বের দরুন সেগুলো বিক্রি হয় উৎপাদন-দামের চেয়ে বেশি দামে।

কৃষককে শোষণ করে নেওয়া রাজস্ব

প্রায়ই, ভূস্বামীদের কাছ থেকে ভূমি ইজারা নেয় পুঁজিতান্ত্রিক কারবারিরা নয় — ছোট কৃষকেরা, তারা চাষআবাদ করে নিজেদের শ্রম দিয়ে, তারা জন খাটায় না। উদ্বৃত্ত মূল্য সৃষ্টি করার জন্যে মজুরি-শ্রম তো নেই — তাহলে রাজস্বটা আসে কোথা থেকে?

এক্ষেত্রে, ভূমিরাজস্বের উৎস হল কৃষকদের উপর ভূস্বামীদের শোষণ। কৃষক ভূস্বামীকে খাজনা হিসেবে দেয় তার শ্রমে উৎপন্ন কৃষিজাত দ্রব্যের একাংশ। এই অংশটা প্রায়ই এত বেশি যে, হাড়ভাঙা খাটুনি খেটে কৃষককে থাকতে হয় আধা-ভুখা। মার্কস লিখেছেন, পুঁজিতন্ত্রের আমলে কারখানা শ্রমিকদের উপর শোষণ থেকে কৃষকদের উপর শোষণের তফাত শুধু ধরনে।

'জমির উর্বরাশক্তি কমে যাওয়ার' তত্ত্ব

ভূস্বামীদের রাজস্ব দিতে হয় বলে জীবনযাত্রার ব্যয় হয় চড়া, এটাকে বাজে কৈফিয়ত দিয়ে এড়িয়ে যাবার চেষ্টায় পুঁজিতন্ত্রের ওকালতি-করা লোকেরা 'প্রাকৃতিক নিয়মের' দোহাই

দিয়ে বলে, 'জমির উর্বরাশক্তি কমে যাওয়ার' নিয়ম কৃষি উৎপাদনকে প্রভাবান্বিত করে। তারা বলে, এই 'নিয়মটা' প্রকৃতির অন্তর্নিহিত — এটা সমাজব্যবস্থার উপর নির্ভর করে না। তারা বলতে চায়, পর পর যে-শ্রম প্রয়োগ করা হয়, তার প্রতিবারে মাটি ফলপ্রসূ হয় আগের বারের চেয়ে কম।

পুঁজিতন্ত্রের দোষ ঢাকার মতলবে এবং মেহনতী জনগণের গরিবির জন্যে পুঁজিতন্ত্রের যে-দায়িত্ব, সেটা থেকে তাকে খালাস দেবার চেষ্টায় মিথ্যে করে বানানো হয়েছে এই 'জমির উর্বরাশক্তি কমে যাওয়ার' নিয়মটাকে। পুঁজিতন্ত্রের সমর্থকেরা বলে, জনগণের দৈন্য-দুর্দশার জন্যে পুঁজিতন্ত্র দায়ী নয়। তারা বলে, কৃষিজাত দ্রব্যসামগ্রীর উৎপাদনবৃদ্ধির চেয়ে দ্রুত হারে বাড়ে জনসংখ্যা — সেটাই ঐসব দৈন্য-দুর্দশার কারণ। এই কারণেই তাদের মধ্যে সবচেয়ে স্পষ্টভাষীরা বলে, যুদ্ধ আর মহামারী তো আশীর্বাদ — তাতে জনসংখ্যা কমে যায়।

তথাকথিত 'জমির উর্বরাশক্তি কমে যাওয়ার' নিয়মটা গড়া হয়েছে বালির উপর। উৎপাদনের প্রযুক্তিগত মাত্রা, উৎপাদন-বলগুলোর অবস্থা, এই সবচেয়ে গুরুত্বসম্পন্ন বিবেচনাটাকে ইচ্ছাকৃতভাবে অগ্রাহ্য ক'রে তাতে গোড়ায়ই ছল করে ধরে নেওয়া হয়েছে যে, কৃষি উৎপাদনে প্রযুক্তি সাধারণত অপরিবর্তিতই থেকে যায়। কিন্তু, বাস্তবিক পক্ষে, ফসলের খামারে খাটানো বাড়তি শ্রম সাধারণত সংশ্লিষ্ট থাকে প্রযুক্তিগত অগ্রগতির সঙ্গে, কৃষি উৎপাদনের নতুন-নতুন এবং উন্নততর বিভিন্ন প্রণালী চালু করার সঙ্গে।

যারা বলে, ট্রেনগুলো সাধারণত স্টেশনে-স্টেশনে দাঁড়িয়েই থাকে, আর চলে শুধু ব্যতিক্রম হিসেবে, লেনিন তাদের সঙ্গে তুলনা করেছিলেন 'জমির উর্বরাশক্তি কমে যাওয়ার' নিয়মের প্রবক্তাদের।

শহর আর গ্রামাঞ্চলের মধ্যে বিরোধের প্রকোপবৃদ্ধি

শিল্প আর কৃষির মধ্যে, শহর আর গ্রামাঞ্চলের মধ্যে বিরোধটাকে পুঁজিতন্ত্র আরও গভীর করে তোলে, সেটার প্রকোপ বাড়িয়ে তোলে।

শিল্পে দ্রুত চালু করা হয় নতুন প্রযুক্তি, নতুন-নতুন উদ্ভাবনা আর যন্ত্রপাতি। অল্প কিছুকাল আগে অবধি, সবচেয়ে উন্নত পুঁজিতান্ত্রিক দেশগুলিতেও কৃষির বনিয়াদ ছিল অনগ্রসর প্রযুক্তি আর কায়িক শ্রম। সবচেয়ে অগ্রসর পুঁজিতান্ত্রিক দেশগুলির বেশির ভাগে কৃষিক্ষেত্রে যন্ত্রপাতি আর অগ্রসর প্রযুক্তি ব্যাপকভাবে চালু হয় শুধু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে। কায়িক শ্রম থেকে আধুনিক যন্ত্রে-উৎপাদনের চলে যাবার এই প্রক্রিয়াটার সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ-লক্ষ কৃষি খামার দৈন্যদশায় পড়ে, দেউলিয়া হয়ে যায়, — বৃহদায়তনের পুঁজিতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলো ঐসব খামারকে গিলে খায়। অর্থনীতিগতভাবে অপেক্ষাকৃত কমঅগ্রসর দেশগুলিতে কৃষির প্রযুক্তিগত মান এখনও অত্যন্ত নিচু।

গ্রামকে স্বাভাবিক অর্থনীতির সংকীর্ণ গণ্ডি থেকে মুক্ত করে এনে পুঁজিতন্ত্র তারই সঙ্গে সঙ্গে গ্রামাঞ্চলের জনগণের বিস্তৃত অংশকে করে ক্রমবর্ধমান শোষণের শিকার। সবচেয়ে অগ্রসর পুঁজিতান্ত্রিক দেশগুলিতেও কৃষকদের বেশির ভাগ শহুরে সংস্কৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন।

শহর আর গ্রামের মধ্যেকার বিরোধাভাস পুঁজিতান্ত্রিক ব্যবস্থার গভীরতম দ্বন্দ্বগুলোর একটা।

শোষকদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে শ্রমিক শ্রেণী এবং মেহনতী কৃষককুলের স্বার্থের অভিন্নতা

পুঁজিতন্ত্র শ্রমিক শ্রেণীর নিরাপত্তাবিহীনতা অবধারিত করে দেয়, শুধু তাই নয়, কৃষকদের বেশির ভাগের অদৃষ্ট অবধারিত করে দেয় ভূস্বামী আর পুঁজিপতিদের নির্মম শোষণ।

পুঁজিতন্ত্রের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে, কৃষকদের মধ্যে স্তরবিভাগ ঘটে। গ্রামাঞ্চলে সবচেয়ে উপরের ছোট-ছোট স্তরগুলি মেহনতী কৃষকদের উপর নিদারুণ শোষণ চালিয়ে ধনী হয়ে ওঠে। তার ফলে বহু কৃষক সর্বস্বান্ত হয়ে খামার বেচে দিয়ে খেতমজুর হয়ে যায় কিংবা কাজের খোঁজে যায় শহরে। মাঝারি কৃষকদের প্রকাণ্ড অন্তর্বর্তী স্তরটা থাকে অস্থিত আর অনিশ্চিত অবস্থার মধ্যে।

শিল্পের মতো কৃষিতেও ক্ষুদ্রায়তনের উৎপাদনের চেয়ে বৃহদায়তনের উৎপাদনের বিরাট সুবিধা আছে। বৃহদায়তনের উৎপাদনে ব্যবহৃত হতে পারে যন্ত্রপাতি এবং অন্যান্য প্রযুক্তিগত উৎকর্ষ, কিন্তু ক্ষুদ্রায়তনের উৎপাদনে সেসব চলে না। কৃষকেরা তাদের আপাতদৃষ্টিতে-প্রতীয়মান স্বাধীনতা বজায় রাখার জন্যে যথাশক্তি করলেও বহু ছোট খামার সর্বস্বান্ত হয়ে যায়, সেগুলির মালিকেরা খেতমজুর হয়ে যায় কিংবা হয় বিভিন্ন শিল্পায়তনে মজুরি-শ্রমিক।

এইভাবে, পুঁজিতন্ত্রের আমলে মেহনতী কৃষকদের ব্যাপকতম অংশ নির্মম শোষণে জর্জরিত হয়। এই ভিত্তিতে, পুঁজিপতি আর ভূস্বামীদের বিরুদ্ধে — শোষকদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে শ্রমিক শ্রেণী আর কৃষককুলের স্বার্থের অভিন্নতা দেখা দেয়। সবচেয়ে প্রগতিশীল শ্রেণী হিসেবে প্রলেতারিয়েত এই সংগ্রামে নেতৃত্ব করে।

পুঁজিতান্ত্রিক পুনরুৎপাদন এবং আর্থনীতিক সংকট

১। সরল এবং প্রসারিত পুঁজিতান্ত্রিক পুনরুৎপাদন

উৎপাদন এবং পুনরুৎপাদন

কোন দেশে উৎপন্ন পণ্যরাশি অবিরাম গতিশীল। বিভিন্ন পণ্য উৎপন্ন হয়, ব্যবহার করে নিঃশেষ হয়ে যায়, পুনরুৎপন্ন হয়। এই অবিরাম পুনর্নবীকরণ — উৎপাদনের অব্যাহত পুনরাবৃত্তিকে বলা হয় পুনরুৎপাদন। সমাজব্যবস্থা যা-ই হোক না কেন, সমাজের অস্তিত্বের জন্যে পুনরুৎপাদন অবশ্যপ্রয়োজনীয়।

কোন সমাজে যদি বছর পর বছর একই পরিমাণ উৎপাদ উৎপন্ন হত, সেটা হত সরল পুনরুৎপাদন।

পুঁজিতন্ত্রের উদ্ভবের আগে উৎপাদন-বলগুলোর বিকাশ ঘটত ধীরে, তখন পুনরুৎপাদন ছিল অনেকটা সরল ধরনের। সরল পুনরুৎপাদন নয়, প্রসারিত পুনরুৎপাদনই পুঁজিতন্ত্রের বিশেষক।

যেকোন সমাজে পুনরুৎপন্ন হয় উৎপাদরাশি ছাড়া সামাজিক উৎপাদন-সম্পর্কও। উৎপাদনের রূপ পুঁজিতান্ত্রিক হলে পুনরুৎপাদনের রূপও হয় সেই একই।

সামাজিক উৎপাদ এবং জাতীয় আয়

কোন একটা নির্দিষ্ট সময়ে, যেমন, এক বছরে সমাজে উৎপন্ন বৈষয়িক সম্পদের সমগ্র পুঞ্জটা হল তার সামাজিক উৎপাদ। সামাজিক উৎপাদ দুই ভাগে বিভক্ত। সরঞ্জামের ক্ষয়, ব্যবহৃত জালানি, কাঁচামাল এবং অন্যান্য উৎপাদনের উপকরণের ক্ষতিপূরণ করে তার এক ভাগ। পুনরুৎপাদনের জন্যে এটা আবশ্যক। এই বছরের মধ্যে নতুন সৃষ্টি করা মূল্য হল অন্য ভাগটা। এটা দেশটির জাতীয় আয়।

পুঁজিতান্ত্রিক সমাজে এই আয়টা জাতীয় শুধু নামেমাত্র। এর বেশির ভাগটাকে আত্মসাৎ করে পুঁজিপতিরা, সেটাকে তারা খরচ করে ব্যক্তিগত প্রয়োজনে এবং উৎপাদনের প্রসারের জন্যে।

জাতীয় আয়ের একটা মোটা অংশ আত্মসাৎ করে বুর্জোয়া রাষ্ট্র। রাষ্ট্রীয় বাজেটের বরাদ্দগুলো ব্যয় করা হয় প্রধানত রাষ্ট্রযন্ত্রটাকে চালু রাখার জন্যে — এই রাষ্ট্রযন্ত্র হল শোষিতদের বিরুদ্ধে শোষকদের ব্যবহৃত বলপ্রয়োগের হাতিয়ার — অস্ত্রসজ্জার প্রতিযোগিতা বাবত এবং যেসব পুঁজিতান্ত্রিক কারবার অর্থকষ্টে পড়ে তাদের সহায়তা দেবার জন্যে।

পুঁজিতান্ত্রিক পুনরুৎপাদনের দ্বন্দ্ব

উৎপাদন করতে নেমে পুঁজিপতিরা কেনে উৎপাদনের উপকরণ এবং শ্রমশক্তি। উৎপাদনের ফলে পুঁজি একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ পণ্যের রূপধারণ করে। পুঁজিপতিরা এইসব পণ্য বিক্রি ক'রে, একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ পেয়ে সেটা দিয়ে নতুন উৎপাদনের উপকরণ কেনে, শ্রমিকদের খাটায়, ইত্যাদি। এইভাবে,

প্রত্যেকটা পর্ঁজি চলে বৃত্তাকারে। পর্ঁজির অবিরাম বিচলনের উপর পনুরুৎপাদন নির্ভর করে।

বুর্জোয়া সমাজে থাকে বহু পর্ঁজিপতি — কাজেই, বহু পর্ঁজি। কাজেই, পর্ঁজিগুলোর সমগ্র পুঞ্জটা যাতে চালু থাকতে পারে, সেটা অবশ্যপ্রয়োজনীয়। পৃথক-পৃথক পর্ঁজিপতির কার্যকরণ এবং, কাজেই, পৃথক-পৃথক পর্ঁজির বিচলন ঘনিষ্ঠভাবে পরস্পরসংযুক্ত। এই বহুমুখী সংযোগ অনুভূত হয় বাজারে, সেখানে পর্ঁজিপতিরা তাদের কল-কারখানাগুলোতে উৎপন্ন পণ্যগুলোকে নগদ টাকায় পরিণত করে (বেচে)।

পর্ঁজিগুলো বিচলনের প্রক্রিয়ার মধ্যে জড়াজড়ি হয়ে দেখা দেয় সমগ্রভাবে সামাজিক পর্ঁজির বিচলন। সামাজিক পর্ঁজি কিন্তু পৃথক-পৃথক সমস্ত পর্ঁজির মোট সমষ্টিমাত্র নয়। সামাজিক পর্ঁজির মধ্যে পৃথক-পৃথক পর্ঁজিগুলো পরস্পরসংযুক্ত। পরস্পর থেকে স্বাধীন হলেও পর্ঁজিগুলো পরস্পরনির্ভরশীল। এই দ্বন্দ্বটা প্রকটিত হয় তৈরি মাল বিক্রি করার সময়ে, মোট সামাজিক পর্ঁজি পনুরুৎপন্ন হবার ধারায়।

পর্ঁজিতান্ত্রিক পনুরুৎপাদনের ধারায় শ্রমের উপর পর্ঁজির শোষণের সম্পর্কটা বারবার পনুনর্বায়িত হয় শুধু তাই নয়, সেটা আরও বিস্তৃত হয়। ক্রমেই আরও বেশি শ্রমিক পড়ে পর্ঁজিতান্ত্রিক শোষণের কবলে, এই শোষণের হার সমানে বেড়ে চলে। এইভাবে, পর্ঁজিতান্ত্রিক পনুরুৎপাদন বুর্জোয়া সমাজে শ্রেণীগত দ্বন্দ্বগুলোর বৃদ্ধির সঙ্গে নিয়তই সংশ্লিষ্ট।

বিক্রি করার সমস্যা

বিভিন্ন পণ্যের সমষ্টিটা হল কোন দেশের বার্ষিক উৎপাদ। বস্তুগত রূপের দিক থেকে, বিবিধ পণ্যের সমগ্র পুঞ্জটা দুটো প্রধান বর্গে বিভক্ত: (১) উৎপাদনের উপকরণ এবং (২)

ভোগ-ব্যবহারের জিনিস। সেইমতো, সমগ্রভাবে উৎপাদনও দুটো বর্গে বিভক্ত: (১) উৎপাদনের উপকরণ উৎপাদন এবং (২) ভোগ-ব্যবহারের জিনিসের উৎপাদন। প্রত্যেকটা উৎপাদের বস্তুগত রূপটা পুনরুৎপাদনের প্রক্রিয়ায় সেটার পরবর্তী ভূমিকা নির্ধারণ করে।

এরই সঙ্গে সঙ্গে, উৎপন্ন পণ্যপুঞ্জ বিক্রি করার সময়ে পুঁজিপতিকে পণ্যপুঞ্জের মূল্য তুলে আনা চাই, যাতে সে উৎপাদন চালিয়ে যেতে পারে। আমরা জানি, কোন পুঁজিতান্ত্রিক শিল্পপ্রতিষ্ঠানে উৎপন্ন পণ্যের মূল্যের তিনটে উপাদান আছে: (১) স্থির পুঁজি, (২) চল পুঁজি এবং (৩) উদ্বৃত্ত মূল্য। পুঁজিতান্ত্রিক সমাজের সমগ্র বার্ষিক উৎপাদও এই তিনটে উপাদান নিয়ে। বার্ষিক উৎপাদের বিভিন্ন উপাদান পরে কোন্ ভূমিকায় আসবে, সেটা ঐ উৎপাদের মূল্য অনুযায়ী বিভাগ দিয়ে পূর্বনির্ধারিত হয়ে যায়।

মূল্য তোলার প্রক্রিয়ায় বার্ষিক উৎপাদের প্রত্যেকটা অংশের বিনিময় এমনভাবে হওয়া চাই, যাতে সেটা বস্তুগত রূপ আর মূল্য দুই দিক দিয়েই তার নির্দিষ্ট ভূমিকা পালন করতে পারে। এর জন্যে, সামাজিক উৎপাদনের পৃথক-পৃথক অংশের মধ্যে মূল্য আর বস্তুগত রূপ দু'দিক থেকেই একটা নির্দিষ্ট পরিমাণগত পরস্পরসম্পর্ক দরকার। সামাজিক উৎপাদ বিক্রি করার সমস্যাটা এটা নিয়েই।

সরল এবং প্রসারিত পুঁজিতান্ত্রিক পুনরুৎপাদনে বিক্রি করার শর্ত

সরলীকরণের খাতিরে ধরা যাক, একটা দেশের গোটা অর্থনীতিই চালানো হয় পুঁজিতান্ত্রিক ধারায়। সেক্ষেত্রে পুনরুৎপাদন চলবে নিম্নলিখিতরূপে।

উৎপাদনের উপকরণ উৎপাদনের কারখানাগুলোতে এক বছরে উৎপন্ন পণ্যগুলির মোট পরিমাণ হওয়া চাই ঐ সময়ে উভয় বর্গের কারখানাগুলোতে ব্যবহার করে নিঃশেষ করা উৎপাদনের উপকরণের মোট পরিমাণের সমান। ভোগ্য পণ্য উৎপাদনের কারখানাগুলোতে উৎপন্ন পণ্যপুঞ্জের মূল্য হওয়া চাই উভয় বর্গের কারখানাগুলোর সমস্ত শ্রমিক আর পুঁজিপতির আয়ের সমান।

এইভাবে, সরল পুনরুৎপাদনের একটা আবশ্যিক শর্ত হল, প্রথম বর্গের চল পুঁজি আর উদ্বৃত্ত মূল্যের মোট পরিমাণ হওয়া চাই দ্বিতীয় বর্গের স্থির পুঁজির সমান।

প্রসারিত পুনরুৎপাদনে বিক্রি করার শর্তগুলো নিয়ে এখন বিবেচনা করা যাক। উৎপাদন বাড়াবার জন্যে বিদ্যমান কারখানাগুলোকে আরও বাড়াতে হয়, নইলে নতুন-নতুন প্রতিষ্ঠান নির্মাণ করতে হয়, এর যেকোন ক্ষেত্রে কিছু পরিমাণ নতুন উৎপাদনের উপকরণ চালু করতে হয়। এই উপকরণগুলো উৎপন্ন হওয়া চাই পূর্ববর্তী কালপর্যায়ে।

এর থেকে এটা দাঁড়াচ্ছে যে, প্রথম বর্গের কারখানাগুলোর, উৎপাদনের উপকরণ নির্মাণের কারখানাগুলোর বার্ষিক উৎপাদে সরল পুনরুৎপাদনে যে-পরিমাণ প্রয়োজন, তার উপরি একটা পরিমাণ উদ্বৃত্ত থাকা চাই। তার মানে, প্রথম বর্গের চল পুঁজি আর উদ্বৃত্ত মূল্যের মোট সমষ্টি হওয়া চাই দ্বিতীয় বর্গের স্থির পুঁজির চেয়ে বেশি।

এই হল সরল আর প্রসারিত পুঁজিতান্ত্রিক পুনরুৎপাদনে পণ্যের বিক্রি করার আবশ্যক শর্তগুলো। পৃথক-পৃথক শাখাগুলোর মধ্যে অবিচলিত, জটিল সম্পর্কের উপর অব্যাহত পুনরুৎপাদন নির্ভর করে। পুঁজিতান্ত্রিক পুনরুৎপাদন-

প্রক্রিয়ার জটিলতার দরুন পর্যাবৃত্ত আর্থনীতিক সংকট সেটাকে লঙ্ঘন করে, এটা অবশ্যম্ভাবী।

২। পুঁজিতন্ত্রের আমলে আর্থনীতিক সংকট

অত্যুৎপাদনের সংকট

পুঁজিতান্ত্রিক ব্যবস্থা দেখা দিয়ে ভালমতো কায়েম হবার আগেও সমাজে বহু ওলটপালট আর বিপর্যয় ঘটেছিল। তখন সেগুলোর কারণ ছিল বন্যা, খরা, বিধ্বংসী যুদ্ধ, মহামারী এবং অন্যান্য প্রাকৃতিক আর সামাজিক বিপর্যয়, সেগুলোর দরুন উৎপাদ অনেক কমে যেত, বিনষ্ট হত বহু পুরুষ-পর্যায়ের শ্রমের ফল, মানুষের কপালে অনিবার্যভাবেই আসত চূড়ান্ত গরিবি আর ভুখা।

একমাত্র পুঁজিতন্ত্রই এনেছে অত্যুৎপাদনের সংকট, এতে মেহনতী জনগণের দৈন্য-দুর্দশা ঘটে পণ্য 'মাত্রা ছাড়িয়ে' উৎপন্ন হয় বলে।

কিন্তু, কয়লা, শস্য, কাপড়-জামা, ঘর-বাড়ি বড় বেশি উৎপন্ন হয়, তা কি ঠিক? নিশ্চয়ই না। শস্য, কয়লা, কাপড়-জামার জন্যে চাহিদা বিপুল। বড় বেশি পণ্য উৎপন্ন হয়, সেটা মেহনতী মানুষের যথার্থ প্রয়োজনের সঙ্গে তুলনায় নয়, সেটা তাদের ক্রয়শক্তির সঙ্গে তুলনায়।

যথেষ্ট চড়া হারে লাভ করার মতো দামে পণ্য বিক্রি করাই পুঁজিপতিদের একমাত্র গরজের বিষয়, তাই তারা সমাজের প্রয়োজন মেটাবার দিকে ভ্রূক্ষেপ করে না। কিন্তু, সংকটের সময়ে তারা এটা করতে অপারগ হয়। পুঁজিতান্ত্রিক কল-কারখানাগুলোতে উৎপন্ন পণ্যপুঞ্জ এবং জনসমষ্টির

ক্রয়শক্তি অনুযায়ী চাহিদার মধ্যে প্রকাণ্ড ফারাকের দরুনই ঘটে এই আর্থনীতিক সংকট — অত্যুৎপাদনের সংকট।

১৯২৯—১৯৩৩ সালের সংকটের সময়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তাপনের জন্যে ব্যবহার করা হত কয়লার বদলে গম আর ভুট্টা। লক্ষ-লক্ষ শুয়োর নষ্ট করে ফেলা হয়েছিল, তুলো ফসলের একটা প্রকাণ্ড অংশ খেতে ফেলে রেখে পচে যেতে দেওয়া হয়েছিল। ব্রাজিলে লক্ষ-লক্ষ বস্তা কফি ফেলে দেওয়া হয়েছিল সমুদ্রে। ডেনমার্কে পালে-পালে গবাদি পশু কেটে ফেলা হয়েছিল, ফ্রান্সে আর ইতালিতে নষ্ট করা হয়েছিল হাজার হাজার টন ফল।

পুঁজিতন্ত্রের আমলে সংকট অনিবার্য

অত্যুৎপাদনের আর্থনীতিক সংকট সৃষ্টি হয় পুঁজিতন্ত্রের বুনিয়াদী দ্বন্দ্বের দরুন (তৃতীয় পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। সেটা হল উৎপাদনের সামাজিক প্রকৃতি এবং উৎপাদনের ফলগুলিকে আত্মসাৎ করার ব্যক্তিগত পুঁজিতান্ত্রিক ধরনের মধ্যেকার দ্বন্দ্ব।

পুঁজিতন্ত্রের বুনিয়াদী দ্বন্দ্ব থেকে আসে — উৎপাদনে অরাজকতা এবং জনগণের গণ্ডিবদ্ধ ভোগ-ব্যবহার — শ্রমের উপর পুঁজির শোষণের দরুন। অত্যুৎপাদনের আর্থনীতিক সংকট, যা কিছুকাল অন্তর-অন্তর পুঁজিতান্ত্রিক দেশগুলিকে ঝাঁকানি দেয়, সেটাকে অনিবার্য করে তোলে পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদনের অরাজকতা এবং শ্রমের উপর পুঁজির শোষণ।

লাভের জন্যে লালসায় পুঁজিপতিরা প্রতিদ্বন্দ্বিতার লড়াইয়ের তাড়নায় আরও বেশি জিনিস উৎপন্ন করতে সচেষ্ট হয়। আর তারই সঙ্গে সঙ্গে, পুঁজিতান্ত্রিক শোষণ মেহনতী

জনগণের ভোগ-ব্যবহারের মাত্রা গণ্ডিবদ্ধ করে ফেলে, তার ফলে ক্রয়শক্তি অনুযায়ী চাহিদা অপেক্ষাকৃত কমে যায়, আর পণ্যের বিক্রি কমে যায় তার দরুন।

সামাজিক প্রয়োজন মেটানো নয়, শ্রমিকদের মুফত শ্রম নিঙড়ে নিয়ে লাভ রাশিকৃত করাই পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদনের উদ্দেশ্য। শেষপর্যন্ত কিন্তু পুঁজিতন্ত্রের আমলেও উৎপাদন ভোগ-ব্যবহারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এবং তার উপর নির্ভরশীল।

সাময়িকভাবে উৎপাদনের প্রসারের ফলে উৎপাদনের উপকরণগুলোর বিক্রি বাড়ে। উৎপাদনের এইসব উপকরণ ব্যবহারকারী কল-কারখানাগুলো ক্রমাগত বেশি পরিমাণে রাশ-রাশ ভোগ্য পণ্য উৎপন্ন করে। কিন্তু, এই সময়ে, জনগণের অনিশ্চিত অবস্থার দরুন উৎপন্ন ভোগ্য পণ্য বিক্রি করা অসম্ভব হয়ে পড়ে — কেননা, উৎপাদনের প্রসারের সঙ্গে ভোগ-ব্যবহারের সমতুল বৃদ্ধি ঘটে না। কাজেই, বিক্রির পরিমাণটা গিয়ে ধাক্কা খায় মেহনতী জনগণের গণ্ডিবদ্ধ ভোগ-ব্যবহারের দেয়ালটার উপর, এটা অবশ্যম্ভাবী।

পুঁজিতান্ত্রিক চক্রাবর্ত এবং তার বিভিন্ন পর্যায়

বৃহদায়তনের পুঁজিতান্ত্রিক শিল্পের সঙ্গে সঙ্গেই দেখা দেয় অত্যুৎপাদন সংকট।

বিভিন্ন সংকটের অন্তর্বর্তী কালপর্যায়গুলোতে পুঁজিতান্ত্রিক শিল্প চলে একটা স্পষ্ট চক্রাবর্তে। কোন সংকটের ঠিক আগেই উৎপাদন ওঠে সর্বোচ্চ মাত্রায়। অত্যুৎপাদন ঘটে যায় তখনই — যদিও, তখনও সেটা স্পষ্ট প্রতীয়মান নয়। সব সময়ে না হলেও, অনেক সময়েই আসন্ন দুরবস্থার প্রথম লক্ষণ হয় আর্থিক পতন। প্রকাণ্ড-প্রকাণ্ড কারবার দেউলিয়া হয়ে যায়, উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে শেয়ারের দালাল, ব্যাঙ্কার আর

ফটকাবাজেরা; হন্যে হয়ে অর্থের জন্যে সন্ধান চলে। পাওনাদারেরা ঋণ পরিশোধ করার দাবি তোলে, টাকা তুলে নিতে আমানতকারী তাড়াহুড়ো করে ছুটে যায় ব্যাঙ্কগুলোতে, বহুসংখ্যক ছোট ব্যবসা প্রতিষ্ঠান সর্বস্বান্ত হয়ে যায়।

সংকট চলতে থাকে। গুদামগুলো মালে ভরতি, সেগুলো বিক্রি করা যায় না। বহু ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে যায়; শ্রমিক ছাঁটাই চলে, টিকে-থাকা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলোকে উৎপাদন কমাতে কিংবা সাময়িকভাবে বন্ধ করেই দিতে হয়। চেপে বসে বদ্ধতার (মন্দার) কাল। শিল্প ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে।

এই অবস্থার চাপে পুঁজিপতিরা শ্রমিকদের উপর শোষণ তীব্রতর করে, তাদের মজুরি কমিয়ে দেয়, তাদের খাটায় আরও কঠোরভাবে। এরই সঙ্গে সঙ্গে, উন্নততর প্রযুক্তি চালু ক'রে উৎপাদন আরও শস্তায় চালিয়ে কম চাহিদার অবস্থায়ও উৎপাদনটাকে লাভজনক করে তুলতে পুঁজিপতিরা সচেষ্ট হয়। প্রতিষ্ঠানগুলোকে পুনঃসজ্জিত করা হয়, স্থির পুঁজির বিস্তৃত পুনর্নবায়ন ঘটে। উৎপাদনের উপকরণের জন্যে চাহিদা বাড়ে।

বদ্ধতার জায়গায় আসে পুনরুজ্জীবন। টিকে-থাকা কল-কারখানাগুলোতে উৎপাদন আবার চালু হয়ে সম্প্রসারিত হয়। সংকটের দরুন যে-লোকসান গেছে তার ক্ষতিপূরণের জন্যে সচেষ্ট হয়ে ওঠে প্রত্যেকটি শিল্পপতি। উৎপাদন আবার এসে যায় আগেকার মাত্রায়।

উৎপাদন ক্রমে আগেকার মাত্রাও ছাপিয়ে যায় — আসে বুম্‌। ক্রয়শক্তি অনুযায়ী চাহিদা সম্বন্ধে যথোপযুক্ত বিবেচনা ছাড়াই উৎপাদন বেড়ে চলে। কিন্তু, ঐ চাহিদা তো গণ্ডিবদ্ধ — কিছুকাল পরে উৎপাদন আবার গিয়ে পড়ে বাজারের সংকীর্ণ চৌহদ্দির মধ্যে। লেগে যায় নতুন সংকট, আবার সেই চক্রাবর্ত।

পুঁজিতন্ত্রের বদ্ধমূল দ্বন্দ্বগুলো সংকটের সময়ে বেরিয়ে পড়ে। শ্রমিক শ্রেণী আর মেহনতী কৃষকদের শ্রমের ফল বিনষ্ট হয় সংকটের সময়ে। সমাজের উৎপাদন-বলগুলো অকেজো হয়ে পড়ে থাকে।

হাজার-হাজার শ্রমিককে গিয়ে রাস্তায় দাঁড়াতে হয়, তাদের কপালে জোটে দীর্ঘস্থায়ী বেকারি। একটা নির্দিষ্ট বয়সের শ্রমিকদের কারখানায় ফেরার আশা ছাড়তে হয় চিরকালের মতো। শ্রমিক শ্রেণীর উঠতি পুরুষ-পর্যায় উৎপাদনে হাত লাগাবার সুযোগ পায় না। বেকারি দেখা দেয় বুদ্ধিজীবীদের মধ্যেও।

সংকট আর বেকারির সুযোগ নিয়ে পুঁজিপতিরা মজুরি কমিয়ে দেয়, শ্রমিকদের কাজের অবস্থা আরও নিকৃষ্ট করে ফেলে। এই কারণেই, সংকটের ফলে বেকারদের উপর চাপে বিপুল অভাব-অনটন, শুধু তাই নয়, সমগ্র শ্রমিক শ্রেণীরই অবস্থার অবনতি ঘটে।

ভুয়ো ব্যাখ্যা দিয়ে সংকটের আসল প্রকৃতি আর কারণগুলোকে চেপে যেতে চেষ্টা করে অনেক বুর্জোয়া বিজ্ঞানী। সংকট পুঁজিতান্ত্রিক সমাজে অনিবার্য নয় বলে দেখাবার চেষ্টা করে তারা এটা-ওটা সাবজেক্টিভ কারণ আরোপ করে বলে, অর্থনীতির পুঁজিতান্ত্রিক ব্যবস্থার আওতায়ও সেসব কারণ দূর করা যায়।

তারা বলতে চায়, সংকটের চূড়ান্ত কারণ হল, উৎপাদনের বিভিন্ন শাখার মধ্যে অনুপাতের আপতিক গোলযোগ কিংবা 'ভোগ-ব্যবহারের কমি', এই বলে তারা সেগুলো দূর করার একটা উপায় হিসেবে অস্ত্রসজ্জার দৌড় আর যুদ্ধের ব্যবস্থা

দেয়। আসলে কিন্তু, পংঁজিতান্ত্রিক সমাজে অনুপাত-সংগতির অভাব এবং 'ভোগ-ব্যবহারের কমি' কোনটাই আপতিক ঘটন নয়। সেগুলোকে এড়ানো যায় না, তার কারণ, সেগুলো পংঁজিতন্ত্রের বুনিয়াদী দ্বন্দ্বেরই ফল, — ঐ ব্যবস্থাটা যতক্ষণ রয়েছে ততক্ষণ সে-দ্বন্দ্ব দূর করা যায় না।

পংঁজিতন্ত্রের আরও কোন কোন প্রবক্তা বলে দেয়, সংকট যেকোন সমাজব্যবস্থার আমলেই অবশ্যম্ভাবী। এই বানানো গালগল্পটা ষোল-আনাই ফেঁসে যায় একটা ব্যাপার দিয়েই: পংঁজিতান্ত্রিক ব্যবস্থা উচ্ছেদ করার পরে সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশ থেকে আর্থনীতিক সংকট দূর হয়ে গেছে। জনগণের বৈষয়িক আর সাংস্কৃতিক প্রয়োজন মেটানোই সমাজতান্ত্রিক উৎপাদনের উদ্দেশ্য। এই লক্ষ্য সামনে রেখে সমাজতান্ত্রিক সমাজ অর্থনীতির সমস্ত শাখার দ্রুত বিকাশ ঘটায়। উৎপাদনের উপকরণে সাধারণের মালিকানার ভিত্তিতে পরিচালিত সমাজতান্ত্রিক কল-কারখানাগুলিতে কাজ চলে অর্থনীতির এবং সমস্ত শ্রমজীবী মানুষের সর্বক্ষণ বেড়ে-চলা প্রয়োজনগুলো মেটাবার জন্যে। এইসব প্রয়োজন সবসময়েই বেড়ে চলে বলে সমাজতান্ত্রিক কল-কারখানাগুলি উৎপাদন সম্প্রসারিত এবং উন্নততর করে চলে সমানে, আর উৎপাদ বিক্রি করার যাবতীয় সুযোগ-সম্ভাবনাই তাদের রয়েছে।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

সাম্রাজ্যবাদের বুনিয়াদী উপাদানগুলো

সাম্রাজ্যবাদ সম্বন্ধে লেনিনের বিজ্ঞানসম্মত তত্ত্ব

উনিশ শতকের শেষ তৃতীয়াংশে অবাধ প্রতিযোগিতার পুঁজিতন্ত্রের জায়গায় আসে একচেটিয়া পুঁজিতন্ত্র — সাম্রাজ্যবাদ। লেনিন একচেটিয়া পুঁজিতন্ত্রের মার্কসবাদী বিশ্লেষণ করেন। সাম্রাজ্যবাদের আর্থনীতিক আর রাজনীতিক মর্মটাকে খুলে ধরে লেনিন দেখান, এটা পুঁজিতন্ত্রের একটা বিশেষ পর্ব — পুঁজিতন্ত্রের সর্বোচ্চ এবং শেষ পর্ব। সাম্রাজ্যবাদ হল পুঁজিতান্ত্রিক উন্নয়নের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি। পুঁজিতন্ত্রের সমগ্র বিকাশ, এর উৎপাদন-বলগুলো আর উৎপাদন-সম্পর্ক এবং এর মীমাংসার অতীত দ্বন্দ্বগুলো মিলে প্রাক্‌-একচেটিয়া পুঁজিতন্ত্র থেকে সাম্রাজ্যবাদে উত্তরণটাকে প্রস্তুত করে। সাম্রাজ্যবাদের প্রধান আর্থনীতিক উপাদানগুলোকে লেনিন তুলে ধরেন এইভাবে:

১) উৎপাদন আর পুঁজি যত উঁচু মাত্রায় কেন্দ্রীভূত হয়, তাতে সৃষ্টি হয় একচেটিয়া কারবারগুলো, আর্থনীতিক জীবনে সেগুলোর ভূমিকা হয় নিষ্পত্তিমূলক;

২) একচেটিয়া শিল্পের পঁুজির সঙ্গে একচেটিয়া ব্যাঙ্কের পঁুজি মিলেমিশে যায়, সেই ভিত্তিতে সৃষ্টি হয় ‘ফিনান্স পঁুজি’ আর আর্থ চক্রতন্ত্র;

৩) পণ্য রপ্তানি থেকে পৃথক ব্যাপার — পঁুজি রপ্তানি হয়ে ওঠে অসাধারণ গুরুত্বসম্পন্ন;

৪) গড়ে ওঠে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক একচেটিয়া পঁুজিতান্ত্রিক পরিমেল, সেগুলো পৃথিবীটাকে নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করে নেয়;

৫) সবচেয়ে বড় পঁুজিতান্ত্রিক শক্তিগুলোর মধ্যে পৃথিবীর অঞ্চলগত ভাগাভাগি পূর্ণাঙ্গ হয়ে যায়।

১। একচেটিয়াগুলো আর ফিনান্স পঁুজির আধিপত্য

উৎপাদন আর পঁুজির কেন্দ্রীভবন

পঁুজিতন্ত্রের বিকাশের ধারায় দেখা দিয়েছিল অবাধ প্রতিযোগিতা, তাতে সর্বক্ষেত্রেই ছোট শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলোর উপর বড়গুলোর জয় হল, ছোট আর মাঝারি শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলো সর্বস্বান্ত হয়ে চলে গেল বড়গুলোর হাতে। এইভাবে অবাধ প্রতিযোগিতা উৎপাদন কেন্দ্রীভূত করল — দেখা দিল প্রকান্ড-প্রকান্ড শিল্পপ্রতিষ্ঠান, সেগুলিতে নিযুক্ত শ্রমিকদের সংখ্যা ক্রমাগত বেড়ে চলল, এরা বিপুল পরিমাণ কাঁচামালের আকারণ করতে থাকল, উৎপন্ন করতে থাকল শিল্পোৎপাদনের বেশির ভাগটাই।

এখন, প্রধান-প্রধান পঁুজিতান্ত্রিক দেশগুলিতে এক হাজার এবং তার বেশি শ্রমিক খাটানো শিল্পপ্রতিষ্ঠানের সংখ্যাটা শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলোর মোট সংখ্যার একটা নগণ্য অংশ (এক

কিংবা দুই শতাংশ)। কিন্তু, শিল্পে নিযুক্ত সমস্ত শ্রমিক আর কর্মচারীদের তৃতীয়াংশ থেকে দুই-পঞ্চমাংশ সেইগুলোতেই, শিল্পোৎপাদনের বেশির ভাগটাই হয় ঐসব শিল্পপ্রতিষ্ঠানে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যন্ত্রশিল্পে কারবার আছে ৪,৫০,০০০, সবচেয়ে বড় ৫০০ কারবারে উৎপন্ন হয় মোট উৎপাদের দুই-তৃতীয়াংশ, আর উৎপন্ন পণ্যের তৃতীয়াংশের বেশি দেয় ১০০টা ভীমকায় পরিমেল।

আধুনিক বৈজ্ঞানিক আর প্রযুক্তিগত অগ্রগতি উৎপাদন কেন্দ্রীভূত করতে বহুলাংশে সহায়ক। প্রযুক্তির অগ্রগতির ফলে, বিশেষত স্বয়ংক্রিয়তা আর সাইবারনেটিক্স চালু করার ফলে, আর্থনীতিক ফলপ্রদতা নিশ্চিত করার জন্যে বিপুল পরিমাণ পুঁজি-বিনিয়োগ ক'রে উৎপাদন আরও সম্প্রসারিত করা আবশ্যক হয়ে পড়ে।

উৎপাদন কেন্দ্রীভূত হবার সঙ্গে সঙ্গে কেন্দ্রীভূত হয় পুঁজিও — অর্থাৎ, এক-এক হাতে ক্রমাগত বেশি পরিমাণ পুঁজি কেন্দ্রীভূত হয়। পুঁজি কেন্দ্রীভূত করাটাকে চাঙ্গা করার একটা শক্তিশালী হাতিয়ার হল জয়েণ্ট-স্টক কম্পানিগুলোর প্রসার। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এখন শিল্পোৎপাদের ৯০ শতাংশ উৎপন্ন হয় কর্পোরেশনগুলোতে (জয়েণ্ট-স্টক কম্পানি)। অন্যান্য পুঁজিতান্ত্রিক দেশেও তাই।

সমস্ত পুঁজিতান্ত্রিক দেশেই উৎপাদন সবচেয়ে দ্রুত কেন্দ্রীভূত হয় ভারি শিল্পের সমস্ত শাখায় এবং সাম্রাজ্যবাদী যুগে দ্রুত গজিয়ে উঠতে শুরু করা নতুন শিল্পগুলিতে — সেগুলি হল খনি, ধাতুশিল্প, বৈদ্যুতিক, ইঞ্জিনিয়রিং আর রাসায়নিক শিল্প।

একচেটিয়াগুলোর উদ্ভব এবং বৃদ্ধি

উৎপাদন আর পুঁজির কেন্দ্রীভবনের ফলে একচেটিয়া কারবারগুলোর উদ্ভব আর বৃদ্ধির পথ প্রশস্ত হয়। এই কেন্দ্রীভবন এগিয়ে চলার একটা পর্বে সরাসরি আসে একচেটিয়া।

একচেটিয়া কাকে বলে? একচেটিয়া হল পুঁজিপতিদের মধ্যে একটা রফা, কিংবা তাদের সম্মিলনী কিংবা পরিমেল। একটা পৃথক বৃহৎ শিল্পপ্রতিষ্ঠানও একচেটিয়া হতে পারে। একচেটিয়া কারবারগুলোর রূপ যা-ই হোক না কেন, সবগুলির লক্ষ্য একই — সেটা হল উৎপাদনে আর বাজারে আধিপত্য করা এবং অতি লাভ তোলা।

প্রত্যেকটা শাখায় উৎপাদন শত-শত এবং হাজার-হাজার স্বতন্ত্র ছোট আর মাঝারি শিল্পপ্রতিষ্ঠানের মধ্যে ছড়িয়ে থাকলে একচেটিয়া কায়েম করা কঠিন। উৎপাদন আর পুঁজি কেন্দ্রীভূত হবার ফলে পরিস্থিতিটা বদলে যায়। এক-একটা শাখায় অবশিষ্ট থাকে মাত্র কয়েক ডজন বড় শিল্পপ্রতিষ্ঠান। শত-শত মাঝারি এবং হাজার-হাজার ছোট শিল্পপ্রতিষ্ঠানের চেয়ে ঐ কয়েক ডজন বড় প্রতিষ্ঠানের মধ্যে রফা ঢের বেশি সহজ।

বিশ শতকের শুরু নাগাত পুঁজিতান্ত্রিক দেশগুলির অর্থনীতিতে একচেটিয়া কারবারগুলো মূল-মূল অবস্থানে এসে গিয়েছিল।

একচেটিয়া আধিপত্য — সাম্রাজ্যবাদের অন্তর্নিহিত আর্থনীতিক বৈশিষ্ট্য। একচেটিয়াগুলো অবাধ প্রতিযোগিতা দমন করে — এখানেই রয়েছে সাম্রাজ্যবাদের আর্থনীতিক মর্মবস্তু।

সমস্ত পুঁজিতান্ত্রিক দেশে চলে একচেটিয়া কারবারগুলোর অখণ্ড নিয়ন্ত্রণ। উৎপাদন, বাণিজ্য আর ক্রেডিটের ক্ষেত্রে সেগুলো সর্বশক্তিমান। বাজারগুলো আর কাঁচামালের উৎসগুলো তাদের নিয়ন্ত্রণে, তাদের হাতে বৈজ্ঞানিক কর্মিদল আর দক্ষ শ্রমিকেরা। আর্থনীতিক আর রাজনীতিক ক্রিয়াকলাপের সমস্ত ক্ষেত্রে তাদের শুঁয়োগুলো ছড়িয়ে আছে অক্টোপাসের মতো।

পুঁজিতান্ত্রিক দেশগুলিতে একচেটিয়াগুলোর আধিপত্য, সেগুলোর আকার আর গুরুত্ব অপরিমেয়ভাবে বেড়ে গেছে গত কয়েক দশকে। কতকগুলো মূল শিল্পে উৎপাদনের সবচেয়ে বড় অংশটা এখন এক-একটা একচেটিয়া কারবারের নিয়ন্ত্রণে। অন্যান্য পণ্যের উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ করে বিভিন্ন 'দুই প্রধান', 'তিন প্রধান', 'চার প্রধান', ইত্যাদিরা।

বিভিন্ন হিসাব অনুসারে দেখা যায়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে চারটে এবং আটটা বিশাল কর্পোরেশনে যথাক্রমে উৎপন্ন হয় লোহা আর ইস্পাতের ৫৩ আর ৭০ শতাংশ, কৃত্রিম তন্তুর ৭৮ আর ৯৬ শতাংশ, জৈব রসায়নের ক্ষেত্রে ৬৫ আর ৭০ শতাংশ, ঐ দেশে তৈরি মোটরগাড়ির মোট সংখ্যার ৭৫ আর ৮১ শতাংশ, ৫৯ আর ৮৩ শতাংশ বিমান, ৬৫ আর ৯০ শতাংশ ট্র্যাক্টর।

১৯৭২ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পাঁচ শ' বিশাল একচেটিয়া কারবারে উৎপন্ন হয়েছিল সর্বমোট শিল্পোৎপাদের ৬৬ শতাংশ, আর শিল্পে সর্বমোট লাভের ৭৫ শতাংশ গিয়েছিল তাদের ঘরে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে শিল্পক্ষেত্রে মোট শ্রমিকদের ৭৫ শতাংশ খাটছিল তাদের শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলোয়।

পৃথিবীতে সবচেয়ে বড় পুঁজিতান্ত্রিক একচেটিয়া কারবার হল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মোটরযান শিল্পের 'জেনারেল মোটর্স'

ট্রাস্টটা। ১৯৭১ সালে এর বাণিজ্যের পরিমাণ দাঁড়িয়েছিল ২,৮০০ কোটি ডলার, এর পংজি ছিল ১,৪২০ কোটি ডলার, আর নীট লাভ উঠেছিল ১৭০ কোটি ডলার। এর শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলোতে নিযুক্ত লোকের সংখ্যা ছিল ৭ লক্ষ ৭৩ হাজার।

একচেটিয়ার প্রধান-প্রধান রূপ

একচেটিয়ার সবচেয়ে সরল রূপ হল দাম সম্বন্ধে বিভিন্ন স্বল্পমেয়াদী চুক্তি। চুক্তির যা মেয়াদ সেই সময়ে চুক্তিতে নির্দিষ্ট বিক্রির দাম বজায় রাখতে স্বাক্ষরকারীরা বাধ্য থাকে। একচেটিয়ার বিকাশের ধারায় পরবর্তী ধাপ হল দাম আর বিক্রি সংক্রান্ত চুক্তি, তাকে বলে কার্টেল আর সিন্ডিকেট। কোন কার্টেলের সদস্যরা বিক্রির বাজার নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করে নেয়, একটা নির্দিষ্ট মাত্রার নিচে পণ্যের দাম না নামাতে তারা বাধ্য থাকে। কার্টেলে প্রত্যেকটি অংশীদারের কোটা অনেক সময়ে বাঁধা থাকে।

ট্রাস্ট একটা উচ্চতর রূপের একচেটিয়া পরিমেল। ট্রাস্টে ঢুকলে শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলোর স্বাধীন অস্তিত্ব আর থাকে না, সেগুলো মিলে হয়ে ওঠে একটা অবিভক্ত প্রতিষ্ঠান। সেগুলোর মালিকেরা হয় ঐ ট্রাস্টের শেয়ারহোল্ডার, তারা ডিভিডেন্ড পায় নিজ-নিজ শেয়ারের সংখ্যা অনুসারে।

ট্রাস্টগুলো মিলে অনেক সময়ে গড়ে কনসার্ন নামে আরও বড় একচেটিয়া পরিমেল, — শিল্পের বিভিন্ন শাখার ডজন-ডজন, কোন-কোন ক্ষেত্রে শত-শত শিল্পপ্রতিষ্ঠান এবং, তাছাড়া, বিভিন্ন বাণিজ্যিক কারবার, ব্যাঙ্ক, পরিবহণ কম্পানি, ইত্যাদি নিয়ে হয় এইসব কনসার্ন। কোন কনসার্নে কর্তৃত্বশালী দলটা বিপুল পরিমাণ পংজি নিয়ন্ত্রণ করে।

একচেটিয়াগুলো এবং প্রতিযোগিতা

পুঁজিতন্ত্রের প্রাক্-একচেটিয়া পর্বের অবাধ প্রতিযোগিতার একেবারে বিপরীত হল একচেটিয়াগুলো। তারই সঙ্গে, একচেটিয়াগুলোর আধিপত্য কিন্তু প্রতিযোগিতা দূর করে দেয় না। তার উলটো — প্রতিযোগিতা হয়ে ওঠে বরং আরও হিংস্র এবং ধ্বংসকর।

সবচেয়ে অগ্রসর পুঁজিতান্ত্রিক দেশগুলিতেও একচেটিয়াগুলোর পাশাপাশি থাকে প্রাক্-একচেটিয়া এবং কখনও-কখনও প্রাক্-পুঁজিতান্ত্রিক ধরনের অর্থনীতি। উন্নয়নশীল দেশগুলিতে এইসব রকমের অর্থনীতির হিস্‌সাটা আরও বেশি।

পুঁজিতান্ত্রিক দুনিয়ায় জনসংখ্যার বেশ একটা অংশ কৃষক, আর আছে বহুসংখ্যক কারিগর, তারা কাজ করে ছোট-ছোট কর্মশালায়, আর আছে ছোট ব্যাপারীরা এবং বিভিন্ন স্বাধীন শিল্পপ্রতিষ্ঠান, যেগুলো কোন একচেটিয়া পরিমেলে শামিল হয় নি। যাবতীয় উৎপাদনই একচেটিয়াগুলোর অন্তর্ভুক্ত না হলেও, এইসব সংস্থাই কর্তৃত্বশালী, কেননা অর্থনীতির সমস্ত নিয়ন্ত্রণকর অবস্থানগুলো তাদের হাতে।

এই অবস্থায়, প্রচণ্ড লড়াই বেধে যায় একচেটিয়া আর না-একচেটিয়া শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে, একই শাখার বিভিন্ন একচেটিয়া কারবারের মধ্যে এবং একচেটিয়া পরিমেলগুলোর ভিতরেই। পুঁজিতান্ত্রিক সমাজে একচেটিয়া কারবারগুলোর উৎপীড়ন আর স্বেচ্ছাচার 'প্রত্যেকের বিরুদ্ধে প্রত্যেকের লড়াই' এই প্রতিযোগিতাটাকে করে তোলে আরও বিশেষভাবে নির্মম আর ধ্বংসকর। একচেটিয়া আর প্রতিযোগিতার সংযোগে বিভিন্ন গভীর দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়, পুঁজিতান্ত্রিক

ব্যবস্থায় যা স্বাভাবিক, সেই উৎপাদনের অরাজকতা তীব্রতর হয়।

এই নির্মম প্রতিযোগিতার লড়াইয়ের মধ্যে সবচেয়ে বড় একচেটিয়াগুলো তাদের চেয়ে দুর্বল প্রতিদ্বন্দ্বীদের গিলে খায় কিংবা সেগুলোকে ঐ একচেটিয়ায় যোগ দিতে বাধ্য করে — ফলে, একটামাত্র নয়, অর্থনীতির কতকগুলো শাখা জোড়া বিশাল একচেটিয়াগুলো নিয়ন্ত্রণকর অবস্থান দখল করে নেয়। এমনসব কম্পানিকে বলে কংলোমারেট, এরাই পুঁজিতান্ত্রিক দেশগুলিতে অর্থনীতি নিয়ন্ত্রণ করে ক্রমাগত বেশি মাত্রায়।

ব্যাঙ্কিং একচেটিয়া স্থাপন

একচেটিয়াগুলোর যথার্থ ক্ষমতাটা বুঝতে হলে ব্যাঙ্কগুলোর পরিবর্তিত ভূমিকার বিষয়টা বিবেচনায় রাখা আবশ্যক।

শিল্পের মতো ব্যাঙ্কিংয়েও অবাধ প্রতিযোগিতা থেকে আসে কেন্দ্রীভবন, এটা অবশ্যম্ভাবী। ব্যাঙ্কগুলোর সংখ্যা কমে যায়, কিন্তু সেগুলোর আকার আর লেনদেনের পরিমাণ বাড়ে। সামনে এসে যায় মুষ্টিমেয় সবচেয়ে বড়-বড় ব্যাঙ্ক। বিপুল পরিমাণ না খাটানো অর্থ-সম্পদ তারা রাশিকৃত করে, সেটার লাভজনক বিনিয়োগ হওয়া চাই।

শিল্পের মতো ব্যাঙ্কিংয়ে কেন্দ্রীভবন থেকেও গড়ে ওঠে বিভিন্ন একচেটিয়া। ব্যাঙ্কিংয়ে নেতৃত্ব চলে যায় অল্পসংখ্যক বৃহত্তম ব্যাঙ্কগুলির হাতে, তাদের একচেটিয়া দখল কায়েম হয় টাকার বাজারে।

যেমন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সবচেয়ে বড় ৫০টা কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক হল সে-দেশে সমস্ত ব্যাঙ্কের মধ্যে সংখ্যায় ০·৫ শতাংশেরও কম, কিন্তু মোট আমানতের ৪৭·৪ শতাংশ

এবং প্রদত্ত ঋণের ৪৭·৮ শতাংশ তাদের। ইতালিতে ক্রেডিট-দেওয়া সংগঠনগুলির মধ্যে ছ'টা সংখ্যায় ১·৫ শতাংশ, কিন্তু ঐ দেশে মোট আমানতের ৬২ শতাংশ এবং প্রদত্ত ঋণের ৬২ শতাংশ তাদের।

টাকার বাজারে কর্তৃত্ব কায়েম করেই ব্যাঙ্কিং একচেটিয়াগুলো সমস্ত সঞ্চয়ের উপর নিয়ন্ত্রণ পাবার জন্যে সচেষ্ট হয়। তারা নিজেদের আর্থিক ক্ষমতা বাড়ায়, ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ স্থাপন করে বিভিন্ন বিমা কম্পানি, পুঁজি-যোগানদার সংস্থা এবং পুঁজি-বিনিয়োগ সমিতির সঙ্গে। কোন বিশেষ-নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে কর্তৃত্বশালী কোন-না-কোন ব্যাঙ্কিং একচেটিয়ার শাখায় পরিণত হয় এইসব আর্থ সংস্থা। বিরাট পরিমাণ অর্থ রাশিকৃত করে বিমা কম্পানিগুলো। সাম্প্রতিক কয়েক দশকে পেনশন-সংক্রান্ত বিভিন্ন আইন জারি হওয়ায় গড়ে ওঠে বিভিন্ন পেনশন তহবিল, সেগুলির অ্যাকাউন্টে আছে বিপুল পরিমাণ অর্থ। মেহনতী জনগণের মজুরি আর বেতন থেকে কেটে নেওয়া পয়সাই এই সমস্ত অর্থের প্রধান উৎস।

ফিনান্স পুঁজি

শিল্প আর ব্যাঙ্কিংয়ের কেন্দ্রীভবনের ফলে, শিল্পগত আর ব্যাঙ্কিং একচেটিয়াগুলো গড়ে ওঠার ফলে ব্যাঙ্কগুলো আর শিল্পের মধ্যেকার সম্পর্কের ক্ষেত্রে বড়রকমের পরিবর্তন ঘটে।

গোড়ায়, ব্যাঙ্কগুলো ছিল দেওনের মধ্যস্থ। কিন্তু, পুঁজিতন্ত্রের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে ব্যাঙ্কগুলোর ক্রেডিটের কাজকর্মের প্রসার ঘটল — ব্যাঙ্কগুলো হয়ে উঠল পুঁজির

সওদাগর। ব্যাঙ্কগুলো পুঁজিপতিদের স্বল্পমেয়াদী ঋণ দিতে থাকল। আমানতের পরিমাণ বাড়তে থাকলে ব্যাঙ্কগুলো আরও ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ স্থাপন করল শিল্পের সঙ্গে। বিভিন্ন কম্পানির শেয়ার আর বণ্ড্ হস্তগত করে তারা বিভিন্ন শিল্প, বাণিজ্য আর পরিবহণ প্রতিষ্ঠানের যুগ্ম-মালিক হয়ে উঠল। ওদিক থেকে, শিল্পক্ষেত্রের একচেটিয়াগুলোও তাদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যাঙ্কগুলোর শেয়ারহোল্ডার।

এই ভিত্তিতে ব্যাঙ্কিং আর শিল্পক্ষেত্রের একচেটিয়াগুলোর প্রধানদের মধ্যে 'ব্যক্তিগত সম্মিলন' গড়ে ওঠে। শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলোর ব্যবস্থাপনে শরিক হয় ব্যাঙ্কের ডিরেক্টরেরা, আর তেমনি, শিল্পক্ষেত্রের একচেটিয়াগুলোর প্রতিনিধিরা থাকে ব্যাঙ্কগুলোর শাসকবর্গের (গভর্নিং বডি) মধ্যে। ব্যাঙ্কিং, শিল্প আর বাণিজ্যের সবচেয়ে বড় একচেটিয়া পরিমেলগুলোয়, পুঁজিতান্ত্রিক অর্থনীতির অতি বিভিন্ন শাখাগুলিতে কর্তৃত্বে থাকে একই সব লোক।

ব্যাঙ্কিং আর শিল্পগত পুঁজি এক হয়ে যায় ক্রমবর্ধমান মাত্রায়। ব্যাঙ্কিং আর শিল্পগত পুঁজির যুক্ত পুঁজিকে বলে ফিনান্স পুঁজি। ফিনান্স পুঁজির উদ্ভবের প্রক্রিয়াটার সূত্র এবং এই ব্যাপারটার মর্ম খুঁজে বের ক'রে লেনিন তুলে ধরেছিলেন নিম্নলিখিত উপাদানগুলি: উৎপাদনের কেন্দ্রীভবন, তার থেকে গড়ে ওঠা একচেটিয়াগুলো, ব্যাঙ্কিং আর শিল্পগত একচেটিয়াগুলোর মিলেমিশে যাওয়া কিংবা এক হয়ে যাওয়া। সাম্রাজ্যবাদ ফিনান্স পুঁজির যুগ।

পুঁজিতান্ত্রিক ব্যক্তিগত সম্পত্তির পরজীবীয় প্রকৃতিটা ফিনান্স পুঁজির আধিপত্যের ফলে স্পষ্ট প্রকটিত হয়ে ওঠে। পুঁজিতন্ত্রের প্রাক্-একচেটিয়া পর্বে পুঁজিপতির ব্যক্তিগত সম্পত্তির অর্থ ছিল এই যে, অন্যান্যের শ্রম এবং শ্রমের ফল

আত্মসাৎ করার অধিকার ছিল উৎপাদনের উপকরণের মালিকের। ফিনান্স পংজির যংগে একচেটিয়াপতিরা নিয়ন্ত্রণ করে অন্যান্যের শ্রমই শংধং নয়, অন্যান্যের পংজিও, যেটার পরিমাণ অনেক সময়ে তাদের নিজেদের পংজির চেয়ে বেশি। একচেটিয়াপতিরা অন্যান্যের পংজি থেকে তোলা লাভের বেশির ভাগটা আত্মসাৎ করে এবং ঐসব পংজির উপর ক্রমাগত বেশি মাত্রায় নিয়ন্ত্রণ খাটায়।

আর্থ চক্রতন্ত্র

একচেটিয়া কারবারগংলো এবং ফিনান্স পংজির বংদ্ধির দরংন প্রত্যেকটা পংজিতান্ত্রিক দেশে আর্থনীতিক জীবনের নিয়ন্ত্রণ চলে যায় মংষ্টিমেয় বংহত্তম ব্যাঙ্ক-মালিক আর শিল্পপতিদের হাতে। আর্থ চক্রতন্ত্রের (অলিগার্কি) আধিপত্য হল ফিনান্স পংজির ক্ষমতার মংর্ত-নির্দিষ্ট প্রকাশ ('অলিগার্কিয়া' এই গ্রীক শব্দটার অর্থ — 'অল্প কয়েকজনের শাসন')। পংজিতান্ত্রিক দেশগংলির রাষ্ট্রীয় রংপ যা-ই হোক, সেখানে অভূতপংর্ব ক্ষমতা আর কর্তৃত্বের অধিকারী হয়ে ব্যাঙ্কিং আর শিল্পক্ষেত্রের একচেটিয়াগংলোর প্রধানেরা খেয়ালখংশিমতো অর্থনীতি নিয়ন্ত্রণ করে।

ঐসব দেশে রাজনীতিক ব্যবস্থা নির্বিশেষে জনজীবনের সমস্ত ক্ষেত্রেই আর্থ চক্রতন্ত্রের আধিপত্যের চোট পড়ে, এটা অবশ্যম্ভাবী। স্বরাষ্ট্রনীতি আর পররাষ্ট্রনীতির প্রতিক্রিয়াপন্থী ধারাটাকে স্থির করে দেয় ঐ আর্থ চক্রতন্ত্র। শত-শত কোটি মংদ্রার উপর নিয়ন্ত্রণ খাটিয়ে মংষ্টিমেয় বংহত্তম কারবারিরা চালং করে আগ্রাসী কর্মনীতি, আক্রমণ-অভিযান, অস্ত্রসজ্জার প্রতিযোগিতা, নতুন-নতুন যংদ্ধের প্রস্তুতি।

বুর্জোয়া পত্র-পত্রিকাজগৎ, বিজ্ঞান আর আর্টের উপর নিয়ন্ত্রণ খাটায় আর্থ চক্রতন্ত্র। তারা উপরতলার সরকারী আমলাদের উৎকোচ দিয়ে বশীভূত করে, নিজেদের মতলব হাসিল করার জন্যে 'জনমত' গঠন করে, নিয়ন্ত্রণ করে সমস্ত গণ-মাধ্যম, সেগুলোকে ব্যবহার করে জনগণের মন বিষিয়ে দেবার জন্যে। ব্যাঙ্কগুলো আর শিল্প এবং একচেটিয়াগুলো আর সরকারের মধ্যে গড়ে-ওঠা ব্যক্তিগত সম্মিলনের সাহায্যে তারা সমাজে আধিপত্য চালায়। আর্থ চক্রতন্ত্র তাদের দেশে-দেশে জনসাধারণের উপর ভয়ঙ্কর বোঝা চাপিয়ে দেয়, আর অন্যান্য দেশকে জড়িয়ে নেয় আর্থিক নির্ভরশীলতার জালে, এটা হল পৃথিবীর যে-অংশটা সাম্রাজ্যবাদী শাসনাধীন সেখানে এবং মুখ্যত উন্নয়নশীল দেশগুলিতে শোষণের আর্থনীতিক ভিত্তি।

আর্থ-চক্রতান্ত্রিক জোটগুলো

সমস্ত পুঁজিতান্ত্রিক দেশে মূল ধারাটা নির্দিষ্ট করে দেয় শক্তিশালী শিল্পগত আর আর্থ সাম্রাজ্যগুলো, — অন্যান্যের বিপুল পরিমাণ পুঁজির উপর মুষ্টিমেয় ধনকুবেরদের আধিপত্যই ঐ সাম্রাজ্যগুলোর অবলম্বন। আজকের পুঁজিতান্ত্রিক সমাজে পুঁজির কেন্দ্রীভবন কনসার্নগুলোর মাত্রা ছাড়িয়ে যায়। একচেটিয়াকরণের সর্বোচ্চ রূপ হল আর্থ-চক্রতান্ত্রিক জোটগুলো, অমন জোট আছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রায় কুড়িটা, বৃটেনে আর ফ্রান্সে প্রায় দশটা, জাপানে ছ'টা কিংবা সাতটা।

কোন আর্থ জোটের কেন্দ্রী উপাদান হল পরস্পরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট ব্যাঙ্কিং আর শিল্পগত একচেটিয়া।

সর্দার কম্পানিগুলোর এক হয়ে-যাওয়া উপরতলটা অর্থনীতির বিভিন্ন শাখায় সক্রিয় অন্যান্য বহু কম্পানির উপর নিয়ন্ত্রণ পাকাপোক্ত করে নেয়। বহু কম্পানি থাকে কয়েকটা আর্থ জোটের প্রভাবাধীন ক্ষেত্রের ভিতরে। এই জোটগুলো মূল অবস্থানগুলো দখল করে শেয়ারহোল্ডিং, ব্যক্তিগত সম্মিলন আর দীর্ঘমেয়াদী ক্রেডিট মারফত, আর্থিক সাংগঠনিক আর প্রযুক্তিগত সম্পর্কের ভিতর দিয়ে, আবার, বিশেষ-বিশেষ চুক্তি করেও।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সর্বপ্রধান আর্থ জোটগুলোর মধ্যে প্রধান ভূমিকায় আছে নিউ ইয়র্কের আটটা জোট, — ২১,৪০০ কোটি ডলারের পরিসম্পৎ তাদের নিয়ন্ত্রণে। নিউ ইয়র্কের জোটগুলোর নিয়ন্ত্রিত পরিসম্পতের ৬০ শতাংশের বেশি কেন্দ্রীভূত আছে মর্গান আর রকফেলার জোটদুটোর হাতে।

রকফেলার জোটের কেন্দ্রী ভাগ হল 'স্ট্যান্ডার্ড অয়েল' ট্রাস্ট এবং 'চেজ্ ম্যানহ্যাটেন ব্যাঙ্ক', যা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বৃহত্তম। অর্থনীতির কতকগুলো শাখায় বহু কর্পোরেশনকে নিয়ন্ত্রণ করে এই জোটটা। মর্গান জোট আরও শক্তিশালী শিল্প আর আর্থ সাম্রাজ্য। মর্গানদের ব্যাঙ্কিং প্রতিষ্ঠানকে কেন্দ্র করে গড়া এই জোটটা বিভিন্ন শিল্পক্ষেত্রের কতকগুলো একচেটিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করে, এইগুলোর মধ্যে আছে — 'ইউ. এস. স্টীল কর্পোরেশন', 'জেনারেল মোটর্স', 'জেনারেল ইলেকট্রিক' কম্পানি, 'পুলম্যান' কর্পোরেশন, একটা টেলিফোন আর টেলিগ্রাফের কম্পানি, ডজন-ডজন বিদ্যুৎ-উৎপাদন কম্পানি, কতকগুলো প্রধান রেলওয়ে কম্পানি আর ব্যাঙ্ক।

২। পুঁজিতান্ত্রিক বিশ্ব আর্থনীতিক ব্যবস্থা।
পৃথিবীজোড়া আধিপত্যের জন্যে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলোর সংগ্রাম

পুঁজিতান্ত্রিক বিশ্ব আর্থনীতিক ব্যবস্থার উদ্ভব

একচেটিয়া পর্বে পেঁছে পুঁজিতন্ত্র হয়ে উঠল একটা বিশ্বব্যবস্থা, তাতে কেন্দ্রীভবন ঘটল এমন মাত্রায়, যাতে প্রায় সারা পৃথিবীই একচেটিয়া পুঁজির পদানত হল, সেটা হয় ঔপনিবেশিক দাসত্ববন্ধনের রূপে, নইলে অন্যান্য দেশকে আর্থিক শোষণের অসংখ্য জালে জড়িয়ে ফেলে। লেনিন বলেছিলেন, সাম্রাজ্যবাদ মানে বুঝতে হবে — পুঁজি বিভিন্ন জাতীয় রাষ্ট্রের সীমান্ত লঙ্ঘন করে গেছে, ফিনান্স পুঁজি এমন পরিসরে পরস্পরসম্পর্কিত হয়েছে, যার ফলে ঘটেছে পুঁজির আন্তর্জাতীয়করণ, ঘটেছে আর্থনীতিক সম্পর্কের আন্তর্জাতীয়করণ।

বুর্জোয়া মতাদর্শবাদীরা অর্থনীতির পুঁজিতান্ত্রিক বিশ্বব্যবস্থাটাকে একটা আশীর্বাদ হিসেবে চিত্রিত করে, তারা বলতে চায়, এই ব্যবস্থাটার উদ্ভবের ফলে মানবজাতি বৈজ্ঞানিক আর প্রযুক্তিগত অগ্রগতি এবং আন্তর্জাতিক শ্রমবিভাগ থেকে উপকৃত হতে পেরেছে। তারা দেখাতে চায়, আগে-অনগ্রসর দেশগুলিকে আর্থনীতিক আর সাংস্কৃতিক উন্নতির সমস্ত আবশ্যক অবস্থা যুগিয়েছে পুঁজিতন্ত্র।

কিন্তু, বাস্তবিকপক্ষে, সামাজিক প্রগতির সমস্ত সুফল আত্মসাৎ করল সবচেয়ে অগ্রসর পুঁজিতান্ত্রিক দেশগুলির একচেটিয়া কারবারগুলো, আর উপনিবেশ এবং আধা-উপনিবেশগুলির মানুষকে সাম্রাজ্যবাদ মানুষের মতো বাঁচার

প্রাথমিক অবস্থাগুলো থেকেও বঞ্চিত করল, তাদের জন্যে অবধারিত করে দিল গরিবি আর ভুখা।

অর্থনীতির পুঁজিতান্ত্রিক বিশ্বব্যবস্থাটার ভিত্তি হল আধিপত্য আর পদানত করার সম্পর্ক। এই ব্যবস্থায় পুঁজির কর্তৃত্বাধীন পৃথিবী দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে গেল: একদিকে ছিল মুষ্টিমেয় অগ্রসর পুঁজিতান্ত্রিক দেশ, তাদের হাতে বিপুল পরিমাণ ফিনান্স পুঁজি, মানবজাতির অপরাংশে তারা শোষণ চালাত, আর অন্যদিকে, পৃথিবীর জনসংখ্যার বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ — তারা হল উপনিবেশ আর নির্ভরশীল দেশগুলির নিপীড়িত আর শোষিত মানুষ।

পুঁজি রপ্তানি, একচেটিয়া কারবারগুলোর মধ্যে পৃথিবীর আর্থনীতিক ভাগাভাগি, প্রধান শক্তিগুলির মধ্যে পৃথিবীর অঞ্চলগত ভাগাভাগি সমাধা — একচেটিয়া আধিপত্যের এইরকমের সব অভিব্যক্তি থেকেই গড়ে উঠেছিল এই ব্যবস্থাটা।

পুঁজি রপ্তানি

অবাধ প্রতিযোগিতা নিয়ে প্রাক্-একচেটিয়া পুঁজিতন্ত্র, তারই পক্ষে বিশেষক ছিল পণ্য রপ্তানি। সাম্রাজ্যবাদ আর একচেটিয়া কারবারের কর্তৃত্বের আমলে পণ্য রপ্তানির বিপুল প্রসার ঘটে। কিন্তু, সাম্রাজ্যবাদের সবচেয়ে বিশেষক উপাদান হল পুঁজি রপ্তানি।

অগ্রসর দেশগুলিতে একচেটিয়া কারবারগুলোর আধিপত্যে পুঁজির সঞ্চয়ন ঘটে সুবিশাল পরিমাণে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ঠিক আগে পৃথিবীর শিল্পোৎপাদনের প্রায় ৭৫ শতাংশ এবং সিকিউরিটির ৮০ শতাংশ কেন্দ্রীভূত ছিল সবচেয়ে বড় চারটে পুঁজিতান্ত্রিক দেশে — মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন, ফ্রান্স আর

জার্মানিতে। এইভাবে, 'উদ্বৃত্ত পুঁজিতে' একচেটিয়া ছিল অল্প কয়েকটা পুঁজিতে সমৃদ্ধ দেশের।

পুঁজি 'উদ্বৃত্ত' হয়, তার কারণ, প্রথমত, জনগণের জীবনযাত্রার নিচু মানের ফলে উৎপাদনের আরও প্রসার ব্যাহত হয়, আর, দ্বিতীয়ত, অর্থনীতির বিভিন্ন শাখার উন্নয়নে ক্রমবর্ধমান অসমতা সৃষ্টি হয়। ফলে, যেখানে পুঁজি থেকে লাভ ওঠে চড়া হারে, সেইসব দেশে 'উদ্বৃত্ত' পুঁজি রপ্তানি করা হয়।

বুর্জোয়া মতাদর্শবাদীরা বলতে চায়, সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির পুঁজি রপ্তানি যেন অনগ্রসর দেশগুলির পক্ষে একটা আশীর্বাদ। তারা বলে, পুঁজি রপ্তানি ক'রে ধনী দেশগুলি গরিব দেশগুলির শিল্পোন্নয়নে, রেলপথ নির্মাণে এবং প্রগতির পথে এগোতে সাহায্য করে।

কিন্তু, আসলে, পুঁজি রপ্তানি কোন-কোন দেশকে অন্যান্য দেশের পদানত করার উপায়, পুঁজি রপ্তানি হয়ে ওঠে সাম্রাজ্যবাদী উৎপীড়নের ভিত্তি। পুঁজি-আমদানিকারী দেশগুলি সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। পুঁজি রপ্তানি ক'রে অল্প কয়েকটা অগ্রসর পুঁজিতান্ত্রিক দেশের আর্থ চক্রতন্ত্র অনগ্রসর দেশগুলিকে শৃঙ্খলিত করে। ঋণগুলোর বাবত সুদ আর পরদেশগুলিতে শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলো থেকে তোলা লাভ — এই উদ্বৃত্ত মূল্য স্রোতের মতো সমানে বয়ে চলে যায় পাওনাদার রাষ্ট্রগুলোতে। রপ্তানি-করা পুঁজি থেকে পাওয়া আয় প্রধান-প্রধান পুঁজিতান্ত্রিক দেশগুলির একচেটিয়া কারবারগুলোর সমৃদ্ধির একটা প্রধান উৎস।

সদ্য-স্বাধীন উন্নয়নশীল দেশগুলির মানুষ এখন ঔপনিবেশিক উৎপীড়নের গুরুভার কুফলগুলো দূর করতে সচেষ্ট রয়েছে — এই সময়ে ঐসব দেশে বিনিয়োজিত পুঁজির

সুযোগ নিয়ে নিজেদের আর্থনীতিক আধিপত্য দীর্ঘস্থায়ী করতে চেষ্টা করছে বৈদেশিক একচেটিয়া কারবারগুলো।

একই সঙ্গে, কোন-কোন অগ্রসর পুঁজিতান্ত্রিক দেশ থেকে অন্য কোন-কোন অগ্রসর পুঁজিতান্ত্রিক দেশে পুঁজি রপ্তানি অনেকটা বেড়েছে। কানাডায় আর পশ্চিম ইউরোপে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একচেটিয়াগুলোর পুঁজি রপ্তানি বেড়েছে বিশেষ উঁচু হারে।

পুঁজি রপ্তানির বড়রকমের একটা পরিণতি হল, সাম্রাজ্যবাদীদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতাবৃদ্ধি, তাদের মধ্যেকার দ্বন্দ্বগুলোর প্রকোপবৃদ্ধি, প্রভাবাধীন ক্ষেত্রের জন্যে সংগ্রামের তীব্রতাবৃদ্ধি।

পুঁজির আন্তর্জাতীয়করণের সবচেয়ে লক্ষণীয় অভিব্যক্তি এই পুঁজি রপ্তানির ফলে সবচেয়ে ধনী মুষ্টিমেয় পুঁজিতান্ত্রিক দেশ অন্যান্য দেশের দিক থেকে সুদখোরে পরিণত হয়। অগ্রসর পুঁজিতান্ত্রিক দেশগুলির কোন-কোনটা থেকে অন্য কোন-কোনটায় পুঁজি রপ্তানির ফলে বিভিন্ন দেশের একচেটিয়াগুলোর মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা অনিবার্যভাবেই প্রচণ্ডতর হয়, আর সাম্রাজ্যবাদী দ্বন্দ্বগুলো প্রজ্বলিত হয়ে ওঠে।

আন্তর্জাতিক একচেটিয়াগুলো

আন্তর্জাতিক একচেটিয়াগুলোর কার্যকলাপ পুঁজি রপ্তানির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট। প্রধান দেশগুলির আর্থনীতিক জীবনে কর্তৃত্বের অবস্থানে দাঁড়িয়ে একচেটিয়াগুলো প্রথমত এবং সর্বোপরি দেশী বাজারে অখণ্ড আধিপত্যের জন্যে সচেষ্ট হয়। কিন্তু, শুধু তাই নয়। দৈত্যকায় একচেটিয়া কারবারগুলোর উৎপাদনের যা পরিধি, সেটা নিয়ে দেশী বাজার প্রায়ই এঁটে

উঠতে পারে না। এই দৈত্যগুলো আরও আরও বাড়তে থাকলে তারা পৃথিবীর বাজারটাকে ভাগাভাগি করে নেবার জন্যে সাধ্যায়ত্ত সবকিছুই করে। এর ফলে দেখা দেয় আন্তর্জাতিক একচেটিয়াগুলো — সেগুলো হল পৃথিবীর বাজার ভাগাভাগি করে নেবার জন্যে কতকগুলি দেশের একচেটিয়াপতিদের মধ্যে বিভিন্ন চুক্তি, সেটা হল পৃথিবীতে পুঁজি আর উৎপাদনের কেন্দ্রীভবনের একটা নতুন এবং উচ্চতর পর্ব, তার ফলে গড়ে ওঠে বিভিন্ন অতি একচেটিয়া কারবার।

একচেটিয়াপতিদের আন্তর্জাতিক চুক্তিগুলো নানা হিংস্র সংঘাতে ঠাসা থাকে। আন্তর্জাতিক একচেটিয়াগুলো যে-পরিমাণে ক্ষমতা খাটাতে পারে, তদনুসারে তাদের মধ্যে আন্তর্জাতিক বাজার ভাগাভাগি হয়। বিভিন্ন দেশের একচেটিয়াগুলোর ক্ষমতা সবসময়ে বদলায়, আর তার ফলে, বাজারগুলোকে নতুন করে ভাগাভাগি করার জন্যে হিংস্র সংগ্রাম চলে। বিভিন্ন জোটের পরিচালিত এই সংগ্রামটাকে তাদের নিজ-নিজ রাষ্ট্র সমর্থন করে।

দুটো বিশ্বযুদ্ধের অন্তর্বর্তীকালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের জন্যে বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদের প্রস্তুতিতে একটা মারাত্মক ভূমিকায় ছিল আন্তর্জাতিক একচেটিয়াগুলো। একচেটিয়াগুলো যেসব রফা করেছিল সেগুলোর ভিত্তিতে গড়ে উঠেছিল ফাশিস্ত আক্রমণকারীদের সম্বন্ধে পশ্চিমী শক্তিগুলির 'তোষণ' আর উৎসাহনের কর্মনীতি, তারই ফলে বেধেছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফলে উদ্ভূত পরিবর্তিত অবস্থায় আন্তর্জাতিক একচেটিয়ার নতুন-নতুন রূপ দেখা দিল — সেগুলো ব্যাপক হয়ে উঠল অচিরেই। বৈজ্ঞানিক আর প্রযুক্তিগত বিপ্লব এবং বৃহৎ পরিসরে গুচ্ছগুচ্ছ আর বিপুল পরিমাণে উৎপাদনের প্রসারের ফলে শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলোর

সর্বোপযোগী আকার বাড়ানো আবশ্যক হয়ে পড়ল, তেমনসব শিল্পায়তন নির্মাণ করা কেবল সবচেয়ে ক্ষমতাশালী কারবার বা একচেটিয়া পরিমেলগুলোর সাধ্যেই কুলোয়। জাতীয় সীমান্তগুলো ছাপিয়ে গিয়ে এইরকমের সব পরিমেল সমষ্টিগত-মালিকানাধীন বিভিন্ন শিল্পপ্রতিষ্ঠান স্থাপন করে, সেগুলো কয়েকটা দেশের একচেটিয়াগুলোর সম্পত্তি। তারই সঙ্গে সঙ্গে, পুঁজিতান্ত্রিক বিশ্ববাজারে প্রতিদ্বন্দ্বিতা প্রবলতর হয়, বুর্জোয়া রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে কারেন্সি, বহির্বাণিজ্য এবং অন্যান্য বিষয়ে লেনদেন একচেটিয়াগুলোকে সরাসরি ব্যবহারকারী অঞ্চল-গুলোতেই বিভিন্ন শিল্পপ্রতিষ্ঠান স্থাপন করতে উৎসাহ যোগায়।

ফলে, পৃথিবীতে নিম্নলিখিত বিভিন্ন ধরনের আন্তর্জাতিক একচেটিয়াগুলোর প্রসার ঘটেছে: পেটেন্ট চুক্তি; বিভিন্ন উৎপাদন কর্মসূচি সমন্বিত করা, সরঞ্জাম বসানো এবং পারস্পরিক তথ্য আর অভিজ্ঞতা বিনিময়ের বিভিন্ন সম্মিলনী; বিভিন্ন দেশের একচেটিয়াপতিদের মালিকানাধীন বিভিন্ন যৌথ শিল্পপ্রতিষ্ঠান স্থাপন।

এখন যেসব অতি একচেটিয়া প্রতিষ্ঠান রয়েছে, সেগুলো এক-একটা কংলোমারেট, সেগুলো গড়ে ওঠার মূলে রয়েছে — অর্থনীতিতে কেন্দ্রীভবন আর একচেটিয়াকরণ, ফিনান্স পুঁজির বৃদ্ধি, পুঁজির প্রচরণ এবং পৃথিবীর আর্থনীতিক ভাগাভাগি। বলা যেতে পারে, এইসব উপাদান সাম্রাজ্যবাদের প্রধান আর্থনীতিক বৈশিষ্ট্যগুলোকে সংশ্লেষিত করে।

একচেটিয়া জোটগুলোর মধ্যে পুঁজিতান্ত্রিক দুনিয়ার আর্থনীতিক ভাগাভাগির আধুনিক পদ্ধতিগুলোর বিশেষক উপাদান হল এই ভাগাভাগির রাষ্ট্রীয়-একচেটিয়া রূপগুলোর ব্যাপক প্রসার। বাজারগুলোকে ভাগাভাগি করার বিভিন্ন রাষ্ট্রীয়-একচেটিয়া রূপ হল একীকরণের নামে স্থাপিত

বিশেষ-বিশেষ আর্থনীতিক ব্লক। ইউরোপীয় কয়লা-ইস্পাত গোষ্ঠী স্থাপনের পরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল 'ইউরোঅ্যাটম' এবং ইউরোপীয় ইকনমিক কমিউনিটি ('বারোয়ারী বাজার')। আরও স্থাপিত হয়েছিল সাতটা দেশের প্রতিদ্বন্দ্বী গোষ্ঠী, তার নাম ইউরোপীয়ান ফ্রী ট্রেড অ্যাসোসিয়েশন (ইউরোপীয় অবাধ বাণিজ্য সমিতি)। ১৯৭৩ সালের শুরু থেকে এই অ্যাসোসিয়েশনের তিনটি সদস্য 'বারোয়ারী বাজারে' শামিল হওয়ায় এতে শরিকদের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে নয়-এ, অপর চার সদস্য 'বারোয়ারী বাজারের' সঙ্গে শিল্পজাত জিনিসে বাণিজ্যের চুক্তি সই করেছে।

পুঁজির প্রচরণ এবং আন্তর্জাতিক অতি-একচেটিয়া প্রতিষ্ঠানগুলোর বৃদ্ধির ফলে অগ্রসর পুঁজিতান্ত্রিক দেশগুলির আর্থনীতিক ক্রিয়াকলাপের আরও আন্তর্জাতীয়করণ ঘটছে।

পৃথিবীর অঞ্চলগত ভাগাভাগি এবং নতুন ভাগাভাগির জন্যে সংগ্রাম

সাম্রাজ্যবাদের আমলে সবচেয়ে বড় একচেটিয়া কারবারগুলো পৃথিবীটাকে নিজেদের মধ্যে অর্থনীতিগতভাবে ভাগাভাগি করে নিল, আর পৃথিবীর অঞ্চলগত বিভাগ সমাধা করল সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলো।

উনিশ শতকের অষ্টম দশকে ইউরোপীয় দেশগুলির দখল-করা ঔপনিবেশিক রাজ্য ছিল সাগরপারের রাজ্যক্ষেত্রগুলোর একটা অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রাংশ, কিন্তু ঐ শতকের শেষ দুই দশকে পৃথিবীর মানচিত্রের মূলগত পরিবর্তন ঘটে গিয়েছিল। ১৮৭৬ থেকে ১৯১৪ সালের মধ্যে যাদের বলা হয় বৃহৎ শক্তি তারা গ্রাস করেছিল প্রায় ২,৫০,০০,০০০ বর্গকিলোমিটার রাজ্যক্ষেত্র — অর্থাৎ, গোটা ইউরোপের দ্বিগুণ পরিমাণ অঞ্চল।

প্রায় গোটা আফ্রিকা, এশিয়ার বেশ একটা অংশ এবং লাতিন আমেরিকার একটা বড়রকমের অংশকে উপনিবেশ আর আধা-উপনিবেশ করে নিল মুষ্টিমেয় সাম্রাজ্যবাদী দেশ — বৃটেন, ফ্রান্স, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানি আর জাপান — এবং অপেক্ষাকৃত ছোট কয়েকটা লুটেরা — বেলজিয়ম, হল্যান্ড, পর্তুগাল আর স্পেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়া নাগাদ পৃথিবীর মোট ১৭০ কোটি মানুষের মধ্যে প্রায় ৬০ কোটি ছিল উপনিবেশগুলিতে, আর উপনিবেশভোগী দেশগুলিতে ছিল ৩৫ কোটি। পৃথিবীর ভাগাভাগি সমাধা হয়ে গিয়েছিল; অসংযুক্ত ভূখন্ড আর ছিল না। তখন ছিল পৃথিবীকে নতুন করে ভাগাভাগি করার ব্যাপার।

আগেই ভাগাভাগি করে নেওয়া পৃথিবীকে নতুন করে ভাগাভাগি করার জন্যে সাম্রাজ্যবাদীদের সংগ্রাম — পুঁজিতন্ত্রের একচেটিয়া পর্বের এই বিশেষক উপাদানটা শেষ পর্যন্ত পৃথিবীজোড়া আধিপত্যের জন্যে সংগ্রামে পরিণত হয়। এর ফলে বাধে বিভিন্ন রক্তক্ষয়ী, ধ্বংসকর যুদ্ধ। ১৯১৪—১৯১৮ সালের প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলেছিল পৃথিবীকে নতুন করে ভাগাভাগি করে নেবার জন্যে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক একচেটিয়ার আগ্রাসী শক্তিগুলো পয়দা করল ফাশিবাদ — যেটা হল ফিনান্স পুঁজির সবচেয়ে প্রতিক্রিয়াপন্থী এবং আগ্রাসী মহলগুলোর নগ্ন সন্ত্রাসবাদী একনায়কত্ব। পৃথিবীজোড়া আধিপত্যের জন্যে সচেষ্ট ছিল নাৎসী জার্মানি, তাকে চূড়ান্তভাবে পরাস্ত-পর্যুদস্ত করায় একটা নিষ্পত্তিমূলক ভূমিকায় ছিল সোভিয়েত ইউনিয়ন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে সাম্রাজ্যবাদ মানবজাতির বৃহত্তর অংশটার উপর আধিপত্য হারাল চিরতরে। সোভিয়েত

ইউনিয়ন, সমগ্র সমাজতান্ত্রিক বিশ্বগোষ্ঠী এবং শান্তি, জাতীয় স্বাধীনতা আর গণতন্ত্রের সমস্ত শক্তির দৃঢ়সংকল্প প্রতিরোধের ফলে ইতিহাসের চাকাটাকে উলটো দিকে ঘুরিয়ে দেবার জন্যে সাম্রাজ্যবাদের অপচেষ্টা ব্যর্থ হল। পৃথিবীজোড়া ক্ষেত্রে বিভিন্ন শক্তির পারস্পরিক অনুপাত সমাজতন্ত্রের অনুকূলে পরিবর্তিত হবার ফলে এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ২৪ম কংগ্রেসে গৃহীত শান্তির কর্মসূচি অনুসারে সোভিয়েত ইউনিয়ন যে সক্রিয় এবং লক্ষ্যানুসারী কর্মনীতি নিয়ে চলে আসছে তার কল্যাণে গত কয়েক বছরে 'ঠান্ডা যুদ্ধ' থেকে আন্তর্জাতিক উত্তেজনাপ্রশমনের দিকে মোড় ঘুরেছে। পরস্পরের সুবিধাজনক আর্থনীতিক এবং বৈজ্ঞানিক আর প্রযুক্তিগত সহযোগিতার বাস্তবতাসম্মত কর্মনীতি সমানে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে চলেছে। বিভিন্ন সমাজব্যবস্থাসম্পন্ন রাষ্ট্রগুলির মধ্যে স্বাভাবিক সম্পর্ক হিসেবে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নীতি ব্যাপক স্বীকৃতি পাচ্ছে।

ঔপনিবেশিক ব্যবস্থা

সাম্রাজ্যবাদের ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে লেনিন বলেছিলেন, এ হল পৃথিবীর প্রায় ১০০ কোটি মানুষের উপর বৃহৎ শক্তিগুলির একটা ছোট্ট জোটের লুণ্ঠন। উৎপীড়নকারী দেশগুলির জনসংখ্যার চেয়ে বহুগুণ বেশি মানুষের দেশগুলিতে একচ্ছত্রাধিপতি হল উপনিবেশভোগী শক্তিগুলো। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ঠিক আগে বৃটেনের জনসংখ্যা ছিল ৪ কোটি ৭০ লক্ষ, আর তার উপনিবেশগুলিতে জনসংখ্যা ছিল ৪৮ কোটি অর্থাৎ ১০ গুণ বেশি; ফ্রান্সের জনসংখ্যা ছিল ৪ কোটি ২ লক্ষ, তার উপনিবেশগুলিতে থাকত ৭ কোটি মানুষ; জনসংখ্যা ছিল হল্যান্ডে ৯০ লক্ষ

আর তার উপনিবেশগুলিতে ৭ কোটি; ৮০ লক্ষ মানুষের দেশে বেলজিয়মের উপনিবেশগুলির মোট জনসংখ্যা ছিল প্রায় ১ কোটি ৪০ লক্ষ।

প্রাচীন সংস্কৃতির বহু জাতিকে উপনিবেশবাদ আর্থনীতিক অনগ্রসরতা এবং চূড়ান্ত গরিবির জীবনে বিড়ম্বিত করেছিল। ভারত বৃটিশ আধিপত্যে অবসন্ন হয়ে পড়ে ছিল দুই শতাব্দী ধরে। আধা-ঔপনিবেশিক আধিপত্যের সুদীর্ঘ অভিশপ্ত জীবন কেটেছিল চীনের। আরব প্রাচ্য এবং আফ্রিকা, লাতিন আমেরিকা আর দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার জাতিগুলির উপর পাশবিক ঔপনিবেশিক শোষণের জোয়াল দীর্ঘকাল যাবত তাদের বিকাশ রুদ্ধ করে রেখেছিল। প্রাকৃতিক সম্পদ এবং পরিশ্রমী মানুষের দেশগুলিতে উপনিবেশবাদ এনেছিল ভুখা।

একচেটিয়া পুঁজির সমগ্র অর্থনীতির একটা প্রধান অবলম্বন হয়ে উঠেছিল ঔপনিবেশিক শোষণ। উপনিবেশগুলিকে সাম্রাজ্যবাদ এমন কূপে পরিণত করেছিল, যার থেকে তারা কর এবং বিনিয়োজিত পুঁজি আর পরিবহণ, বিমা এবং আর্থিক লেনদেন থেকে পাওয়া মুনাফা হিসেবে তুলে নিত বিপুল পরিমাণ সম্পদ। সবচেয়ে লাভজনক ব্যবহারক বাজার, কাঁচামালের যোগানদার এবং পুঁজি-বিনিয়োগের ক্ষেত্র হয়ে উঠেছিল উপনিবেশ আর আধা-উপনিবেশগুলি।

একচেটিয়া কারবারগুলোর জন্যে ব্যবহারক বাজার এবং কাঁচামালের যোগানদার হিসেবে উপনিবেশগুলির গুরুত্ব বিশেষভাবে বেড়ে গেল অসমতুল বিনিময়ের আওতায়। একচেটিয়াগুলো নিয়মিতভাবে নির্ভরশীল দেশগুলোর কাছে পণ্য বিক্রি করে অত্যন্ত চড়া দামে, আর ঐসব দেশের জিনিস কেনে অত্যন্ত কম দামে — এটা হল অসমতুল বিনিময়। ঔপনিবেশিক বাণিজ্য (কাঁচামাল কেনা এবং শিল্পজাত পণ্য

বিক্রি করা) চালাবার একচেটিয়া কারবারগুলো শতকরা কয়েক-শ' হারে বিপুল মুনাফা রাশীকৃত ক'রে গোটা-গোটা দেশের নিয়ন্ত্রক হয়ে উঠল, কোটি-কোটি মানুষের জীবন আর সম্পত্তি হল তাদের যথেচ্ছ ব্যবহারের জিনিস।

উপনিবেশগুলি হল পুঁজি-বিনিয়োগের একটা বিশেষ নির্ভরযোগ্য ক্ষেত্র। উপনিবেশগুলিতে একচেটিয়া কারবারগুলোর রাজনীতিক আর আর্থনীতিক কর্তৃত্বের ফলে নিয়োজিত মূলধনে চড়া হারে লাভ নিশ্চিত হল। ঔপনিবেশিক শাসনের ফলে নিশ্চিত হল পুঁজি বিনিয়োগে এবং শস্তা শ্রমশক্তি আর কাঁচামালে পূর্ণাঙ্গ আর অবিভক্ত একচেটিয়া। উপনিবেশভোগী দেশগুলো উপনিবেশ আর নির্ভরশীল দেশগুলি থেকে আমদানি করতে থাকল লক্ষ-লক্ষ শ্রমিক, তারা তুচ্ছ পরিমাণ মজুরি পেয়ে খাটত হাড়ভাঙা খাটুনি।

উপনিবেশ আর নির্ভরশীল দেশগুলিকে সাম্রাজ্যবাদ উপনিবেশভোগী দেশগুলির ভূমি আর কাঁচামালের উপাঙ্গে পরিণত করল। উৎপাদনের যেসব শাখা কাঁচামাল আর খাদ্যসামগ্রীর যোগান নিশ্চিত করে, কেবল সেগুলির উন্নয়নই কর্তৃত্বশালী একচেটিয়াগুলো বরদাস্ত করত। ফলে, উপনিবেশ আর আধা-উপনিবেশগুলির অর্থনীতি হয়ে পড়ল একপেশে এবং অধীন। বহু নির্ভরশীল দেশেই একটা কিংবা দুটো উৎপাদের জন্যে বিশেষীকরণ হল, সেইসব জিনিসই রপ্তানি হত — যেমন, তুলো, তৈল, কফি, রবার, চিনি, ইত্যাদি। কৃষির একতরফা বিকাশের (এক-ফসলী ব্যবস্থা) দরুন গোটা-গোটা দেশ কাঁচামালের ক্রেতা একচেটিয়া কারবারগুলোর উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ল।

অতি-মুনাফার সন্ধানে বেরিয়ে একচেটিয়া কারবারিরা উপনিবেশ আর আধা-উপনিবেশগুলিতে নির্মাণ করতে বাধ্য

হল রেলপথ, বিভিন্ন মণিক এবং অন্যান্য কাঁচামালের আহরণ এবং প্রাথমিক আকারণের শিল্পপ্রতিষ্ঠান। কিন্তু, তারই সঙ্গে সঙ্গে, সাম্রাজ্যবাদী শাসন উপনিবেশগুলিতে উৎপাদন-বলগুলোর বিকাশ স্তব্ধ করে রাখল। স্বাধীন আর্থনীতিক উন্নয়নের জন্যে আবশ্যক অবস্থা থেকে উৎপীড়িত জাতিগুলিকে বঞ্চিত করে রাখল উপনিবেশবাদ।

কতকগুলি উপনিবেশ আর নির্ভরশীল দেশে সাম্রাজ্যবাদীরা স্থাপন করল বাগিচা অর্থনীতি। বাগিচাগুলো হল তুলো, রবার, পাট, সিজাল, কফি এবং অন্যান্য উদ্ভিজ্জ কাঁচামাল উৎপাদনের বড়-বড় কৃষিপ্রতিষ্ঠান, সেগুলো পরিচালিত হয় সর্বতোভাবে নিপীড়িত স্থানীয় বাসিন্দাদের দাস-শ্রম কিংবা আধা-দাস-শ্রমের ভিত্তিতে।

বিভিন্ন শিল্পপ্রতিষ্ঠানে আর বাগিচায় প্রযুক্তিগত মান নিচু হবার কারণ হল শস্তা শ্রমশক্তি, ঔপনিবেশিক দাসদের প্রায় মুফত শ্রম। আর্থনীতিক উন্নয়নের নিচু মান এবং চড়া মাত্রায় শোষণের ফলে উপনিবেশগুলিতে মানুষের জীবন হল গরিবি আর ভুখায় জর্জরিত, তারা দাঁড়াল একরকম লোপ পেয়ে যাবার কিনারে।

জাতিসংঘের হিসাব অনুসারে, পৃথিবীর দুই-তৃতীয়াংশ মানুষের মাথাপিছু আয় বড়জোর ৪১ ডলার, অর্থাৎ, উপনিবেশভোগী দেশগুলিতে ঐ আয়ের দশ কিংবা পনর ভাগের একভাগ। চরম দারিদ্র-দুর্দশাগ্রস্ত কোটি-কোটি মানুষ চিকিৎসার সুযোগ থেকে বঞ্চিত। ডাক্তার আছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রতি ৮০০ জনে একজন, ফ্রান্সে ৯০০ জনে একজন, জার্মান ফেডারেল প্রজাতন্ত্রে ৭০০ জনে একজন, কিন্তু বহু প্রাক্তন উপনিবেশে ডাক্তার আছে জনসংখ্যার প্রতি ৪০,০০০—৭০,০০০ জনে একজন।

ইতিহাসে সাম্রাজ্যবাদের স্থান। রাষ্ট্রীয়-একচেটিয়া পুঁজিতন্ত্র। পুঁজিতন্ত্রের সাধারণ সংকট

১। সাম্রাজ্যবাদ — পুঁজিতন্ত্রের একটা বিশেষ পর্ব

পুঁজিতন্ত্রের একটা বিশেষ পর্ব সাম্রাজ্যবাদের তিনটে বিশেষক উপাদান আছে: এক, সাম্রাজ্যবাদ হল একচেটিয়া পুঁজিতন্ত্র; দুই, সাম্রাজ্যবাদ হল পরজীবীয় বা ক্ষয়িষ্ণু পুঁজিতন্ত্র; আর তিন, এটা মরণোন্মুখ পুঁজিতন্ত্র। সাম্রাজ্যবাদ হল সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রাক্কাল। সাধারণভাবে পুঁজিতন্ত্রের দিক থেকে এই হল ইতিহাসে সাম্রাজ্যবাদের স্থান।

একচেটিয়া পুঁজিতন্ত্র

একচেটিয়ার কর্তৃত্বের ফলে উৎপাদন সামাজিকীকরণের বিপুল বৃদ্ধি ঘটে। বিভিন্ন একচেটিয়া শিল্পপ্রতিষ্ঠানে কাজ করে বহু হাজার-হাজার মানুষ। শত-শত শিল্পপ্রতিষ্ঠানকে একজোট করে একচেটিয়া কারবারগুলো। তারা নিজেদের নিয়ন্ত্রণাধীন করে বিভিন্ন ব্যবহারক বাজার, কাঁচামালের উৎস আর উদ্ভাবনা। সমাজের প্রায় সমস্ত অর্থ-সম্পদ নিয়ন্ত্রণ করে বড়-বড় ব্যাঙ্কগুলো। কিন্তু, উৎপাদন সামাজিকীকরণে বিরাট

অগ্রগতি মুষ্টিমেয় একচেটিয়াপতিদের সংকীর্ণ স্বার্থই পরিপুষ্ট করে। উৎপাদন-বলগুলোর বিপুল বিকাশ থেকে জনগণ কোন লক্ষণীয় উপকার পায় না। অধিকন্তু তাদের উপর শোষণের মাত্রা ওঠে চূড়ান্ত পর্যায়ে।

এইভাবে, একচেটিয়া পুঁজিতন্ত্র হিসেবে সাম্রাজ্যবাদ হল পুঁজিতন্ত্রের বুনিয়াদী দ্বন্দ্বগুলোর বিকাশের ক্ষেত্রে একটা নতুন পর্ব — ঐ দ্বন্দ্বটা হল উৎপাদনের সামাজিক প্রকৃতি এবং উৎপাদনের ফলগুলো ভোগ-ব্যবহারের ব্যক্তিগত পুঁজিতান্ত্রিক রূপের মধ্যেকার দ্বন্দ্ব।

রাষ্ট্রীয়-একচেটিয়া পুঁজিতন্ত্র

পুঁজিতন্ত্রের বুনিয়াদী দ্বন্দ্বটার প্রকোপবৃদ্ধির ফলে অর্থনীতিতে বুর্জোয়া রাষ্ট্রের সরাসরি হস্তক্ষেপ ঘটে আর্থ চক্রতন্ত্রের স্বার্থে: একচেটিয়া পুঁজিতন্ত্র হয়ে ওঠে রাষ্ট্রীয়-একচেটিয়া পুঁজিতন্ত্র।

যুদ্ধ কিংবা সংকটের মতো ওলটপালটের সময়ে, একচেটিয়া কারবারগুলো আপনা-আপনি যেসব বাধাবিঘ্নের সঙ্গে এঁটে উঠতে অপারগ হয়, সেগুলোকে কাটিয়ে উঠতে সরকার সাহায্য করে। যুদ্ধের সময়ে, যেসব শিল্পপ্রতিষ্ঠান গড়াকে একচেটিয়াগুলো যথেষ্ট লাভজনক মনে করে না, সেগুলোকে গড়ে সরকার এবং তারপরে একচেটিয়াগুলোর কাছে তা বিক্রি করে দেয় একরকম জলের দামে। সংকটের সময়ে, রাষ্ট্র রাজকোষ থেকে ঋণ এবং সরাসরি আর্থিক সাহায্য দিয়ে একচেটিয়া কারবারগুলোকে দেউলিয়া হয়ে যাওয়া থেকে রক্ষা করে।

বুর্জোয়া রাষ্ট্র পৃথক-পৃথক শিল্পপ্রতিষ্ঠানের, এমনকি উৎপাদনের গোটা-গোটা শাখারই নিয়ন্ত্রণের ভার নেয়। কোন-

কোন ক্ষেত্রে রাষ্ট্র একচেটিয়াগুলোর কাছ থেকে বাতিল-হয়ে-যাওয়া, অলাভজনক শিল্পপ্রতিষ্ঠান কিনে নিয়ে সেগুলোকে পুনঃসজ্জিত করতে বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করে। ব্যক্তিগত একচেটিয়াগুলোর পাশাপাশি রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া কারবার দেখা দেয় এর ফলে। রাষ্ট্রীয় একচেটিয়াগুলোর ক্রিয়াকলাপ চালানো হয় ব্যক্তিগত একচেটিয়াগুলোর স্বার্থে। রাষ্ট্রীয় একচেটিয়াগুলো ব্যক্তিগত একচেটিয়াগুলোকে কম দামে বিদ্যুৎশক্তি, জ্বালানি আর ধাতুর যোগান দেয়, রাষ্ট্রের পরিচালিত রেলওয়েগুলো ব্যক্তিগত একচেটিয়াগুলোর মাল বয় কম মাসুলে। লোকসান মেটানো হয় মেহনতী জনগণের উপর কর ধার্য ক'রে।

একচেটিয়াগুলোর স্বার্থ পরিপালন করতে গিয়ে বুর্জোয়া রাষ্ট্র কাঁচামাল আর জ্বালানি বণ্টন ক'রে, শ্রমশক্তির যোগান দিয়ে এবং উৎপাদনে অর্থ আর ক্রেডিট যুগিয়ে অর্থনীতি নিয়মনের বিভিন্ন ব্যবস্থা অবলম্বন করে। সবচেয়ে বড় একচেটিয়াগুলো রাষ্ট্রের কাছ থেকে খুবই লাভজনক সব ফরমাশ পায় — বিশেষত অস্ত্রশস্ত্রের জন্যে ফরমাশ।

একচেটিয়াগুলো আর রাষ্ট্রের শক্তিকে একই বন্দোবস্তের মধ্যে সংযুক্ত করে রাষ্ট্রীয়-একচেটিয়া পুঁজিতন্ত্র — তার উদ্দেশ্য হল: একচেটিয়াগুলোকে সমৃদ্ধিশালী করা, শ্রমিক আন্দোলন আর জাতীয়-মুক্তি সংগ্রাম দমন করা, পুঁজিতান্ত্রিক ব্যবস্থাটাকে রক্ষা করা এবং আগ্রাসী যুদ্ধ বাধানো।

একচেটিয়াগুলোর সপক্ষে দাঁড়িয়ে বুর্জোয়া মতাদর্শবিদেরা বলতে চায়, অর্থনীতিতে বুর্জোয়া রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপের ফলে পুঁজিতন্ত্রের দ্বন্দ্বগুলোর মীমাংসা করা সম্ভব হয়। তারা বলে, পুঁজিতন্ত্রের প্রকৃতিটা বদলে গেছে — পুঁজিতন্ত্র হয়ে উঠেছে 'পরিকল্পিত', 'নিয়ন্ত্রিত', 'জনগণের' পুঁজিতন্ত্র।

প্রকৃত অবস্থা থেকে এইসব উক্তির তফাত বিস্তর। রাষ্ট্রীয়-একচেটিয়া পুঁজিতন্ত্র বুর্জোয়া ব্যবস্থার প্রকৃতিটাকে বদলায় না। আগেরই মতো শ্রমিক শ্রেণী এবং বিস্তৃত মেহনতী জনগণকে শোষণ ক'রে লাভ রাশীকৃত করাই পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদনের উদ্দেশ্য। শ্রম আর পুঁজির মধ্যে, জাতির সংখ্যাগুরু অংশ আর একচেটিয়াগুলোর মধ্যে ব্যবধান বেড়েই চলে। প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয় আরও তীব্র, উৎপাদনের অরাজকতা বাড়ে। এর ফলে অনিবার্যভাবেই সমগ্র পুঁজিতান্ত্রিক ব্যবস্থার সাধারণ বিশৃঙ্খলা আর এলোমেলো অবস্থাটা আরও সঙিন হয়ে ওঠে।

রাষ্ট্রীয়-একচেটিয়া পুঁজিতন্ত্র হল পুঁজিতন্ত্রের আওতায় উৎপাদন সামাজিকীকরণের সর্বোচ্চ পর্ব, তখন উৎপাদনের উপকরণ থেকে যায় আগেরই মতো ব্যক্তি-মালিকানাধীন। এই অর্থে, লেনিনের বিবেচনায়, রাষ্ট্রীয়-একচেটিয়া পুঁজিতন্ত্র হল সমাজতন্ত্রের পূর্ণাঙ্গ বৈষয়িক প্রস্তুতি, সমাজতন্ত্রের প্রাক্কাল।

তবে, মার্কসবাদ-লেনিনবাদ দেখিয়ে দেয় যে, বৈষয়িক পূর্বশর্তগুলো আপনাতেই পুঁজিতন্ত্র থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের জন্যে যথেষ্ট নয়। সমাজতন্ত্রের বৈষয়িক পূর্বশর্তগুলো দেখিয়ে দেয় যে, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ত্বরিত ঘটানো যায় এবং ঘটানো দরকার। একচেটিয়াগুলোকে লাগাম ক'ষে, তাদের ক্ষমতা চূর্ণ ক'রে সমাজতন্ত্র কায়েম করার জন্যে সংগ্রামে জনগণের রাজনীতিক চেতনা আর সংহতি অমন অবস্থায় নিষ্পত্তিমূলক।

পৃথক-পৃথক শিল্পপ্রতিষ্ঠান, এমনকি অর্থনীতির গোটা-গোটা শাখাই বুর্জোয়া রাষ্ট্রের হাতে যাওয়া — বুর্জোয়া রাষ্ট্রীয়করণ — সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা নয়, কেননা, সামাজিক

পরিসরে উৎপাদনের উপকরণ থেকে যায় পংজিপতিদেরই হাতে। ব্যক্তিগত আর রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন উভয় ক্ষেত্রেই শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলোতে শ্রমের উপর পংজির শোষণ চলতেই থাকে। কিন্তু, কোন-কোন অবস্থায়, একচেটিয়াগুলোর স্বেচ্ছাচারী কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে সংগ্রামে শ্রমিক শ্রেণী বুর্জোয়া রাষ্ট্রীয়করণকেও একখানা অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করতে পারে। এই কারণে, অনেক সময়েই বুর্জোয়ারা রাষ্ট্রীয়করণের বিরোধিতা করে, আর ব্যবস্থাটাকে সমর্থন করে শ্রমিক শ্রেণী, তার পার্টি এবং ট্রেড ইউনিয়নগুলি।

কল-কারখানা আর ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রীয়করণের দাবি তোলার সঙ্গে সঙ্গে, রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানগুলোর ব্যবস্থাপন যাতে জনগণের সাচ্চা প্রতিনিধিদের কাছে হস্তান্তরিত করা যায় — সেজন্যে শ্রমিক শ্রেণী চেষ্টা করে। শোষক একচেটিয়াগুলোকে বিচ্ছিন্ন করার জন্যে এবং একচেটিয়ার কর্তৃত্ব উচ্ছেদ করার সংগ্রামে মেহনতী জনগণের বিস্তৃততম অংশকে সংহত করতে শ্রমিক শ্রেণী সচেষ্ট হয় এইভাবে।

পংজিতন্ত্রের পরজীবীয় প্রকৃতি এবং ক্ষয়

সাম্রাজ্যবাদ হল পরজীবীয় বা ক্ষয়িষ্ণু পংজিতন্ত্র।

একচেটিয়ার কর্তৃত্ব থেকে ঘটে বদ্ধতা আর ক্ষয়, এটা অনিবার্য। একচেটিয়াগুলো তাদের উৎপাদের দাম খুশিমতো ধার্য করতে পারে এবং সেটাকে কৃত্রিমভাবে চড়া মাত্রায় বজায় রাখতে পারে বলে তারা কখনও-কখনও প্রযুক্তিগত নবপ্রবর্তনে ভয় পায়, নবপ্রবর্তনের ফলে তাদের একচেটিয়া অবস্থান ক্ষুণ্ণ হতে পারে, কিংবা উৎপাদনে বিনিয়োজিত বিপুল পরিমাণ অর্থ অবচিত হতে পারে। কোন-কোন ক্ষেত্রে, কোন-কোন দেশে

এবং শিল্পের পৃথক-পৃথক শাখায় এই প্রবণতাটা কিছুকালের জন্যে প্রাধান্যলাভ করতে পারে।

তবু, লেনিন হুঁশিয়ারি জানিয়েছেন, প্রযুক্তিগত বদ্ধতা আর ক্ষয়ের দিকে প্রবণতার ফলে পুঁজিতন্ত্রের দ্রুত বৃদ্ধির সম্ভাবনা রহিত হয়ে যায়, এমনটা মনে করা ভুল। মোটের উপর পুঁজিতন্ত্র আগের চেয়ে ঢের বেশি দ্রুতই বিকশিত হয় — যদিও, বৃদ্ধিটা অত্যন্ত অসম, আর পুঁজিতে সমৃদ্ধ দেশগুলিতে তার সঙ্গে চলে বদ্ধতা।

আধুনিক বৈজ্ঞানিক আর প্রযুক্তিগত বিপ্লবের অবস্থায় একচেটিয়াগুলোর মধ্যে প্রতিযোগিতার লড়াইয়ে প্রযুক্তিগত উৎকর্ষগুলো শক্তিশালী অস্ত্র হিসেবে ব্যবহৃত হয়, তার ফলে পুঁজিতন্ত্রের দ্বন্দ্বগুলো আরও বেশি প্রকোপিত হয়।

পুঁজিতন্ত্রের ক্ষয়টা পরজীবীয়তার প্রসারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট। বুর্জোয়াদের বেশির ভাগটা উৎপাদনপ্রক্রিয়া থেকে একেবারেই পৃথক হয়ে গেছে, প্রতিষ্ঠানগুলোর ব্যবস্থাপন গেছে বেতনভুক্ পরিচালকদের হাতে।

মানুষের শ্রম আর তার ফলের অনুৎপাদী ভোগ-ব্যবহার বেড়েছে, তেমনি, বিত্ত-সম্পদশালী শ্রেণীগুলোর ব্যক্তিগত সেবাকার্যে নিয়োজিত শাখা আর মানুষের সংখ্যা বেড়েছে। অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে চলে সামরিকীকরণ পুঁজিতান্ত্রিক দেশগুলিতে মানুষের আয়ের ক্রমাগত বৃহত্তর অংশটাকে খেয়ে নিচ্ছে। সমস্ত সাম্রাজ্যবাদী দেশই চালিয়েছে অস্ত্রসজ্জার প্রতিযোগিতা, আগ্রাসী যুদ্ধপ্রস্তুতির জন্যে ব্যয় করা হচ্ছে বিপুল পরিমাণ অর্থ।

সমাজজীবনের সর্বক্ষেত্রে রাসছাড়া প্রতিক্রিয়াশীলতা পুঁজিতন্ত্রের ক্ষয় আর পরজীবীয় প্রকৃতির একটা লক্ষণীয়

অভিব্যক্তি। অবাধ প্রতিযোগিতা বুর্জোয়া গণতন্ত্রের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ। সর্বত্র রাজনীতিক প্রতিক্রিয়াশীলতা একচেটিয়ার সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। ফিনান্স পুঁজি চায় অখণ্ড অবাধ আধিপত্য।

বহু পুরুষ-পর্যায়ের দৃঢ়সংগ্রামে অর্জিত সীমাবদ্ধ বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক অধিকার আর স্বাধীনতাগুলি থেকেও জনগণকে বঞ্চিত করতে বুর্জোয়ারা বদ্ধপরিকর। নিজেদের শাসনটাকে ঢাকার জন্যে বুর্জোয়ারা মুক্তি আর সমানতার বুলি আওড়ায়, আর তারই সঙ্গে সঙ্গে নিজেদেরই চালু করা আইনকানুন পদদলিত করে। একচেটিয়া পুঁজির রাষ্ট্র ভোটাধিকার সীমাবদ্ধ করে, নির্বাচন জাল করে, শ্রমিক সংগঠনগুলির উপর নির্যাতন চালায়। শ্রমিক শ্রেণীর আন্দোলনের কর্মী এবং ধর্মঘটের নেতাদের বিরুদ্ধে হিংস্র প্রতিশোধ নেবার জন্যে ভাড়াটে গুণ্ডাদল লাগায় বড়-বড় একচেটিয়া কারখানাগুলো।

তবে, বুর্জোয়াদের প্রতিক্রিয়াপন্থী কর্মনীতি প্রচণ্ডতর হবার সঙ্গে সঙ্গে, শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বে জনগণের প্রতিরোধ দৃঢ়তর হয়ে ওঠে। লেনিন দেখিয়ে দিয়েছেন, তার ফলে গণতন্ত্র-প্রত্যাখ্যান-করা সাম্রাজ্যবাদ, এবং গণতন্ত্রের জন্যে সচেষ্ট জনগণের মধ্যে বৈরিতা গভীরতর হয়।

মরণোন্মুখ পুঁজিতন্ত্র

সাম্রাজ্যবাদ হল মরণোন্মুখ পুঁজিতন্ত্র। এটা পুঁজিতন্ত্রের চূড়ান্ত পর্ব, এই পর্বে আভ্যন্তরিক দ্বন্দ্বগুলোর চাপে বুর্জোয়া ব্যবস্থা ভেঙে পড়ে।

একচেটিয়ার কর্তৃত্বের দরুন জনগণের ব্যাপকতম অংশে আসে যৎপরোনাস্তি নিরাপত্তাহীনতা। শোষণের অভূতপূর্ব

বৃদ্ধির ফলে মেহনতী জনগণের বিক্ষোভ প্রবলতর হয়, পুঁজিতান্ত্রিক দাসত্ব খতম করার জন্যে তাদের সংকল্প মজবুত হয়ে ওঠে। উপনিবেশগুলিতে সাম্রাজ্যবাদী একচেটিয়াগুলোর নির্মম শোষণে জর্জরিত মানুষ বৈদেশিক গোলামির বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে যায়, তারা লড়াইয়ে নামে মুক্তি আর স্বাধীনতার জন্যে। তারই সঙ্গে সঙ্গে, ব্যবহারক বাজার, লাভজনক পুঁজি বিনিয়োগের ক্ষেত্র, কাঁচামাল এবং পৃথিবীজোড়া আধিপত্যের জন্যে সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির সংগ্রাম বিশেষভাবে কদর্য হয়ে ওঠে।

মরণোন্মুখ পুঁজিতন্ত্র হিসেবে সাম্রাজ্যবাদের একটা বিশেষক উপাদান হল এই যে, বুর্জোয়া সমাজের উৎপাদন-বল এবং, অন্যদিকে, উৎপাদন-সম্পর্কের মধ্যে দ্বন্দ্বের অভূতপূর্ব প্রকোপন ঘটে। সমাজের উৎপাদন-বলকে দীর্ঘকাল যাবত শৃঙ্খলিত করে রেখেছে পুঁজিতন্ত্রের উৎপাদন-সম্পর্ক। সাম্রাজ্যবাদী যুগে সমস্ত বিরোধ আর সংঘাতের কারণ এই দ্বন্দ্বটাই।

আগে বলা হয়েছে, সাম্রাজ্যবাদ হল মরণোন্মুখ পুঁজিতন্ত্র, কিন্তু, তাই বলে সেটার স্বেচ্ছামৃত্যু ঘটে, এমনটা নয়। পুঁজিতন্ত্রকে হটিয়ে আসবে সমাজতন্ত্র, এটা ইতিহাসে পূর্বনির্দিষ্ট, কিন্তু এটা ঘটে প্রলেতারিয়েতের অটল-অধ্যবসায়ী সংগ্রামের ফলে, — প্রলেতারিয়েত নিজের চারপাশে সমবেত করে মেহনতী জনগণের বিস্তৃত অংশকে।

মরণোন্মুখ পুঁজিতন্ত্র বলে সাম্রাজ্যবাদের সংজ্ঞা দিয়ে লেনিন দেখিয়েছিলেন, সাম্রাজ্যবাদ হল প্রলেতারিয়েতের সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রাক্কাল। বুর্জোয়া ব্যবস্থার ইতিহাসগত প্রগতিশীল ভূমিকাটা ফুরিয়ে গেছে, সেটা হয়ে দাঁড়িয়েছে ইতিহাসের আরও অগ্রগতির পথে একটা বাধা।

শ্রমিক শ্রেণী যে-অবস্থার মধ্যে সংগ্রাম চালায় সমাজতন্ত্রের জন্যে, সেটা পুঁজিতন্ত্রের একচেটিয়া পর্বে অনেকটা বদলে যায়। সাম্রাজ্যবাদী কালপর্যায়ে পুঁজিতান্ত্রিক দেশগুলিতে অসম বিকাশের নিয়মের ক্রিয়ার একটা ফল হল এই পরিবর্তন।

উৎপাদনের উপকরণে ব্যক্তিগত মালিকানা এবং উৎপাদনে অরাজকতার দরুন পৃথক-পৃথক শিল্পপ্রতিষ্ঠানে, শিল্পের শাখায়, এমনকি বিভিন্ন দেশের সম-বিকাশ ঘটতে পারে না। বিকাশের ধারায় কোন-কোন দেশ অন্যান্য দেশকে পিছনে ফেলে যায়।

পৃথক-পৃথক দেশের অসম-বিকাশ সাম্রাজ্যবাদের কালপর্যায়ে প্রবলভাবে তীব্রতর হয়ে ওঠে। প্রযুক্তিবিদ্যার অভূতপূর্ব অগ্রগতির ফলে নবীন দেশগুলির দ্রুত লাফিয়ে গিয়ে তাদের পুরন প্রতিদ্বন্দ্বীদের নাগাল ধরা এবং তাদের ছাড়িয়ে যাওয়াও সম্ভব হতে পারে। তারই সঙ্গে সঙ্গে, পরজীবিতা, ক্ষয় আর প্রযুক্তিগত বদ্ধতার দিকে ঝোঁক একচেটিয়ার কর্তৃত্বের একটা বৈশিষ্ট্য। কোন-কোন দেশের দ্রুত বিকাশ এবং অন্য কোন-কোন দেশের শ্লথ বৃদ্ধির কারণটা রয়েছে সেখানে। অসম-বিকাশ ঘটাবার আরও একটা উপাদান হল পুঁজি রপ্তানি।

বিভিন্ন সাম্রাজ্যবাদী জোট আর শক্তির শাসিত প্রভাবাধীন ক্ষেত্রগুলিতে পৃথিবীর বিভাগটা সমাধা হয়ে যায়। 'খালি' অঞ্চল আর থাকে না। লেনিন বলেছিলেন, পুঁজিপতিরা পৃথিবীটাকে ভাগাভাগি করে নেয় 'পুঁজি অনুসারে', 'ক্ষমতা অনুসারে'। তবে, আর্থনীতিক আর রাজনীতিক বিকাশের মাত্রা অনুসারে বিভিন্ন দেশের ক্ষমতা বদলায়।

বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে ক্ষমতা-সম্পর্কের পরিবর্তিত অবস্থাটা দাঁড়িয়ে যায় উপনিবেশ আর প্রভাবাধীন অঞ্চলের পুরন বণ্টনব্যবস্থার বিরুদ্ধে। যতকাল সারা পৃথিবী জুড়ে সাম্রাজ্যবাদের একচ্ছত্রাধিপত্য ছিল তখন, আগেই ভাগাভাগি করে-নেওয়া পৃথিবীকে নতুন করে ভাগাভাগি করার সংগ্রামের একমাত্র পরিণতি ছিল সাম্রাজ্যবাদী জোটগুলোর মধ্যে রক্তক্ষয়ী বিধ্বংসী যুদ্ধ।

সাম্রাজ্যবাদী যুগে পুঁজিতান্ত্রিক দেশগুলির অসম আর্থনীতিক বিকাশের সঙ্গে এই দেশগুলির অসম রাজনীতিক বিকাশ ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট। শ্রেণীগত শক্তিগুলির মধ্যে ক্ষমতার অনুপাত এবং শ্রমিক শ্রেণীর সংগ্রামের জন্যে অবস্থা সমস্ত দেশে মোটেই এক নয়; প্রলেতারিয়েতের রাজনীতিক চেতনা আর বৈপ্লবিক সংকল্পের দৃঢ়তার বিকাশ এবং কৃষক জনগণ আর জনসাধারণের অন্যান্য মেহনতী অংশের সঙ্গে প্রলেতারিয়েতের সম্পর্কের বেলায়ও ঐ কথা প্রযোজ্য।

সাম্রাজ্যবাদী কালপর্যায়ে পুঁজিতান্ত্রিক দেশগুলির আর্থনীতিক আর রাজনীতিক বিকাশের অসমতার ফলে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের উপযোগী আর্থনীতিক আর রাজনীতিক অবস্থার পরিপক্কতার অসমতা ঘটে।

প্রথমে একটামাত্র দেশে সমাজতন্ত্রের বিজয়ের সম্ভাবনা

পৃথিবীতে সাম্রাজ্যবাদের একচ্ছত্রশাসনের কালপর্যায়ের প্রকৃতির বৈশিষ্ট্য দেখিয়ে লেনিন বলেন, এটা হল সাম্রাজ্যবাদ, যুদ্ধ আর প্রলেতারীয় বিপ্লবের যুগ। সৃজনশীল উপায়ে মার্কসবাদের বিকাশ ঘটিয়ে লেনিন দেখালেন, বৈপ্লবিক পন্থায়

পুঁজিতন্ত্রের পতন পৃথিবীর সর্বত্র একেবারে একই সময়ে ঘটে না। সাম্রাজ্যবাদী কালপর্যায়ে পুঁজিতন্ত্রের অসম আর্থনীতিক আর রাজনীতিক বিকাশের কারণে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সময়ে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব নিষ্পন্ন হয়।

সমাজতন্ত্র জয়যুক্ত হয় প্রথমে একটা পুঁজিতান্ত্রিক দেশে, তারপরে অন্যান্য দেশ ক্রমে পুঁজিতন্ত্র ছেড়ে সমাজতন্ত্রের পথ ধরে।

সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব পৃথক-পৃথক দেশে জয়যুক্ত হতে পারে, এই মর্মে লেনিনের শিক্ষা প্রলেতারিয়েতের সামনে নতুন-নতুন দিগন্ত খুলে দিল — দেশে-দেশে বুর্জোয়াদের অবস্থানগুলোকে সবলে দখল করে নিতে তাদের অনুপ্রাণিত করল। সর্বকালের মহত্তম বিপ্লবে — রাশিয়ার অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক মহাবিপ্লবে এটা হয়ে উঠল কার্যকরণের অনুশীলন-পাঠ। কতকগুলি দেশ পুঁজিতন্ত্র ছেড়ে এসে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে সমাজতান্ত্রিক পথে প্রথম-প্রথম পদক্ষেপগুলি করল, এতে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সম্বন্ধে লেনিনের তত্ত্বের যাথার্থ্য আরও দৃঢ়ভাবে প্রতিপন্ন হল অতি চমৎকাররূপে।

২। পুঁজিতন্ত্রের সাধারণ সংকট

পুঁজিতন্ত্রের সাধারণ সংকটের উদ্ভব

পুঁজিতন্ত্র থেকে সমাজতন্ত্রে বৈপ্লবিক উত্তরণ হল সামাজিক বিকাশের একটা স্বাভাবিক ফল। এই উত্তরণের জন্যে পুঁজিতন্ত্র আর সমাজতন্ত্রের মধ্যে দীর্ঘ কালপর্যায়ের সংগ্রাম দরকার হয়, এটা অবশ্যম্ভাবী। এটা পুঁজিতন্ত্রের সাধারণ সংকটের কালপর্যায়।

পুঁজিতন্ত্রের সাধারণ সংকটটাকে নিয়ে এলো প্রথম বিশ্বযুদ্ধ এবং অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক মহাবিপ্লব। সাম্রাজ্যবাদী ফ্রন্টে প্রথম ভাঙন ঘটাল রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব। পুঁজিতান্ত্রিক বিশ্বব্যবস্থার ভিত ধরে নাড়া দিয়ে এই বিপ্লব পুঁজিতন্ত্রের অস্তিত্বটাকে বিপন্ন করল, — সমাজতান্ত্রিক বিশ্ববিপ্লবের সূচনা করল এই বিপ্লব।

ইতিহাসের পরবর্তী বিকাশের ধারায় একটা প্রকাণ্ড দেশপুঞ্জে পুঁজিতন্ত্রের পতন ঘটল, এইসব দেশ এগোল সমাজতান্ত্রিক পথ ধরে। একটামাত্র দেশের সীমানা ছাড়িয়ে সমাজতন্ত্র হয়ে উঠল একটা বিশ্বব্যবস্থা।

দুই ব্যবস্থায় পৃথিবীর বিভাগ এবং এই দুই ব্যবস্থার মধ্যে সংগ্রাম

রাশিয়া পুঁজিতন্ত্র থেকে বেরিয়ে গেল, তার মানে, পুঁজিতন্ত্র আর একমাত্র পৃথিবীজোড়া আর্থনীতিক ব্যবস্থা রইল না। পুঁজিতান্ত্রিক ব্যবস্থার অখণ্ড কর্তৃত্ব বিদায় হয়ে গেল ইতিহাসের পাতায়। সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা দেখা দিয়ে বিকশিত হতে থাকল। পৃথিবী দুটো ব্যবস্থায় বিভক্ত হয়ে গেল।

সমাজতন্ত্র আর পুঁজিতন্ত্র পৃথকই শুধু নয়, এ হল পরস্পরবিরোধী দুটো সমাজব্যবস্থা। এই দুই ব্যবস্থার মধ্যেকার দ্বন্দ্বই এখন মানবজাতির প্রধান দ্বন্দ্ব। মরণোন্মুখ পুঁজিতন্ত্র আর জয়গর্বিত সমাজতন্ত্র, এই দুই ব্যবস্থার মধ্যে সংগ্রাম পৃথিবীর ইতিহাসে একটা নিষ্পত্তিমূলক উপাদান হয়ে উঠেছে। এই দুটো ব্যবস্থা রয়েছে একই সময়ে, এর ফলে এদের মধ্যে প্রতিযোগিতা অবশ্যম্ভাবী, — অর্থনীতি,

রাজনীতি, ভাবাদর্শ এবং সমাজজীবনের অন্যান্য সমস্ত ক্ষেত্র জুড়ে এই প্রতিযোগিতা।

প্রায় তিন দশক ধরে সোভিয়েত ইউনিয়ন সমাজতন্ত্র গড়ছিল পুঁজিতান্ত্রিক বেষ্টনীর ভিতরে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে নাৎসী আক্রমণকারীরা চূড়ান্তভাবে পরাস্ত-পর্যুদস্ত হবার ফলে ইউরোপ আর এশিয়ার কতকগুলি দেশের পুঁজিতন্ত্র থেকে বেরিয়ে আসায় আনুকূল্য হল। এইসব দেশে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের জয় সমাজতন্ত্রকে করে তুলল একটা বিশ্বব্যবস্থা। এখন রয়েছে দুটো বিশ্বব্যবস্থা — সমাজতান্ত্রিক আর পুঁজিতান্ত্রিক।

সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির বিশ্বসংঘটি পৃথিবীর প্রগতিশীল শক্তিগুলির একটা পরাক্রমশালী শক্তিকেন্দ্র। যেসব দেশ পুঁজিতন্ত্র থেকে বেরিয়ে এসেছে সেখানে পৃথিবীর কোন শক্তি পুঁজিতন্ত্র আবার কায়েম করতে পারে না।

সমাজতন্ত্রের একটা বিশ্বব্যবস্থায় পরিণত হওয়ায় প্রত্যয়জনকভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, বিনাশই পুঁজিতন্ত্রের ইতিহাসনির্দিষ্ট নিয়তি। দুই ব্যবস্থার মধ্যে সংগ্রামের একটা নতুন পর্ব শুরু হয়েছে — এই সংগ্রামই পুঁজিতন্ত্রের সাধারণ সংকটের প্রধান বৈশিষ্ট্য। উন্নয়নশীল সমাজতন্ত্র এবং মরণোন্মুখ পুঁজিতন্ত্রের মধ্যে দ্বন্দ্ব — সমসাময়িক যুগের এই প্রধান দ্বন্দ্বটা পেঁীছেছে একটা উচ্চতর পর্বে।

সমাজতান্ত্রিক আর পুঁজিতান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যে প্রতিযোগিতার পরিসর হয়েছে ঢের বেশি বিস্তৃত; এটা হয়ে দাঁড়িয়েছে দুই বিশ্বব্যবস্থার মধ্যে প্রতিযোগিতা। একটা গোটা ঐতিহাসিক কালপর্যায়ের ভিতর দিয়ে পুঁজিতান্ত্রিক ব্যবস্থার উপর সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হচ্ছে।

ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার ভাঙন

উপনিবেশ আর নির্ভরশীল দেশে-দেশে সাম্রাজ্যবাদের অবস্থানগুলোর ভিত সরে যাওয়া, উন্নয়নশীল দেশে-দেশে পদানত জাতিগুলির স্বাধীনতা-অর্জন এবং এইসব দেশ থেকে সাম্রাজ্যবাদের উচ্ছেদের ফলে ঘটে ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার ভাঙন।

সাম্রাজ্যবাদের ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার সংকট লেগে গিয়েছিল রাশিয়ায় অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক মহাবিপ্লবের প্রত্যক্ষ প্রভাবে।

সমাজতন্ত্রের উদ্ভবে নিপীড়িত জাতিগুলির মুক্তির যুগের আবির্ভাবের সূচনা হল। বিশ্ব পুঁজিতন্ত্রকে দুর্বল করে ফেলে অক্টোবর বিপ্লব একটা প্রচণ্ড আঘাত হানল সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থাটার উপর। সাম্রাজ্যবাদের পশ্চাদভাগে আঘাত করে এই বিপ্লব ঔপনিবেশিক দুনিয়ায় সাম্রাজ্যবাদী শাসনের তলাটাকে ফাঁক করে দিল। উপনিবেশগুলিতে সাম্রাজ্যবাদী শাসন আগে ছিল কমবেশি সুস্থিত, তেমনটা আর রইল না। উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে নিপীড়িত জাতিগুলির সংগ্রামের পরিসর যা দাঁড়াল, তেমনটা আগে কখনও শোনা যায় নি।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে নাৎসী আক্রমণকারীরা পরাস্ত-পর্যুদস্ত হবার পরে, সমাজতান্ত্রিক বিশ্বব্যবস্থা গড়ে ওঠার পরে, সাম্রাজ্যবাদের পদানত জাতিগুলির জাতীয়-মুক্তি আন্দোলনের শক্তি বিস্তর বেড়ে গেল। উপনিবেশ আর নির্ভরশীল দেশগুলিতে জাতীয়-মুক্তি সংগ্রামের নতুন, প্রবল জোয়ারে সাম্রাজ্যবাদের ঔপনিবেশিক ব্যবস্থাটা ভেঙে-ভেঙে পড়তে থাকল। যুদ্ধোত্তরকালে পৃথিবীর জনসংখ্যার

অর্ধেকের বেশি মানুষ ঔপনিবেশিক আর আধা-ঔপনিবেশিক দাসত্বের শৃঙ্খল ছুড়ে ফেলে দিল। ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য-গুলোর ধ্বংসস্তূপের উপর দেখা দিল ডজন-ডজন সার্বভৌম রাষ্ট্র। এশিয়া আর আফ্রিকার বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ জাতিগুলি উপনিবেশবাদের জোয়াল খতম করে দিল।

কিউবার জনগণের বিপ্লব লাতিন আমেরিকায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ঔপনিবেশিক ফ্রন্টে ভাঙন ধরাল। নিজেদের স্বাধীনতাকে তুলে ধ'রে কিউবার মানুষ সমাজতান্ত্রিক বিকাশের পথ ধরল, — মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একচেটিয়া পুঁজির নিপীড়নের বিরুদ্ধে, মুক্তি আর স্বাধীনতার জন্যে সংগ্রামে তারা অনুপ্রাণিত করল লাতিন আমেরিকার সমস্ত দেশের মানুষকে।

লেনিন যেমনটা ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন সেইভাবেই পৃথিবীর ইতিহাস পড়ল এক নতুন কালপর্যায়ে, যেসব জাতিকে উপনিবেশবাদীরা শতাব্দীর পরে শতাব্দী যাবত সামাজিক প্রগতির পাকা সড়কে পা দিতে দেয় নি, তারা এবার সারা পৃথিবীরই ভবিষ্যৎ গড়ে তোলার কাজে সক্রিয়ভাবে শামিল হল।

উপনিবেশবাদের পরিণতিগুলো কাটিয়ে ওঠার সংগ্রাম

সাম্রাজ্যবাদের দাসত্বে বাঁধা জাতিগুলির দীর্ঘ কঠোর-অধ্যবসায়ী সংগ্রামের ফলে উপনিবেশবাদের পতন ঘটেছে। এইসব জাতির প্রতি সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির এবং সমস্ত প্রগতিশীল শক্তির শক্তিশালী সমর্থন রয়েছে। উপনিবেশবাদের জোয়ালটাকে যারা ভেঙে ফেলেছে সেইসব জাতি রাজনীতিক ক্ষমতা জয় করে নেবার পরে বিরাট-বিরাট

করণীয় কাজ এসে পড়ে তাদের সামনে। রাজনীতিক স্বাধীনতা সংহত করার জন্যে বৈদেশিক পুঁজি থেকে তাদের স্বাধীনতা অর্জন করা চাই, দশক পর দশকের, কোন-কোন ক্ষেত্রে শতাব্দী পর শতাব্দীর ঔপনিবেশিক দাসত্বের নিদারুণ কুফলগুলোকে তাদের নিশ্চিহ্ন করা চাই। এইসব কুফল হল — চূড়ান্ত প্রযুক্তিগত আর আর্থনীতিক অনগ্রসরতা, কৃত্রিমভাবে উপনিবেশবাদীদের চাপিয়ে-দেওয়া সেকেলে ধরনের সমাজজীবন, শ্রমের উৎপাদিকাশক্তি আর জাতীয় আয়ের অতি নিচু মাত্রা, ভুখা থাকা আর বিলুপ্ত হয়ে যাওয়াই হয়ে উঠেছিল যাদের নিয়তি সেইসব মানুষের কল্পনাতীত গরিবি।

যেসব জাতি উপনিবেশবাদের শিকল ভেঙে মুক্তি অর্জন করেছে, তাদের বিকাশের দুটো পথের মধ্যে একটাকে বেছে নিতে হচ্ছে: এক, বিকাশের পুঁজিতান্ত্রিক পথ — তাতে আরও বেশি সামাজিক অসমতা, দুর্দশা আর বঞ্চনা এবং একটানা গরিবি আর অনগ্রসরতা; এবং, দুই, সমাজতান্ত্রিক পথ — আর্থনীতিক আর সাংস্কৃতিক অগ্রগতি এবং প্রকৃত মুক্তি আর সুখী জীবনের পথ।

সদ্যস্বাধীন দেশগুলির মানুষ কার্যক্ষেত্রে দেখতে পেয়েছে, সমাজতন্ত্রে পেঁছবার বিকাশের অ-পুঁজিতান্ত্রিক পথে, একমাত্র এই পথেই তারা যুগযুগান্তরের অনগ্রসরতা আর গরিবি হঠাতে পারে, শোষণ খতম করতে পারে, উন্নত করতে পারে জীবনযাত্রার অবস্থা। বৈদেশিক একচেটিয়া কারবারগুলোর আধিপত্য খতম করা, অর্থনীতির রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্র গড়ে-বাড়িয়ে তোলা এবং জীবনযাত্রার মান উন্নত করার জন্যে কতকগুলি দেশে বিভিন্ন সুদূরপ্রসারী সামাজিক ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

এশিয়া, আফ্রিকা আর লাতিন আমেরিকার জাতিগুলির জাতীয় আর সামাজিক পুনরুজ্জীবন ব্যর্থ করার জন্যে সাম্রাজ্যবাদীরা সচেষ্ট রয়েছে। অর্থনীতিগতভাবে কম-অগ্রসর দেশগুলির মানুষকে গোলাম বানাবার জন্যে সাম্রাজ্যবাদীরা ভাঁওতাবাজির সঙ্গে বলপ্রয়োগ মিলিয়ে নতুন-নতুন ধরনের উপনিবেশবাদের শরণ নেয়, তাদের ফেলে বিভিন্ন আগ্রাসী সামরিক জোটের ফাঁদে, তাদের উপর চাপিয়ে দেয় গুরুভার সব শর্তের 'সাহায্য'। তারা আশা রাখে, এইভাবে পুরন অবস্থানগুলো বজায় রেখে নতুন-নতুন অবস্থানও দখল করতে পারবে।

এইসব মতলব হাসিল করার জন্যে সাম্রাজ্যবাদীরা কতকগুলো জিনিসের সুযোগ নেয় — যেমন, সদ্যস্বাধীন দেশগুলিতে জটিল সামাজিক আর শ্রেণীগত পরিস্থিতি, এইসব দেশের আর্থনীতিক কষ্ট-কাঠিন্য, বৈদেশিক একচেটিয়াগুলোর আধিপত্য, যা এর অনেক দেশে এখনও বজায় রয়েছে। একদিকে, প্রগতিশীল দেশপ্রেমিক শক্তিগুলি, আর অন্যদিকে, প্রতিক্রিয়াপন্থী মহলগুলো, এরা প্রকাশ্যে কিংবা প্রচ্ছন্নভাবে সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে যোগসাজশে কাজ চালায় — এই দুইয়ের মধ্যে সংগ্রামের ক্ষেত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে সদ্যস্বাধীন দেশগুলি। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিভিন্ন শক্তির মধ্যে এখনকার পারস্পরিক শক্তি-সম্পর্ক এবং সমাজতান্ত্রিক বিশ্বব্যবস্থার দৃঢ় সমর্থন উপনিবেশভোগী শক্তিগুলির পরিকল্পনা আর চক্রান্তগুলোকে ব্যর্থ করতে প্রাক্তন উপনিবেশগুলির মানুষের সহায়ক হয়।

সমসাময়িক যুগের প্রধান মর্মবস্তুটা

পুঁজিতন্ত্র থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণই সমসাময়িক যুগের প্রধান মর্মবস্তু। সমাজতান্ত্রিক দুনিয়া সম্প্রসারিত হচ্ছে, পুঁজিতান্ত্রিক দুনিয়া হয়ে আসছে সংকুচিত, সাম্রাজ্যবাদের নিয়মগুলো পৃথিবীর সর্বত্র আর নিয়ন্ত্রক নয়। সামাজিক বিকাশের নতুন-নতুন নিয়ম, যা সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় নিহিত, সেগুলি সামনে এসে গেছে এবং সামাজিক বিকাশের ধারার উপর ক্রমবর্ধমান প্রভাব খাটাচ্ছে।

সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির কর্মসূচিতে বলা হয়েছে, আমাদের এই যুগ, যার প্রধান মর্মবস্তু হল পুঁজিতন্ত্র থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণ, এটা পরস্পরবিরোধী দুই সমাজব্যবস্থার মধ্যে সংগ্রামের যুগ, সমাজতান্ত্রিক আর জাতীয়-মুক্তি বিপ্লবের যুগ, সাম্রাজ্যবাদের ভাঙন আর ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার অবসানের যুগ, আরও বেশি-বেশি জাতির সমাজতান্ত্রিক পথে পা বাড়াবার যুগ, পৃথিবীজোড়া পরিসরে সমাজতন্ত্র আর কমিউনিজমের জয়জয়কারের যুগ।

এইভাবে, পৃথিবীর বিকাশের সমসাময়িক যুগটাকে নির্ধারণ করছে তিনটে প্রক্রিয়া: এক, যেসব দেশে সমাজতন্ত্র জয়যুক্ত হয়েছে, সেখানে এই নতুন ব্যবস্থার উদ্ভব আর শক্তিবৃদ্ধি; দুই, সাম্রাজ্যবাদের নিপীড়িত জাতিগুলির জাতীয়-মুক্তি আন্দোলনের আঘাতে আঘাতে উপনিবেশবাদের পতন; এবং তিন, পুঁজিতান্ত্রিক দেশগুলিতে যাবতীয় আভ্যন্তরিক আর বহিস্থ দ্বন্দ্বগুলোর প্রকোপবৃদ্ধি এবং এইসব দেশে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পূর্বশর্তগুলোর পরিপক্কতা।

পুঁজিতন্ত্রের সাধারণ সংকটের যুগ হল সমাজতান্ত্রিক আর পুঁজিতান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যে সংগ্রামের যুগ। সমাজতন্ত্রের

বলগুলি সমানে বেড়ে চলেছে। পৃথিবীর জনসংখ্যার বেশির ভাগটার উপর সাম্রাজ্যবাদের আধিপত্য শেষ হয়ে গেছে চিরতরে, তার প্রভাবাধীন ক্ষেত্র কমে আসছে সমানে। সমাজতান্ত্রিক আর পুঁজিতান্ত্রিক ব্যবস্থার পারস্পরিক শক্তি-সম্পর্ক যা, তাতে পুঁজিতন্ত্র আর কখনও সমাজতন্ত্রের উপর প্রাধান্যলাভের আশা করতে পারে না। বিজ্ঞান আর প্রযুক্তিবিদ্যার কতকগুলো মূল-মূল ক্ষেত্রে সমাজতন্ত্র ইতোমধ্যে পুঁজিতন্ত্রকে ধরে ফেলে ছাড়িয়ে গেছে, সাম্রাজ্যবাদ আর আক্রমণের শক্তিগুলোকে শায়েস্তা করার জন্যে পর্যাপ্ত বৈষয়িক উপায়-উপকরণ রয়েছে শান্তিপ্রিয় শক্তিগুলির হাতে।

পুঁজিতন্ত্রের সাধারণ সংকট লেগে যাবার পর থেকে পৃথিবীর রাজনীতিক মানচিত্রে মূলগত পরিবর্তন ঘটে গেছে। ১৯১৯ সালে সমাজতান্ত্রিক দুনিয়া ছিল পৃথিবীর ১৬ শতাংশ অঞ্চল জুড়ে, তাতে ছিল পৃথিবীর জনসংখ্যার ৭·৮ শতাংশ; আর ১৯৭১ সালের মাঝামাঝি সময় নাগাত সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির আয়তন হয়েছিল পৃথিবীর মোট অঞ্চলের ২৫·৯ শতাংশ — সেটা ছিল পৃথিবীর জনসংখ্যার ৩২·৯ শতাংশের বাসভূমি। ১৯১৯ সালে প্রধান-প্রধান সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন, জার্মানি, ফ্রান্স, জাপান আর ইতালির) আয়তন ছিল তাদের উপনিবেশগুলিসমেত পৃথিবীর আয়তনের ৪৪·৪ শতাংশ, তাতে ছিল পৃথিবীর জনসংখ্যার ৪৮·১ শতাংশ; আর ১৯৭১ সালের মাঝামাঝি সময় নাগাত অগ্রসর পুঁজিতান্ত্রিক দেশগুলির আয়তন ছিল পৃথিবীর ৮·৬ শতাংশ, সেটা ছিল পৃথিবীর জনসংখ্যার ১৪·৯ শতাংশ। ১৯১৯ সালে পৃথিবীর মোট অঞ্চলের ৭২ শতাংশ জুড়ে ছিল উপনিবেশ, আধা-উপনিবেশ আর ডমিনিয়নগুলি, সেখানে ছিল পৃথিবীর জনসংখ্যার ৬৯·৪ শতাংশ। কিন্তু, ১৯৭১ সালে পৃথিবীর

আয়তনের ৫৮·৭ শতাংশ জুড়ে ছিল উন্নয়নশীল দেশগুলি, সেখানে ছিল পৃথিবীর জনসংখ্যার ৪৭ শতাংশ।

১৯৬৯ সালে মস্কোয় অনুষ্ঠিত কমিউনিস্ট এবং শ্রমিক পার্টিগুলির আন্তর্জাতিক সম্মেলনে গৃহীত একখানা দলিলে পৃথিবীর বিকাশের সমসাময়িক পর্বের প্রকৃতি দেখিয়ে বলা হয়েছিল:

'বিভিন্ন শক্তিশালী বৈপ্লবিক প্রক্রিয়া ত্বরিত হয়ে উঠছে সারা পৃথিবী জুড়ে। সমাজতান্ত্রিক বিশ্বব্যবস্থা, আন্তর্জাতিক শ্রমিক শ্রেণীর আর জাতীয়-মুক্তি আন্দোলন — আমাদের একালের এই তিনটে পরাক্রমশালী শক্তি সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে একজোট হচ্ছে। বৈপ্লবিক আর প্রগতিশীল শক্তিগুলির আরও অগ্রগতির ক্রমবর্ধমান সম্ভাবনা এখনকার পর্যায়টার বিশেষক উপাদান। তারই সঙ্গে সঙ্গে, সাম্রাজ্যবাদ তার আক্রমণমুখী কর্মনীতি দিয়ে যে-বিপদ আনছে, সেটা বাড়ছে। সাম্রাজ্যবাদের সাধারণ সংকট গভীরতর হয়ে উঠছে, তবু সাম্রাজ্যবাদ বহু জাতির উপর নিপীড়ন চালিয়ে যাচ্ছে, শান্তি আর সামাজিক প্রগতির ক্ষেত্রে একটা সদাবর্তমান বিপদ হয়েই রয়েছে।'

মানুষের বিকাশের পথে একটা বিকট বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে পুঁজিতন্ত্র। আমাদের এই যুগটা হল উৎপাদন-বলগুলোর অতি দ্রুত বৃদ্ধি এবং বিজ্ঞান আর প্রযুক্তিবিদ্যার অভূতপূর্ব বিকাশের যুগ। তার ফলে এখনও যে বহু কোটি-কোটি মানুষের গরিবি দূর হয় নি কিংবা আমাদের এই গ্রহের সমস্ত মানুষের জন্যে বৈষয়িক আর আত্মিক সম্পদের অঢেল প্রাচুর্য সৃষ্টি হয় নি, সেজন্যে দোষী একমাত্র পুঁজিতন্ত্রই।

সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির কর্মসূচিতে বলা হয়েছে: 'উৎপাদন-বলগুলো এবং উৎপাদন-সম্পর্কের মধ্যে

ক্রমবর্ধমান বিরোধ থেকে এই আবশ্যিক করণীয় কাজ দেখা দিচ্ছে যে, মানবজাতিকে ক্ষয়ে-যাওয়া পুঁজিতান্ত্রিক খোলকটাকে ভেঙে ফেলতে হবে, মানুষের সৃষ্টি-করা শক্তিশালী উৎপাদন-বলগুলোকে মুক্ত করে সেটাকে ব্যবহার করতে হবে সমগ্র সমাজের স্বার্থে।'

এই করণীয় কাজটা নিষ্পন্ন করছে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব।

সমাজতন্ত্র এবং কমিউনিজম

নবম পরিচ্ছেদ

পঁুজিতন্ত্র থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণ-কালপর্যায়

১। উত্তরণ-কালপর্যায় আবশ্যক

সমাজতান্ত্রিক উৎপাদনপ্রণালীর উদ্ভব

আগেই দেখানো হয়েছে, পঁুজিতন্ত্রের উদ্ভব হয় স্বতঃস্ফূর্তভাবে — এটাকে সচেতনভাবে, পরিকল্পনা অনুসারে গড়ে তোলা হয় না। এর আগেকার শোষণকর ব্যবস্থাদুটো — দাসপ্রথা আর সামন্ততন্ত্রও দেখা দিয়েছিল স্বতঃস্ফূর্তভাবে।

সমাজতন্ত্রের বেলায় ব্যাপারটা পঁুজিতন্ত্র এবং তার আগেকার বিভিন্ন রূপের সমাজ থেকে বিসদৃশ: সমাজতন্ত্র স্বতঃস্ফূর্তভাবে দেখা দিতে পারে না। মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পার্টির নেতৃত্বে শ্রমিক শ্রেণীর পরিচালিত জনগণের সচেতন কার্যকলাপে সমাজতন্ত্র গড়ে তোলা হয়।

অন্যান্য সমস্ত বিপ্লব থেকে বুনিয়াদী রকমে পৃথক সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব মানুষের ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি মূলগত বৈপ্লবিক পরিবর্তন।

আগেকার সমস্ত বিপ্লবে উৎপাদনের উপকরণের উপর একরকমের ব্যক্তিগত মালিকানার জায়গায় এসেছিল অন্যরকমের ব্যক্তিগত মালিকানা। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব উৎপাদনের উপকরণে ব্যক্তিগত মালিকানা খতম করে সেগুলোকে করে এজমালি সমাজতান্ত্রিক সম্পত্তি।

আগেকার সমস্ত বিপ্লব একরকমের শোষণের জায়গায় এনেছিল অন্য একরকমের শোষণ। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব মানুষের উপর মানুষের সমস্ত রকমের শোষণ খতম করে এবং শোষক শ্রেণীগুলোর অবসান ঘটায়।

আগেকার কোন বিপ্লব কখনও সামাজিক উৎপাদনে অরাজকতা দূর করতে পারে নি। একমাত্র সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবই উৎপাদনে অরাজকতা নিশ্চিহ্ন করে এবং সামাজিক উৎপাদনের পরিকল্পিত সংগঠন চালু করে।

বুর্জোয়ারা ক্ষমতায় থাকতে সমাজতন্ত্র গড়া যায় না। রাষ্ট্রক্ষমতা বুর্জোয়াদের হাত থেকে শ্রমিক শ্রেণীর হাতে চলে গেলে, একমাত্র তবেই সমাজতন্ত্র গড়া শুরু হয়।

সমাজের সমাজতান্ত্রিক রূপান্তরের পথ প্রস্তুত করার জন্যে একটা বৈপ্লবিক উত্তরণ-কালপর্যায় অপরিহার্য। বিভিন্ন দেশে এই কালপর্যায়টার বিভিন্ন স্বকীয় বিশেষ-নির্দিষ্ট উপাদান থাকতে পারে, কালপর্যায়টার দৈর্ঘ্য হতে পারে বিভিন্ন। কিন্তু সবসময়েই আর সর্বত্রই, পুঁজিতন্ত্র থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণ শুরু হয় সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের জয় দিয়ে।

পুঁজিতন্ত্রের জায়গায় সমাজতন্ত্র কায়েম করার ব্যাপারটা ঘটে সামাজিক বিকাশের বিষয়গত নিয়মাবলি অনুসারে। তারই সঙ্গে সঙ্গে, মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পার্টির নেতৃত্বে জনগণের আত্মোৎসর্গ-করা সংগ্রাম আর সৃজনশীল কর্মের ভিতর দিয়ে ঘটে এই প্রতিস্থাপনা। পুঁজিতন্ত্রের জায়গায় সমাজতন্ত্র স্থাপন করার অর্থ হল সামাজিক ক্রিয়াকলাপের সর্বক্ষেত্রের মূলগত পুনঃসংগঠন, — মানবসমাজের অস্তিত্বের ভিত্তি হল বৈষয়িক উৎপাদনের অবস্থাটা, সেখান থেকে শুরু করে মানবচেতনার সর্বোচ্চ ক্ষেত্র, বিজ্ঞান আর সংস্কৃতিতে ঘটে এই পুনঃসংগঠন।

জটিল সমাজদেহের এমন মূলগত পুনঃসংগঠন ঘটতে পারে একমাত্র মার্কসবাদী-লেনিনবাদী তত্ত্বের সৃজনশীল প্রয়োগের ভিত্তিতে, — সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের বিরাট করণীয় কাজগুলি নিষ্পন্ন করার পথ দেখিয়ে দেয় এই তত্ত্ব। তেমনি, সমাজের সমাজতান্ত্রিক রূপান্তরণের প্রক্রিয়ার মধ্যে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের মূলনীতিগুলি যাচাই হয়ে যায়, শুধু তাই নয়, নতুন ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতার সামান্যীকরণের ফলে সেগুলি আরও বিকশিত হয়।

সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি স্থাপন করায় প্রলেতারিয়েতের একনায়কত্বের ভূমিকা

সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ঘটতে পারে নানারূপে। কিন্তু, রূপটা যা-ই হোক, এর ফলে ক্ষমতা চলে আসে সংখ্যালঘু বুর্জোয়াদের কাছ থেকে শ্রমিক শ্রেণীর হাতে, আর কায়েম হয় প্রলেতারিয়েতের একনায়কত্ব, জনসমষ্টির বেশির ভাগটাকে পরিচালিত করে প্রলেতারিয়েত — এসবের অন্যথা হয় না।

মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পার্টির নেতৃত্বে শ্রমিক শ্রেণীর একনায়কত্ব সমাজের সমাজতান্ত্রিক রূপান্তরের জন্যে নিষ্পত্তিমূলক। শ্রমিক শ্রেণীর একনায়কত্ব শ্রমজীবী জনগণের পুরোভাগে থাকে, পুরন সমাজের শক্তিগুলো আর রীত-রেওয়াজগুলোর বিরুদ্ধে তাদের সংগ্রাম সংগঠিত করে। শোষকদের প্রতিরোধ চূর্ণবিচূর্ণ ক'রে, বাইরের বৈরকার কার্যকরণের বিরুদ্ধে দেশরক্ষা ক'রে, প্রলেতারিয়েতের একনায়কত্ব নতুন, সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি গড়ার কাজ সংগঠিত করে, তাতে নেতৃত্ব দেয়। এই আর্থনীতিক গঠনকাজের ধারায় পুরন বুর্জোয়া উৎপাদন-সম্পর্ক খতম হয়ে যায়, গড়ে ওঠে নতুন, সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন-সম্পর্ক। সমাজতান্ত্রিক উৎপাদনপ্রণালী গড়া আর

বিকশিত করার জন্যে অবশ্যপ্রয়োজনীয় নতুন উৎপাদন-বলগুলোও সৃষ্টি হয় তারই সঙ্গে সঙ্গে।

সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি গড়ে তোলা বলতে বুঝায় বিভিন্ন বুনিয়াদী সামাজিক-আর্থনীতিক সংস্কারের প্রবর্তন করা, সেগুলির মধ্যে থাকে: উৎপাদনের মূল উপকরণগুলিতে সামাজিক মালিকানা কায়েম করা, মানুষের উপর মানুষের শোষণের অবসান ঘটানো, অরাজকতাময় যে-উৎপাদন চালানো হয় কেবল পুঁজিতান্ত্রিক লাভ রাশীকৃত করার উদ্দেশ্যে তার জায়গায় পরিকল্পিত উৎপাদন চালু করা, সমগ্রভাবে সমাজের এবং বিশেষভাবে সমাজের প্রত্যেকের প্রয়োজনগুলো মেটানোই এই উৎপাদনের লক্ষ্য।

সমাজের সমাজতান্ত্রিক পুনঃসংগঠনকাজের মধ্যে শ্রমজীবী মানুষের সবচেয়ে বিস্তৃত অংশটা নিজের অভিজ্ঞতা থেকে বুঝতে পারে, তাদের জরুরী স্বার্থগুলো শ্রমিক শ্রেণীর স্বার্থগুলোর সঙ্গে অভিন্ন। এর ফলে গড়ে ওঠে শ্রমিক শ্রেণী এবং অ-প্রলেতারীয় শ্রমজীবী জনগণের, প্রথমত কৃষককুলের অটুট মৈত্রী — সেটা হয় সমাজতন্ত্র গড়া এবং কমিউনিজমের দিকে তার আরও অগ্রগতির স্বার্থে। শ্রমিক শ্রেণী আর কৃষককুলের মৈত্রী — এটা প্রলেতারিয়েতের একনায়কত্বের সর্বোচ্চ নীতি।

সমাজতন্ত্র আর কমিউনিজম গড়ায় কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বের ভূমিকা

সমাজতন্ত্র গড়ার কাজে প্রলেতারিয়েতের একনায়কত্ব অত্যাবশ্যক, আর তাতে সাফল্যের একটা নিশ্চায়ক হল কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বের ভূমিকা।

কমিউনিস্ট পার্টি শ্রমিক শ্রেণীর এবং সমস্ত শ্রমজীবী মানুষের সর্বাগ্রগামী বাহিনী। এই পার্টি মার্কসবাদ-লেনিনবাদের অগ্রসর বৈপ্লবিক তত্ত্বে সজ্জিত, এই পার্টি খুলে ধরে সামাজিক বিকাশের নিয়মাবলি, বিশেষত সমাজতন্ত্র আর কমিউনিজম গড়ার নিয়মাবলি। উত্তরণকাল এবং কমিউনিজমে পৌঁছবার পথ ধরে সমাজতান্ত্রিক সমাজের পরবর্তী বিকাশ, উভয় পর্বে সমাজতন্ত্র নির্মাণের জটিল করণীয় কাজগুলো সমাধা করতে গিয়ে প্রলেতারিয়েতের একনায়কত্ব যাতে নির্ভুল, বিজ্ঞানসম্মত পথে চলে, সেটাকে নিশ্চিত করে কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্ব।

অবিচলিতভাবে শ্রেণীগত, প্রলেতারীয় কর্মনীতি ধরে চলতে গিয়ে কমিউনিস্ট পার্টি অদলীয় জনগণের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট। কমিউনিস্ট পার্টি নেতৃত্ব দেবার ফলে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি সংগঠনের কাজে শ্রমজীবী জনগণের বিস্তৃত অংশের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত হয়।

কমিউনিস্ট পার্টির সংসক্তি এবং শ্রমিক শ্রেণীর আদর্শের প্রতি, সমাজতন্ত্রের আদর্শের প্রতি নিষ্ঠাপূর্ণ আনুগত্যের মধ্যেই এই পার্টির শক্তি নিহিত। সমাজতন্ত্রের শত্রুদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে এবং সমাজতান্ত্রিক সমাজ গড়ার কাজে ইচ্ছা আর কর্মের ঐক্য প্রতিষ্ঠা করতে কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্ব অত্যাবশ্যক।

সমাজতান্ত্রিক সমাজ কায়েম করা এবং বিকশিত করায় কমিউনিস্ট পার্টির নিষ্পত্তিমূলক ভূমিকা সম্বন্ধে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী শিক্ষার যাথার্থ্য সোভিয়েত ইউনিয়নে এবং অন্যান্য দেশে সমাজতান্ত্রিক নির্মাণকাজের অভিজ্ঞতায় ষোল-আনাই প্রতিপন্ন হয়েছে। ঘটনাবলিই দেখিয়ে দিয়েছে, একমাত্র মার্কসবাদী-লেনিনবাদী ভাব-ধারণার প্রতি নিষ্ঠাবান পার্টিই সমগ্র জনগণকে সংগঠিত ক'রে সমাজতন্ত্রের বিজয়ের পথে তাদের পরিচালিত করতে পারে।

উত্তরণ-কালপর্যায়ে বিভিন্ন সামাজিক-আর্থনীতিক ক্ষেত্র এবং শ্রেণীগুলি

সমাজের সমাজতান্ত্রিক রূপান্তরণের পথ ধ'রে প্রলেতারিয়েতের একনায়কত্ব সর্বাগ্রে এবং সর্বোপরি পুঁজিপতি আর ভূস্বামীদের মালিকানাধীন উৎপাদনের মূল উপকরণগুলোকে সামাজিক সম্পত্তি করে ফেলে। বৃহদায়তন শিল্প আর পরিবহণ, ব্যাংকগুলো আর বহির্বাণিজ্য হাতে নিয়ে প্রলেতারিয়েতের একনায়কত্ব অর্থনীতির নিয়ন্ত্রক অবস্থানগুলো দখল করে।

এইভাবে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার সূত্রপাত হয়, সেটা উত্তরণ-কালপর্যায়ের অর্থনীতিতে একটা প্রধান ভূমিকায় থাকে। কিন্তু, কিছুকালের জন্যে এটা একমাত্র ব্যবস্থা থাকে না — এমনকি কর্তৃত্বকর ব্যবস্থাও নয়।

লেনিন দেখিয়েছিলেন, সোভিয়েত রাজের প্রথম-প্রথম বছরগুলিতে সোভিয়েত ইউনিয়নের অর্থনীতিতে সামাজিক-আর্থনীতিক ব্যবস্থা ছিল পাঁচটা:

১) গোষ্ঠীপতি-নিয়ন্ত্রিত কৃষক অর্থনীতি;

২) ক্ষুদ্রায়তনের পণ্য উৎপাদন;

৩) ব্যক্তিগত পুঁজিতন্ত্র;

৪) রাষ্ট্রীয় পুঁজিতন্ত্র;

৫) সমাজতন্ত্র।

গোষ্ঠীপতি-নিয়ন্ত্রিত কৃষক অর্থনীতি ছিল মোটের উপর স্বাভাবিক অর্থনীতি, তাতে উৎপাদন হত প্রধানত নিজেদের ভোগ-ব্যবহারের জন্যে।

ক্ষুদ্রায়তনের পণ্য উৎপাদনের বেশির ভাগটাই ছিল মাঝারি কৃষকদের অর্থনীতি নিয়ে, তাতেই বিক্রয়যোগ্য শস্যের প্রধান

অংশটা উৎপন্ন হয়। যারা মজুরি-শ্রম খাটায় না, এমনসব হস্তশিল্পীও ছিল এই ব্যবস্থার মধ্যে।

ব্যক্তিগত পুঁজিতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ছিল শোষক শ্রেণীগুলোর সবচেয়ে বেশিসংখ্যক অংশগুলো — কুলাকেরা (ধনী কৃষক), মজুরি-শ্রম খাটানো ছোট শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলোর মালিকেরা, আর দোকানদারও।

প্রধানত বিদেশী পুঁজিপতিদের দেওয়া বিভিন্ন কনসেশন এবং বিদেশীদের কাছে ইজারা দেওয়া বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, বনভূমি আর ভূমি নিয়ে ছিল রাষ্ট্রীয় পুঁজিতান্ত্রিক ক্ষেত্র। সোভিয়েত ইউনিয়নের অর্থনীতিতে রাষ্ট্রীয় পুঁজিতন্ত্রের ভূমিকা ছিল গৌণমাত্র।

সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ছিল — রাষ্ট্রের হাতে নেওয়া কল-কারখানা, পরিবহণ ব্যবস্থাদি, যোগাযোগের উপায়াদি, ব্যাঙ্কগুলো এবং রাষ্ট্রীয় খামারগুলো আর যৌথখামারগুলোও, সেগুলো কয়েক বছর যাবত ছিল কৃষকদের পৃথক-পৃথক খামারগুলোর সমুদ্রের মধ্যে ছোট-ছোট দ্বীপমাত্র।

অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশেও উত্তরণ-কালপর্যায়ের অর্থনীতি বহু-ব্যবস্থাবিশিষ্ট। কোন একটা দেশে ব্যবস্থাগুলোর সংখ্যা এবং তার প্রত্যেকটার গুরুত্ব নির্ভর করে সেই দেশের আর্থনীতিক উন্নয়নের মাত্রা এবং ঐতিহাসিক বৈশিষ্ট্যগুলোর উপর।

উত্তরণ-কালপর্যায়ে সামাজিক অর্থনীতির প্রধান-প্রধান রূপ হল সমাজতন্ত্র, ক্ষুদ্রায়তনের পণ্য উৎপাদন এবং পুঁজিতন্ত্র। প্রধান শ্রেণীগত শক্তিগুলি তদনুসারেই: শ্রমিক শ্রেণী, কৃষককুল এবং বুর্জোয়ারা। ক্ষুদ্রায়তনের পণ্য উৎপাদন হল পুঁজিতন্ত্রের দ্রুত বৃদ্ধির ক্ষেত্র, সেখানে পুঁজিপতিরা পয়দা হয় সর্বক্ষণ।

পরাস্ত পুঁজিতন্ত্র, যা তখনও একেবারে খতম হয়ে যায় নি, আর জায়মান কিন্তু তখনও দুর্বল সমাজতন্ত্র, এই দুইয়ের মধ্যে সংগ্রামের কাল হল পুঁজিতন্ত্র থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের কালপর্যায়। এটা একটা জীবনমরণ সংগ্রাম, কেননা 'কে কাকে পরাস্ত করবে', তার ফয়সালা এই সংগ্রামে।

উত্তরণ-কালপর্যায়ের প্রধান-প্রধান করণীয় কাজ

বিপ্লবে বিজয় এবং নিয়ন্ত্রক ঘাঁটিগুলো হাতে নেবার পরে বিরাট-বিরাট করণীয় কাজ পড়ে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সামনে। উত্তরণ-কালপর্যায়ের বহু-ব্যবস্থাবিশিষ্ট অর্থনীতিকে সমাজতান্ত্রিক আর্থনীতিক ব্যবস্থায় রূপান্তরিত করাই এই রাষ্ট্রের প্রধান গরজের বিষয়।

এইসব করণীয় কাজ নিষ্পন্ন করার উপযোগী করেই নির্ধারিত হয় প্রলেতারীয় একনায়কত্বের আর্থনীতিক কর্মনীতি। সমাজতন্ত্রের আর্থনীতিক নিয়মাবলি অনুসারে কাজ করে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র — এই রাষ্ট্রের আর্থনীতিক ব্যবস্থাবলির মোট সমষ্টি নিয়ে এই কর্মনীতি।

পুঁজিতন্ত্র থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের সমগ্র কালপর্যায়ের জন্যে প্রলেতারীয় একনায়কত্বের গভীর বিজ্ঞানসম্মত ভিত্তি রচনা করেছিলেন লেনিন। সমাজতান্ত্রিক সমাজ গড়ার জন্যে তাঁর পরিকল্পনার তিনটে বুনিয়াদী উপাদান আছে — সেগুলি হল: দেশের শিল্পযোজন, কৃষিক্ষেত্রে সমবায় এবং সাংস্কৃতিক বিপ্লব। এইসব ব্যবস্থা কার্যে পরিণত করা হলে সৃষ্টি হয় সমাজতন্ত্রের বৈষয়িক আর টেকনিকাল বনিয়াদ, সমগ্র অর্থনীতিতে সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন-সম্পর্কের জয় হয় পূর্ণাঙ্গ।

সমাজতন্ত্রের পথ যারা ধরে এমন সমস্ত দেশকেই উত্তরণ-

কালপর্যায়ের এইসব প্রধান করণীয় কাজের মোকাবিলা করতে হয়। এর প্রত্যেকটা কাজের পরিধি এবং সেটা সংসাধনের মূর্ত-নির্দিষ্ট প্রণালী নির্ভর করে সংশ্লিষ্ট দেশটির বিভিন্ন ঐতিহাসিক বৈশিষ্ট্য এবং বিকাশের মাত্রার উপর।

২। সমাজতন্ত্র গড়তে লেনিনের পরিকল্পনা এবং সেটার সংসাধন

সোভিয়েত ইউনিয়নে সমাজতান্ত্রিক শিল্পযোজন

অক্টোবর বিপ্লবের প্রাক্কালে লেনিন এই লক্ষ্য নির্দিষ্ট করেছিলেন: আগে রাজনীতিক ক্ষমতা জয় করতে হবে, আর তারপরে অর্থনীতিগতভাবে অগ্রসর পুঁজিতান্ত্রিক দেশগুলিকে ধরে ফেলে তাদের ছাড়িয়ে যেতে হবে।

সোভিয়েত ইউনিয়নে সমাজতন্ত্র গড়ার জন্যে শক্তিশালী সমাজতান্ত্রিক শিল্প স্থাপন ক'রে প্রযুক্তিগত আর আর্থনীতিক অনগ্রসরতা ঘুচিয়ে দেওয়াটা অত্যাবশ্যক ছিল সর্বোপরি। লেনিন বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে বলেছিলেন, সমাজতন্ত্রের একমাত্র বৈষয়িক বনিয়াদ হতে পারে বৃহদায়তনের যন্ত্রশিল্পই, যা কৃষিকেও পুনঃসংগঠিত করতে সক্ষম।

উৎপাদন-বলগুলোর বিকাশ ঘটাতে হলে অর্থনীতির সমস্ত শাখার উৎপাদন-বন্দোবস্তটাকে সম্প্রসারিত করতে হয়, অগ্রসর প্রযুক্তি চালু করে সেটাকে উন্নততর করতে হয়। সূক্ষ্ম-জটিল যন্ত্রপাতি, লেদ, মাপনযন্ত্র, সরঞ্জাম তৈরি হয় ইঞ্জিনিয়রিং শিল্পে — তাই, এই শিল্প শিল্পযোজনের মেরুদণ্ড বলে গণ্য হয় সংগত কারণেই।

ধাতু, জালানি, বিদ্যুৎশক্তি, রাসায়নিক দ্রব্যসামগ্রী এবং নির্মাণের মালমশলা কেমনটা মেলে, তার উপর যন্ত্রপাতি আর সরঞ্জামের উৎপাদন নির্ভর করে। এর ফলে, ধাতুশিল্প, জালানি (কয়লা, তৈল, গ্যাস) আহরণ, এবং রাসায়নিক, বিদ্যুৎশক্তি আর নির্মাণের মালমশলার (সিমেন্ট, রীইনফোর্স্‌ড কন্‌ক্রিট, ইত্যাদি) শিল্পগুলি চূড়ান্ত গুরুত্বসম্পন্ন। শিল্পের এইসব শাখা, আর তার সঙ্গে ইঞ্জিনিয়রিং শিল্প মিলে যেকোন দেশের ভারি শিল্প, — কৃষির উন্নয়ন, সমানে ভোগ্য পণ্যের উৎপাদনবৃদ্ধি এবং জীবনযাত্রার মানের ক্রমাগত উন্নতির একটা ভিত্তি হল এই ভারি শিল্প।

কোন দেশের আর্থনীতিক স্বাধীনতালাভ এবং প্রতিরক্ষাক্ষমতা শক্তিশালী করার জন্যে শিল্পযোজন অবশ্যপ্রয়োজনীয়।

সোভিয়েত ইউনিয়নে সমাজতন্ত্র গড়ার লক্ষ্য অনুসারে কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ কর্মধারার ভিত্তি ছিল দেশের শিল্পযোজনের কর্মনীতি।

আভ্যন্তরিক আর আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি যা ছিল, তাতে সর্বোচ্চ দ্রুতগতিতে সোভিয়েত ইউনিয়নের সমাজতান্ত্রিক শিল্পযোজন নিষ্পন্ন করাটা পরম আবশ্যক ছিল। ঐ সময়ে দেশে ছোট-কৃষকের অর্থনীতির প্রাদুর্ভাব ছিল — এই বনিয়াদটা ছিল কমিউনিজমের চেয়ে পুঁজিতন্ত্রের পক্ষেই বেশি উপযোগী। কাজেই, পুঁজিতন্ত্রে ফিরে যাওয়া রোধ করার জন্যে ব্যাপক পরিসরে যন্ত্র উৎপাদনের ব্যবস্থা ক'রে কৃষিসমেত সমগ্র অর্থনীতিকে অগ্রসর প্রযুক্তির ভিত্তিতে দাঁড় করানো আবশ্যক ছিল। চড়া হারে শিল্পযোজন ছিল সোভিয়েত ইউনিয়নে সমাজতন্ত্রের বিজয়ের নিশ্চায়ক, শুধু তাই নয়, সেটা ছিল দেশের স্বাধীনতা বজায় রাখারও উপায়।

ইতিহাসের নিরিখে স্বল্প সময়ে একটা বিশাল দেশের শিল্পযোজনের কাজে বিপুল বাধাবিপত্তি ছিল, বিরাট প্রচেষ্টা আর ত্যাগস্বীকার করেই সেটা সাধন করা সম্ভব ছিল। এই কাজ নিষ্পন্ন হয়েছিল, তার কারণ, উৎপাদন-বলগুলোর বিকাশের পথে পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদন-সম্পর্ক যেসব বাধা সৃষ্টি করেছিল, সেগুলোকে দূর করে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব উৎপাদন-বলের দ্রুত বৃদ্ধির বিস্তৃত সম্ভাবনা সৃষ্টি করল। পুঁজিতন্ত্র উচ্ছেদের ফলে উৎসারিত হল জনগণের অফুরন্ত সৃজনশীল ক্রিয়াকলাপ। সমাজতন্ত্র গড়ার লেনিনীয় পরিকল্পনায় সজ্জিত হয়ে কমিউনিস্ট পার্টি দেশের যুগযুগান্তরের প্রযুক্তিগত এবং আর্থনীতিক অনগ্রসরতার উপর চূড়ান্ত আক্রমণে পরিচালিত করল সোভিয়েত জনগণকে। সমাজতন্ত্র পুঁজিতন্ত্রের চেয়ে উচ্চতর সমাজব্যবস্থার — এই সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার ঐতিহাসিক শ্রেষ্ঠত্বের সুবিধাগুলোর ফলে সোভিয়েত ইউনিয়ন শিল্পের এবং সমগ্র অর্থনীতিরই বৃদ্ধির যে-হার দাঁড় করাল, তেমনটা পুঁজিতন্ত্র কখনও করতে পারে নি।

বৃদ্ধির এই চড়া হারের ফলে সোভিয়েত ইউনিয়ন যে-পথ অতিক্রম করল, সেটা করতে পুঁজিতান্ত্রিক দেশগুলির লেগেছিল কয়েক গুণ বেশি সময়। শিল্পোৎপাদনের ক্ষেত্রে সোভিয়েত ইউনিয়ন ১২—১৩ বছরে যে-সাফল্যলাভ করেছিল, সেটা করতে সমগ্রভাবে পুঁজিতান্ত্রিক দুনিয়ার লেগেছিল ৮০ বছর, অর্থাৎ, ৬ গুণ বেশি। সবচেয়ে দ্রুত-উন্নয়নশীল পুঁজিতান্ত্রিক দেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আর জার্মানির লেগেছিল অন্তত ৫০ বছর, অর্থাৎ, ৪ গুণ বেশি।

বৃহদায়তনের আধুনিক শিল্প গ'ড়ে পরাক্রমশালী শিল্পসমৃদ্ধ শক্তি হয়ে উঠতে সোভিয়েত ইউনিয়নের লেগেছিল মাত্র তিনটে পাঁচসালা পরিকল্পনা কালপর্যায়

(১৯২৯—১৯৪১), যদিও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ বাধার দরুন শেষ পাঁচসালা পরিকল্পনাটা শেষ হতে পারে নি। সোভিয়েত ইউনিয়ন শিল্পোৎপাদনে ইউরোপে প্রথম এবং সারা পৃথিবীতে দ্বিতীয় স্থানে (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পরে) এসে গেল। পুঁজিতান্ত্রিক দেশগুলি থেকে অর্থনীতিগতভাবে স্বাধীন হয়ে গেল সোভিয়েত ইউনিয়ন। অপরিমেয়ভাবে বেড়ে গেল তার প্রতিরক্ষাক্ষমতা। দেশের শিল্পযোজন হল শ্রমিক শ্রেণী এবং সমগ্র জনগণের একটা বিরাট সাধনসাফল্য, তারা সর্বপ্রযত্নে কাজ ক'রে দেশকে আর্থনীতিক অনগ্রসরতা থেকে বের করে আনার জন্যে অভাব-অনটন মেনে নিয়েছিল সচেতনভাবে।

কৃষির সমাজতান্ত্রিক পুনঃসংগঠন

ক্ষমতাজয় করার পরে শ্রমিক শ্রেণীকে সেই চিরকেলে কৃষক-সংক্রান্ত প্রশ্নের মীমাংসা করতে হয়।

কৃষককুল সমরূপী নয় — তার এক প্রান্তে গরিব কৃষকেরা, তারা শ্রমিক শ্রেণীর স্বাভাবিক মিত্র, আর অন্য প্রান্তে গ্রামাঞ্চলের বুর্জোয়ারা, কুলাকরা। কৃষককুলের বেশির ভাগ মাঝারি কৃষক। বুর্জোয়াদের উপর বিজয়ের পরে মাঝারি কৃষক সম্বন্ধে শ্রমিক শ্রেণীর কর্মনীতিতে কৃষকের দ্বৈত মনোবৃত্তি লক্ষ্য করা চাই: কৃষক একজন মেহনতী, আবার যে-জমিতে চাষ করে, তার মালিকও। লেনিন লিখেছিলেন, এই পার্থক্যটা সমাজতন্ত্রের একেবারে মর্মবস্তুই। পৃথক-পৃথক ছোট খামারগুলোকে একজোট করে, বৃহদায়তনের বড়-বড় সমাজতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান গড়ে মেহনতী কৃষক জনগণকে সমাজতান্ত্রিক নির্মাণকাজের মধ্যে টেনে আনাটা শ্রমিক শ্রেণীর করণীয় কাজ।

সমবায়গুলি স্থাপন করার ভিত্তিতে কৃষির সমাজতান্ত্রিক রূপান্তরণের কর্মসূচি রচনা করেছিলেন লেনিন। এই রূপান্তরণের প্রধান-প্রধান শর্ত হল শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্ব এবং কৃষিক্ষেত্রে নতুন ধরনের যন্ত্রপাতি যোগান দিতে পারার উপযোগী বৃহদায়তনের শিল্প গড়া। শ্রমিক শ্রেণীর রাজ কায়েম হলে কৃষকদের ক্রমে ক্রমে যৌথ শ্রমে অভ্যস্ত করাতে হয় — সেটা করতে হয় প্রথমে যোগানদার এবং বিপণন সমবায় সমিতিগুলো সংগঠিত করার ভিতর দিয়ে। সমস্ত উপযোগী অবস্থা সৃষ্টি হয়ে গেলেই ইতস্তত বিক্ষিপ্ত পৃথক-পৃথক খামারের জায়গায় আসে বৃহদায়তনের সমাজতান্ত্রিক উৎপাদক সমবায় — যৌথখামার।

লেনিন লিখেছিলেন, কৃষকদের পৃথক-পৃথক খামার থেকে যৌথখামারে যাওয়াটা স্বেচ্ছামূলক হওয়া চাই, ছোট-ছোট ব্যক্তিগত খামারের চেয়ে বৃহদায়তনের সামাজিক উৎপাদনের সুবিধাগুলো সম্বন্ধে তাদের আগে প্রত্যয় আসা চাই। কমিউনিস্ট পার্টি এবং সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের নেতৃত্বের আর সাংগঠনিক ভূমিকা, আর তার সঙ্গে, কৃষকদের যৌথখামারে সম্মিলিত করার ব্যাপারে স্বেচ্ছাক্রিয়তার নীতির যথাযথ প্রতিপালন — এটা কৃষির সমাজতান্ত্রিক পুনঃসংগঠনের কাজে সাফল্যের একটা নিশ্চায়ক।

সোভিয়েত ইউনিয়নে সমাজতান্ত্রিক শিল্পযোজনের প্রথম-প্রথম বড়রকমের সাফল্যগুলি বৃহদায়তনের কৃষি উৎপাদনের পথ প্রস্তুত করেছিল। গ্রামাঞ্চল পেতে থাকল ট্র্যাক্টর, আধুনিক কৃষি যন্ত্রপাতি এবং অন্যান্য সরঞ্জাম। জালের মতো ছড়িয়ে স্থাপন করা হল রাষ্ট্রীয় খামারগুলি আর মেশিন-ট্র্যাক্টর স্টেশনগুলি। কৃষিতে বৃহদায়তনের যন্ত্রসজ্জিত উৎপাদনের সুবিধাগুলোর প্রত্যয়জনক প্রদর্শনী হয়ে উঠল রাষ্ট্রীয় খামারগুলি। রাষ্ট্রের

চালানো মেশিন-ট্র্যাক্টর স্টেশনগুলো হল কৃষি যৌথকরণের এবং যৌথখামারগুলিকে সহায়তা দেবার একটা গুরুত্বপূর্ণ উপায়।

কুলাকের আধিপত্য, শ্রেণীগত স্তরায়ণ, উচ্ছন্ন হওয়া আর গরিবি থেকে গ্রামাঞ্চলকে চিরতরে মুক্ত করে দিল কৃষির যৌথকরণ। গরিব আর মাঝারি কৃষকের বিভাগটা যৌথখামার স্থাপিত হবার ফলে দূর হয়ে গেল। লক্ষ-লক্ষ হতভাগ্য মানুষ কাজের সন্ধানে গ্রাম ছেড়ে শহরে যেতে বাধ্য হত — সেটা বন্ধ হয়ে গেল। বেকারের সংখ্যা বাড়ার একটা প্রধান উৎস বন্ধ হয়ে গেল, — সোভিয়েত ইউনিয়নে চিরকালের জন্যে বেকারি খতম করা হয়েছিল ১৯৩১ সালের মধ্যে।

গ্রামাঞ্চলে সমাজতন্ত্রের বিজয়ের ফলে শহর আর গ্রামাঞ্চলের মধ্যেকার যুগযুগান্তরের বৈপরীত্য দূর হয়ে যায়, শিল্প আর কৃষির পরস্পরের আরও কাছাকাছি এসে যাবার উপযুক্ত অবস্থা সৃষ্টি হয়।

কৃষকদের ইতস্তত বিক্ষিপ্ত ছোট খামারগুলোকে সমাজতান্ত্রিক ধারায় পুনঃসংগঠিত করাটা শ্রমিক শ্রেণী ক্ষমতা দখল করার পরে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সবচেয়ে কঠিন একটা করণীয় কাজ। যারা সমাজতন্ত্র গড়তে লাগে এমন সমস্ত দেশের পক্ষেই এই কাজটা সমাধা করা চূড়ান্ত গুরুত্বসম্পন্ন। লেনিনের সমবায় পরিকল্পনা বাস্তবে রূপায়িত হলে কৃষক-সংক্রান্ত চিরকেলে প্রশ্নটার মীমাংসা হয়ে যায় পুরোপুরি।

সাংস্কৃতিক বিপ্লব

বৃহদায়তনের যন্ত্রশিল্প এবং বৃহদায়তনের সমাজতান্ত্রিক কৃষি সৃষ্টি করা ছাড়াও, সমাজের সমাজতান্ত্রিক রূপান্তরণের জন্যে আরও চাই সংস্কৃতিক্ষেত্রে সুদূরপ্রসারী বিপ্লব।

সর্বসাধারণের মধ্যে সাংস্কৃতিক জোয়ার সমাজতন্ত্র গড়ার জন্যে অবশ্যপ্রয়োজনীয়। বিজ্ঞান আর ইঞ্জিনিয়রিংয়ের সর্বসাম্প্রতিক সাধনসাফল্যগুলোর ভিত্তিতে বৃহদায়তনের সমাজতান্ত্রিক উৎপাদনের জন্যে দক্ষ শ্রমিক, ইঞ্জিনিয়র, টেকনিশিয়ন থাকা চাইই। বিজ্ঞানের উঁচু মাত্রায় বিকাশ ছাড়া শিল্প আর কৃষির দ্রুত বৃদ্ধি এবং অর্থনীতির সমস্ত শাখায় অবিরাম প্রযুক্তিগত অগ্রগতির কথা কল্পনাও করা যায় না।

সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির বাড়বাড়ন্তের জন্যে এইসব অপরিহার্য পূর্বশর্ত সৃষ্টি করে সাংস্কৃতিক বিপ্লবই। মানুষ সমাজের সর্বপ্রধান উৎপাদন-বল, এই মানুষকে সাংস্কৃতিক বিপ্লব বদলে দেয় বলে এটা অর্থনীতির জন্যে চূড়ান্ত গুরুত্বসম্পন্ন। সাংস্কৃতিক বিপ্লব সম্পাদনের ফলে, মানুষের সাধারণ শিক্ষা, সাংস্কৃতিক মান আর প্রযুক্তিগত মান উন্নীত হবার ফলে সমাজজীবনের ব্যবস্থাপনে সক্রিয় অংশগ্রহণে সমস্ত শ্রমজীবী মানুষকে টেনে আনার অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি হয়।

একমাত্র বিজ্ঞানসম্মত দর্শন এবং পৃথিবীতে সবচেয়ে অগ্রসর মতাদর্শ মার্কসবাদ-লেনিনবাদের প্রাধান্য স্থাপিত হয় সমাজের সমাজতান্ত্রিক রূপান্তরণের ফলে। বৈজ্ঞানিক সাধনসাফল্য, প্রকৃতির রহস্যসন্ধান এবং অফুরন্ত প্রাকৃতিক শক্তিগুলোকে আয়ত্ত করার সীমাহীন সম্ভাবনা তুলে ধরে এই মতাদর্শ। বিজ্ঞানের স্ফুরণের উপযোগী অবস্থা সৃষ্টি ক'রে সমাজতন্ত্র বিজ্ঞানকে ক্রমাগত বৃহত্তর ভূমিকায় নিয়ে আসে। রূপে জাতীয় এবং মর্মবস্তুতে সমাজতান্ত্রিক নতুন সংস্কৃতি বিকশিত করার কাজে শামিল হয় সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির সমস্ত জাতি।

সমাজতন্ত্র শ্রমজীবী জনগণের বৈষয়িক নিরাপত্তা সৃষ্টি করে, তাদের জীবনযাত্রার মান সমানে উন্নীত করে চলে, কর্ম-দিনকে কমিয়ে দেয়। যারা পড়াশুনা করার সুযোগ থেকে বঞ্চিত থাকে, এমন কোটি-কোটি মানুষ সংস্কৃতির সক্রিয় স্রষ্টা হয়ে ওঠে সাংকৃতিক বিপ্লবের ফলে। এই সবকিছুর ফলে, সমাজের আত্মিক জীবনের সর্বতোমুখী বিকাশ, বিজ্ঞান, প্রযুক্তিবিদ্যা আর সমস্ত আর্টের স্ফুরণ এবং মানুষের সহজাত প্রতিভা আর সামর্থ্যগুলোর প্রস্ফুটনের অভূতপূর্ব সম্ভাবনা দেখা দেয়।

এইভাবে, সমাজের সমাজতান্ত্রিক রূপান্তরণ কায়িক আর মানসিক শ্রমের মধ্যেকার বৈপরীত্যটাকে দূর করে। এই দুই রকমের শ্রমের মধ্যেকার পার্থক্যটাকে সমানে উৎপাটিত করে চলার আবশ্যক অবস্থা সৃষ্টি করে সমাজতন্ত্র।

সমাজতান্ত্রিক আর্থনীতিক ব্যবস্থার জয়।
অগ্রসর সমাজতান্ত্রিক সমাজ গড়া

দেশের সমাজতান্ত্রিক শিল্পযোজন, কৃষির যৌথকরণ এবং সাংস্কৃতিক বিপ্লব উত্তরণ-কালপর্যায়ের বহু-ক্ষেত্রবিশিষ্ট অর্থনীতিতে মূলগত পরিবর্তন ঘটিয়ে দেয়।

উৎপাদন-বলগুলোর দ্রুত বৃদ্ধির ফলে সমাজতন্ত্রের বৈষয়িক এবং প্রযুক্তিগত ভিত্তি সৃষ্টি হয়। উৎপাদন-সম্পর্কেরও বুনিয়াদী পরিবর্তন ঘটে তারই সঙ্গে সঙ্গে। সমাজতান্ত্রিক ক্ষেত্র সম্প্রসারিত এবং আরও শক্তিশালী হতে থাকে। ক্ষুদ্রায়তনের পণ্যক্ষেত্রটা সমাজতান্ত্রিক ধারায় পুনঃসংগঠিত হয়। পুঁজিতান্ত্রিক উপাদানগুলো ক্রমে উচ্ছেদ হয়ে পরে একেবারেই দূর হয়ে যায়। এইসব প্রক্রিয়ার ফলে

সমগ্র অর্থনীতিতে সমাজতন্ত্রের জয় ষোল-কলা পূর্ণ হয়।

এই শতকের চতুর্থ দশকের দ্বিতীয়ার্ধে অর্থনীতির সমস্ত ক্ষেত্রে সমাজতন্ত্রের জয় হাসিল ক'রে সোভিয়েত জনগণ আরও এগিয়ে গড়ে তুলল অগ্রসর সমাজতান্ত্রিক সমাজ। কমিউনিজমের বৈষয়িক আর টেকনিকাল ভিত্তি গড়ে তোলার যে মহতী করণীয় কাজ সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টি হাতে নিল, সেটা তার ফলে চালু করা সম্ভব হল।

বিভিন্ন দেশে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি গড়ার সাধারণ নিয়মাবলি এবং বৈশিষ্ট্যগুলি

সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশের অভিজ্ঞতার নিরিখে এটা স্পষ্ট যে, সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি গড়াটা সব দেশেরই পক্ষে অভিন্ন সাধারণ নিয়মাবলির বশবর্তী, সমাজতান্ত্রিক সামাজিক সম্পর্কস্থাপনের বিশেষক প্রধান প্রক্রিয়াগুলো তাতে প্রতিফলিত হয়। এর সঙ্গে সঙ্গে, পৃথক-পৃথক দেশে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব এবং সমাজতান্ত্রিক নির্মাণকাজের কিছু কিছু বিশেষ-নির্দিষ্ট উপাদান থাকে — সেগুলি দেখা দেয় প্রত্যেকটা দেশের মূর্ত-নির্দিষ্ট প্রাকৃতিক এবং সামাজিক-ঐতিহাসিক অবস্থা থেকে। এই উপাদানগুলোকে বাড়িয়ে সামনে তুলে ধরা হলে সেটা কার্যত সমাজতান্ত্রিক নির্মাণকাজের সাধারণ নিয়মাবলিকে প্রত্যাখ্যান করা কিংবা অবজ্ঞা করারই শামিল, তাতে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের মূল নীতিগুলিকে লঙ্ঘন করা হয়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তরকালের ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা থেকে ষোল-আনাই প্রমাণিত হয়েছে যে, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের মূল

নিয়মগুলি সমস্ত দেশেরই বেলায় একই — যদিও, প্রত্যেকটা দেশে সমাজতন্ত্রের জন্যে সংগ্রামের কিছু কিছু বিশেষ-নির্দিষ্ট উপাদান থাকতে পারে, সেগুলি দেখা দেয় বিশেষ-বিশেষ জাতীয় এবং ঐতিহাসিক অবস্থা থেকে। সমাজের সমাজতান্ত্রিক পুনঃসংগঠনের কাজে ব্যাপৃত সমস্ত জাতিরই আলোকসংকেত হল সোভিয়েত ইউনিয়নের অভিজ্ঞতা — যে-দেশ সমাজতন্ত্রের পাকা সড়কটা তৈরি করে দিল সর্বপ্রথমে।

অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক মহাবিপ্লব এবং সোভিয়েত ইউনিয়নে সমাজতন্ত্র গড়ার মূল আর মুখ্য অভিজ্ঞতার আন্তর্জাতিক তাৎপর্য একটা প্রকান্ড দেশপুঞ্জে সমাজতান্ত্রিক নির্মাণকাজের প্রক্রিয়ার মধ্যে নিষ্পত্তিমূলকরূপে প্রকটিত হয়েছে, — এই দেশগুলি পুঁজিতন্ত্র ছেড়ে চলে আসে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে। পৃথক-পৃথক দেশে সমাজতন্ত্রের জন্যে সংগ্রামের জাতীয় বৈশিষ্ট্যগুলো যা-ই হোক, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের বুনিয়াদী নিয়মগুলো তাতে বাতিল হয়ে যায় না। এইসব বুনিয়াদী নিয়মের পালটা 'নতুন-নতুন ধাঁচের' সমাজতন্ত্র খাড়া করাবার অর্থ হল সমাজের সমাজতান্ত্রিক রূপান্তরণের বুনিয়াদী পথগুলি থেকে বিচ্যুতি, — সোভিয়েত ইউনিয়নের এবং অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশেরও অভিজ্ঞতা দিয়ে এইসব পথের নির্ভুলতা যাচাই হয়ে গেছে। ঐ পালটা খাড়া করানোটা প্রলেতারীয় আন্তর্জাতিকতার নীতিগুলির বিরোধী, সেটা প্রত্যেক সংশ্লিষ্ট দেশের এবং সমগ্র সমাজতান্ত্রিক বিশ্বব্যবস্থার স্বার্থে আঘাত করে।

চীনা নেতারা নিজেদের একটা কর্মধারা ধরেছেন, সেটা লেনিনবাদের সঙ্গে মোটেই খাপ খায় না, কেননা, তাতে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর বিরুদ্ধে সংগ্রামের এবং কমিউনিস্ট আন্দোলন আর সমগ্র সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলনে ভাঙন

ধরাবার সংকল্প প্রকাশ পেয়েছে। সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ২৪ম কংগ্রেসের সিদ্ধান্তে বলা হয়েছে, মার্কসবাদ-লেনিনবাদের নীতিগুলিকে অবিচলিতভাবে তুলে ধরা, পৃথিবীর কমিউনিস্ট আন্দোলনের ঐক্য বাড়িয়ে তোলা এবং সমাজতন্ত্রের স্বার্থ সুরক্ষিত করাই এই পরিস্থিতিতে একমাত্র সঠিক মতাবস্থান।

সমাজতান্ত্রিক আর্থনীতিক ব্যবস্থা

১। উৎপাদনের উপকরণে সাধারণের মালিকানা। সমাজতন্ত্রের আমলে শ্রমের প্রকৃতি

সাধারণের, সমাজতান্ত্রিক সম্পত্তির প্রাধান্য

প্রত্যেকটা উৎপাদনপ্রণালীতে উৎপাদনের উপকরণে একটা বিশেষ-নির্দিষ্ট রূপের মালিকানা থাকে। সমাজতন্ত্রের আমলে উৎপাদনের উপকরণে একচ্ছত্রকর্তৃত্ব থাকে সাধারণের মালিকানার।

উৎপাদনের উপকরণে ব্যক্তিগত মালিকানা বিলুপ্ত করার ফলে উৎপাদনের উপকরণে সাধারণের মালিকানার প্রাধান্য ঘটে। এটা দেখা দেয় দুটো উপায়ে। এক, সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র বেদখলকারদের বেদখল করে — যা বিজ্ঞানসম্মত কমিউনিজমের প্রতিষ্ঠাতাদের বিবেচনায় ছিল। ভূস্বামীদের ভূমি, পুঁজিপতিদের কল-কারখানা, রেলপথ আর ব্যাঙ্ক বাজেয়াপ্ত করে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র সেগুলিকে করে দেয় সমগ্র জনগণের সম্পত্তি। দুই, কৃষকদের পৃথক-পৃথক খামারগুলোর স্বেচ্ছামিলনের ফলে দেখা দেয় কৃষি উৎপাদকসমষ্টিগুলোর, যৌথখামারগুলোর সমাজতান্ত্রিক সম্পত্তি।

সাধারণ সম্পত্তি দেখা দেয় দুটো উপায়ে — তাই, তার রূপও হয় তদনুসারে দুটো।

সমাজতান্ত্রিক সম্পত্তির দুটো রূপ

সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশের অভিজ্ঞতায় স্পষ্ট দেখা গেছে, উৎপাদনের উপকরণে সাধারণের, সমাজতান্ত্রিক মালিকানার দুটো রূপ আছে। এক, রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি, সেটার মালিক সমগ্র জনগণ, আর দুই, সমবায়ের এবং যৌথখামারের সম্পত্তি। এই দুই রূপের মধ্যে পার্থক্যটা সর্বোপরি পরিপক্কতার মাত্রায়, উৎপাদনের উপকরণ সামাজিকীকরণের পরিসরে।

রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি হল সমগ্র জনগণের সম্পত্তি — জনগণের তরফে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র। সমবায়ের আর যৌথখামারের সম্পত্তি হল শ্রমজীবীদের বিভিন্ন সমষ্টির সম্পত্তি। রাষ্ট্রীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলিতে উৎপাদনের সমস্ত উপকরণই সামাজিকীকৃত। যৌথখামারে উৎপাদনের কেবল প্রধান-প্রধান, নিষ্পত্তিকর উপকরণগুলিই সামাজিকীকৃত, কিন্তু উৎপাদনের কোন-কোন উপকরণ (যৌথখামারের নিয়মাবলিতে নির্দিষ্ট পরিসরে পশুসম্পদ, যৌথখামারীরা তাদের সম্পূরক জমিখণ্ডে যেসব সরঞ্জাম দিয়ে খামার করে) যৌথখামারীদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি।

সমাজতান্ত্রিক সম্পত্তির সর্বোচ্চ রূপ হল রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি, — সমাজতন্ত্র আর কমিউনিজম গড়ার ক্ষেত্রে সেটা প্রধান ভূমিকায় থাকে। রাষ্ট্রীয় সম্পত্তির প্রাধান্য হলে, একমাত্র তখনই সমবায়ের আর যৌথখামারের সম্পত্তি দেখা দিতে পারে। উভয় রূপের সমাজতান্ত্রিক সম্পত্তি গড়ে-বেড়ে ওঠে ঘনিষ্ঠ পরস্পরক্রিয়ার ভিতর দিয়ে।

দুই ধরনের সমাজতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান

সমাজতান্ত্রিক সম্পত্তি হয় দুই রূপের — তাই, সমাজতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানও হয় তদনুযায়ী দুই ধরনের। এই দুই ধরনের প্রতিষ্ঠান হল — এক, বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান: কল-কারখানা, খনি, রেলওয়ে, রাষ্ট্রীয় খামার, বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান, ব্যাঙ্ক এবং জন-উপযোগ, আর, দুই, যেসব প্রতিষ্ঠান সমবায়ের এবং যৌথখামারের সম্পত্তি: যৌথখামার, উৎপাদক এবং ব্যবহারক সমবায়, এগুলির মধ্যে যৌথখামারই মুখ্য।

যৌথখামারগুলি এবং রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলি একই ধরনের সম্পত্তি — দুইই অর্থনীতির সমাজতান্ত্রিক রূপ। তবু, এই দুইয়ের মধ্যে কোন-কোন পার্থক্যও আছে। এইসব পার্থক্য হল প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপন, জাতদ্রব্যের বিলি-বন্দেজ এবং শ্রমিক আর যৌথখামারীরা কীভাবে আয় পায় সেই ব্যাপারে।

রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজার নিযুক্ত করে রাষ্ট্র। রাষ্ট্রের ক্ষমতাসম্পন্ন প্রতিনিধি হয়ে এই ম্যানেজার পরিকল্পনা সংসাধনের জন্যে রাষ্ট্রের কাছে দায়ী থাকে। যৌথখামারে সর্বোচ্চ ব্যবস্থাপক সংস্থা হল সাধারণসভা — সেটা নির্বাচিত করে খামারের বোর্ড এবং সভাপতি।

রাষ্ট্রীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠানের উৎপাদ ষোল-আনাই রাষ্ট্রীয়। রাষ্ট্রের বাঁধা দামে তা বিক্রি হয় বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় সংগঠনের কাছে। যৌথখামারের জাতদ্রব্য সেটার উৎপাদক খামারের সম্পত্তি। রাষ্ট্রের কাছে যতটা বিক্রি করার বাধ্যবাধকতা থাকে, সেটা পালন করার পরে যৌথখামার বাদবাকি উৎপাদের বিলি-বন্দেজ করে তারা যা ভাল মনে করে সেইভাবে, যৌথখামারের সাধারণসভার সিদ্ধান্ত অনুসারে একাংশ বাজারে ছাড়ে, বিভিন্ন তহবিল গড়ে, ইত্যাদি।

শ্রমিক আর যৌথখামারীরা পারিশ্রমিক পায় কাজের পরিমাণ আর গুণ অনুসারে। তবে, শ্রমিক আর আপিস কর্মচারীরা মাইনে পায় রাষ্ট্রীয় মজুরি তহবিল থেকে, আর যৌথখামারীরা পায় তাদের খামারের আয় থেকে। শ্রমিকদের থেকে পৃথক, যৌথখামারীদের আয় আসে যেমন টাকায়, তেমনি জিনিসেও — সেটা খামারের জাতদ্রব্যের একাংশ।

রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান আর যৌথখামারের মধ্যে পার্থক্য যা-ই থাক, দুইই সমাজতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান, এটা চূড়ান্ত গুরুত্বসম্পন্ন। দুইয়েতেই উৎপাদনের উপকরণগুলো সামাজিকীকৃত, তার ফলে মানুষের উপর মানুষের শোষণের সম্ভাবনা রহিত হয়ে যায়। শ্রম যৌথ — তার বাবত পারিশ্রমিক দেওয়া হয় শ্রমের পরিমাণ আর গুণ অনুসারে। সমাজের প্রয়োজনগুলো মেটানোই উৎপাদনের লক্ষ্য।

সমাজতন্ত্রের আমলে ব্যক্তির নিজস্ব সম্পত্তি

উৎপাদনের উপকরণ এবং সামাজিক শ্রমের উৎপাদন, দুইই সমাজতান্ত্রিক সমাজে ষোল-আনা সামাজিকীকৃত। কিন্তু, সামাজিক উৎপাদনের একাংশ সমাজের সদস্যদের মধ্যে ভোগ্য জিনিস হিসেবে বণ্টিত হয়ে সেগুলো ব্যক্তির নিজস্ব সম্পত্তি হয়ে যায়।

ব্যক্তিকে কিংবা তার প্রয়োজনগুলোকে সমাজতন্ত্র খাটো করে দেখে না, গরিবির মধ্যে মানুষের সমতাও আনে না। বরং তার উলটো — ইতিহাসে এই প্রথম, শ্রমজীবী জনগণের প্রয়োজনগুলোকে সর্বতোভাবে মেটাবার উপযোগী অবস্থা সৃষ্টি করে সমাজতন্ত্র। যৌথ শ্রম এবং উৎপাদনের উপকরণে

সাধারণের মালিকানার ফলে জীবনযাত্রার মান উন্নীত হয়, সমস্ত মানুষের নাগালের মধ্যে এনে-দেওয়া সংস্কৃতির স্ফুরণ ঘটে।

সমাজতান্ত্রিক সমাজ মানুষের অর্জন করা আয়টাকে নিরাপদ করে, রক্ষা করে, কিন্তু যারা অপরের শ্রমের উপর দিয়ে চালাতে চায় তাদের বরদাস্ত করে না।

সমাজতান্ত্রিক সমাজের শ্রেণীগত গড়ন

শোষক শ্রেণীগুলো বাদ যাবার ফলে সমাজ হয় দুটো বন্ধু-শ্রেণী নিয়ে — শ্রমিক শ্রেণী আর কৃষককুল। সমাজতান্ত্রিক সমাজে বুদ্ধিজীবিসমাজ শ্রমিক শ্রেণী আর কৃষককুলের সঙ্গে মিলে-মিশে কাজ করে। সঙ্গে সঙ্গে, শ্রমিক শ্রেণী, কৃষককুল আর বুদ্ধিজীবিসমাজের প্রকৃতির বুনিয়াদী পরিবর্তন ঘটে যায়।

সমাজতন্ত্রের আমলে শ্রমিক শ্রেণী আর উৎপাদনের উপকরণ থেকে বঞ্চিত থাকে না। সমাজে নেতৃত্বের ভূমিকায় থাকে এই শ্রেণীই। কৃষকদের জীবন আর শ্রমের ভিত্তি আর নয় পৃথক-পৃথক খুদে খামার আর আদিম ধরনের সরঞ্জাম — সেই ভিত্তিটা হয় যৌথ শ্রম, উৎপাদনের উপকরণে যৌথ মালিকানা এবং আধুনিক যন্ত্রপাতি আর সরঞ্জাম।

শ্রমিক শ্রেণী আর কৃষককুলের মধ্যেকার বুনিয়াদী পার্থক্যটা দূর হয়ে যায় — কেননা, সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি তখন উভয় শ্রেণীরই জীবনোপায়। দুই রূপের সমাজতান্ত্রিক মালিকানার অভিন্ন প্রকৃতি শ্রমিক শ্রেণী আর যৌথখামারীদের কাছাকাছি নিয়ে আসে, তাদের মৈত্রীকে দৃঢ়তর করে, তাদের বন্ধুত্বকে মজবুত করে।

বুদ্ধিজীবিসমাজের গঠনে এবং তার ক্রিয়াকলাপের প্রকৃতিতে মূলগত পরিবর্তন ঘটে। বুদ্ধিজীবীদের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশই শ্রমিক শ্রেণী আর কৃষককুলের মানুষ। সমাজতন্ত্রী বুদ্ধিজীবিসমাজ জনগণের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত, তারা সমাজতন্ত্রের আদর্শের সেবক। শ্রমিক আর কৃষকদের সঙ্গে মিলে তারা সমাজতন্ত্র আর কমিউনিজম গড়ার কাজে সক্রিয়ভাবে শামিল হয়।

শ্রমিক শ্রেণী আর কৃষককুলের মধ্যেকার এবং এই দুটি শ্রেণী আর বুদ্ধিজীবীদের মধ্যেকার পার্থক্যগুলো দূর হয়ে যেতে থাকে। তাদের কাজের পরিবেশে ক্রমে বিভিন্ন অনুরূপ উপাদান দেখা দেয়। শ্রমিক, কৃষক আর বুদ্ধিজীবীদের মৌলিক স্বার্থের অভিন্নতার ফলে প্রতিষ্ঠিত হয় জনগণের অটুট সামাজিক-রাজনীতিক এবং মতাদর্শগত ঐক্য।

সমাজতন্ত্র সাচ্চা গণতন্ত্র বলবৎ করে। সমাজতান্ত্রিক গণতান্ত্রিকতা নিশ্চিত করে রাজনীতিক স্বাধীনতা আর সামাজিক অধিকারগুলি উভয়ই: বক্তৃতা, সংবাদপত্র এবং জনসভাদিসমেত জমায়েতের স্বাধীনতা, নির্বাচন করা এবং নির্বাচিত হবার অধিকার, কাজ, বিশ্রাম আর অবসর, শিক্ষা এবং বৃদ্ধবয়সে আর অসুস্থতা কিংবা কর্মক্ষমতাহানির ক্ষেত্রেও ভরণপোষণের অধিকার। জাতি-নৃকুলনির্বিশেষে সমস্ত নাগরিকের সমান অধিকার সমাজতন্ত্র নিশ্চিত করে, রাষ্ট্রীয় আর্থনীতিক আর সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকলাপের সর্বক্ষেত্রে নারীকে সমস্ত অধিকার দেয় পুরুষের সমপর্যায়ে, ব্যক্তির সাচ্চা স্বাধীনতা নিশ্চিত করে। এই স্বাধীনতার সর্বোচ্চ অভিব্যক্তি হল মানুষের শোষণমুক্তি, তাতে নিশ্চিত হয় সামাজিক ন্যায়পরতা।

সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন-সম্পর্ক এবং উৎপাদন-বলগুলির বিকাশে তার ভূমিকা

উৎপাদনের উপকরণে সামাজিক মালিকানার ফলে দেখা দেয় নতুন ধরনের উৎপাদন-সম্পর্ক, সেটা পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদন-সম্পর্কের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। এটা সমাজের সমান-সমান এবং স্বাধীন মানুষদের মধ্যেকার সম্পর্ক, পরস্পরসহায়তা এবং যৌথ শ্রমে বন্ধুত্বপূর্ণ প্রতিযোগিতার সম্পর্ক।

উৎপাদনের উপকরণে সাধারণের মালিকানা কায়েম ক'রে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব উৎপাদন-বল আর উৎপাদন-সম্পর্কের মধ্যে পুঁজিতন্ত্রের আমলের দ্বন্দ্বটাকে দূর করে দেয়। উৎপাদন-বলগুলোর সর্বোচ্চ মাত্রায় বিকাশের সুযোগ-সম্ভাবনা সৃষ্টি করে সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন-সম্পর্ক। একথা সর্বোপরি প্রযোজ্য সমাজের সর্বপ্রধান উৎপাদন-বল — শ্রমজীবী জনগণ সম্বন্ধে। তাদের সৃজনশীল ক্রিয়াকলাপ প্রবলতর করার এবং কর্মোদ্যম, প্রতিভা আর সামর্থ্যের উন্নতিবিধানের সমস্ত সম্ভাবনাই এসে পড়ে। বিপুলসংখ্যক মানুষের মধ্যে সমাজতান্ত্রিক প্রতিযোগিতা একটা বিপুল চালিকাশক্তি। দৃষ্টান্তের মহাবল অগ্রসর অভিজ্ঞতার দ্রুত প্রসার ঘটায়, পিছিয়ে-পড়া শ্রমিকেরা যাতে সবচেয়ে আগুয়ান শ্রমিকদের নাগাল ধরে ফেলতে পারে, তাতে সহায়ক হয়।

মানুষ আর বৈষয়িক সম্পদ, সমাজের এই দু'রকমেরই উৎপাদনকর সম্পদের সবখানিকেই সবচেয়ে ফলপ্রদ উপায়ে ব্যবহার করা সম্ভব হয় ইতিহাসে এই প্রথম — সেটা সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন-সম্পর্কের কল্যাণে। সমানে দ্রুত উৎপাদনবৃদ্ধি এবং উৎপাদন-বলগুলোর যুক্তিসম্মত বণ্টন সমাজতান্ত্রিক আর্থনীতিক ব্যবস্থার বিশেষক উপাদান।

উৎপাদন-বলগুলোর বিকাশ পুঁজিতন্ত্রের চেয়ে সমাজতন্ত্রের আমলে বেশি দ্রুত ঘটার সুযোগ-সুবিধে থাকে। সোভিয়েত ইউনিয়নে এবং সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার অন্যান্য দেশে উৎপাদনবৃদ্ধির হার পুঁজিতান্ত্রিক দেশগুলির চেয়ে বেশি।

সমাজতন্ত্রের আমলে বিভিন্ন দ্বন্দ্বের উদ্ভব, বিকাশ এবং মীমাংসার ভিতর দিয়েও সামাজিক প্রগতি ঘটে। কিন্তু, দ্বন্দ্বের ভিতর দিয়ে এই বিকাশ উৎপাদন-বলগুলোর উপর কোন ধ্বংসকর প্রভাব বিস্তার করে না। বরং তার উলটো, এর ফলে উৎপাদন-বলগুলোর দ্রুত এবং প্রবল বৃদ্ধিই ঘটে।

লেনিন বলেছিলেন, কমিউনিজমের আমলেও দ্বন্দ্ব থাকে, কিন্তু বৈরিতা আর থাকে না। বৈরিতা হল মীমাংসার-অসাধ্য দ্বন্দ্ব, তার সমাধান হয় শুধু বিপ্লব দিয়ে। বুর্জোয়া সমাজে উৎপাদন-বল আর উৎপাদন-সম্পর্কের মধ্যেকার বৈরিতা ঐরকমেরই দ্বন্দ্ব, — পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদন-সম্পর্কের বৈপ্লবিক দূরীকরণের ফলে, একমাত্র এইভাবেই সেটা বিনষ্ট হয়। বুর্জোয়া আর প্রলেতারিয়েতের মধ্যে বৈরিতা ঐরকমেরই, — সেটা দূর হয় কেবল বিপ্লবের ফলেই, এই বিপ্লব বুর্জোয়াদের শাসন উচ্ছেদ করে এবং শোষক শ্রেণীগুলোকে লোপ করে।

সমাজতান্ত্রিক সমাজে আভ্যন্তরিক দ্বন্দ্বগুলোর প্রকৃতি একেবারে পৃথক। এইসব দ্বন্দ্ব বৈরিতামূলক নয়, — সর্বোচ্চ পর্ব কমিউনিজমের দিকে সমাজতান্ত্রিক সমাজের এগিয়ে চলার ধারায়, উৎপাদন-বলগুলো আর উৎপাদন-সম্পর্ক বিকশিত আর সংহত করার সফল প্রচেষ্টার মধ্যে এইসব দ্বন্দ্বের নিরসন হয়ে যায়।

সমাজতান্ত্রিক সমাজে প্রযুক্তিগত অগ্রগতি

প্রযুক্তিগত অগ্রগতি ত্বরয়িত করার বিপুল সম্ভাবনা সৃষ্টি করে সমাজতন্ত্র। পুঁজিতন্ত্রের আমলে কোন নতুন যন্ত্র বসানো হয় সামাজিক শ্রম বাঁচাবার ব্যবস্থা হিসেবে নয় — শুধু পুঁজিপতির উৎপাদন-পরিব্যয় কমাবার জন্যে।

সমাজতান্ত্রিক আর্থনীতিক ব্যবস্থায়, কোন নতুন সরঞ্জাম সমাজের পক্ষে লাভজনক হলেই, অর্থাৎ, শ্রম বাঁচালে আর লাঘব করলে, সেটা বসানো হয়। সমাজতান্ত্রিক সমাজে নতুন-নতুন সরঞ্জামের ব্যাপক প্রয়োগের ফলে শ্রমিকদের কাজ অপেক্ষাকৃত সহজ হয়, কর্মকাল কমে, সামাজিক সম্পদ বাড়ে। প্রযুক্তিগত অগ্রগতির ফলে শ্রমের উৎপাদিকাশক্তি বেড়ে যায়, সেটা আবার জীবনযাত্রার মান সমানে উন্নীত করে চলার সহায়ক হয়। কাজেই, সমাজতান্ত্রিক সমাজে সমস্ত শ্রমজীবী মানুষই প্রযুক্তি নিখুঁত করে তুলতে বিশেষভাবে আগ্রহশীল। কাজেই, প্রযুক্তিগত অগ্রগতি চাঙ্গা করা এবং উৎপাদনের সংগঠন উন্নীত করার প্রচেষ্টায় তারা শামিল হয় প্রবল উৎসাহ নিয়ে।

তাই বলে, সমাজতান্ত্রিক সমাজে যতখুশি পরিমাণে সরঞ্জাম ব্যবহার করা যায়, তা নয়। কী পরিমাণ সরঞ্জাম চালু করা যেতে পারে, সেটা নির্ভর করে সামাজিক সম্পদের মাত্রার উপর। উৎপাদনের পরিসর, বিজ্ঞান আর প্রযুক্তির বিকাশের মাত্রা এবং সম্প্রসারিত পুনরুৎপাদনের জন্যে সমাজ কী পরিমাণ অর্থ ব্যবহার করতে সমর্থ, তার উপর নির্ভর করে প্রযুক্তিগত অগ্রগতির সুযোগ-সম্ভাবনা।

সামাজিক সম্পদের কোন নির্দিষ্ট মাত্রায় বৈষয়িক আর শ্রম সম্পদ কতখানি যুক্তিসম্মতভাবে ব্যবহৃত হয়, বহুলাংশে তারই উপর নির্ভর করে আরও বৃদ্ধির হার। উৎপাদন-বলগুলোর

বিকাশের হার নির্ভর করে বিনিয়োজিত পুঁজির সবচেয়ে উপযোগী বণ্টন এবং ফলপ্রদতার উপর। সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিতে উৎপাদনবৃদ্ধির যে দ্রুত হারের সম্ভাবনা অন্তর্নিহিত থাকে, সেটা আপনা থেকে হাসিল হয়ে যায় না. সেটা হয় সমাজতন্ত্রের সুবিধাগুলোর উপযুক্ত সদ্ব্যবহারের জন্যে অবিচলিত সংগ্রামের ভিতর দিয়ে।

সমাজতন্ত্রের বৈষয়িক এবং টেকনিকাল বনিয়াদ

প্রত্যেকটা সমাজব্যবস্থার নিজস্ব বৈষয়িক আর টেকনিকাল বনিয়াদ থাকে। যেকোন সমাজের বৈষয়িক আর টেকনিকাল বনিয়াদ বলতে বুঝায়, প্রথমত এবং সর্বোপরি, সেই সমাজের উৎপাদনকর বন্দোবস্তটাকে, অর্থাৎ, মানুষের শ্রমের জন্যে যা মেলে এমন সমস্ত টেকনিকাল সরঞ্জাম। উৎপাদনকর বন্দোবস্তটার বিকাশের মাত্রাটা মানুষের শ্রমশক্তির মাত্রার সঙ্গে এবং উৎপাদন-সম্পর্কের একটা মূর্ত-নির্দিষ্ট ব্যবস্থার সঙ্গেও সরাসরি সংশ্লিষ্ট।

পুঁজিতন্ত্রের বৈষয়িক বনিয়াদের সংজ্ঞা হিসেবে মার্কস বলেছিলেন, সেটা হল বৃহদায়তনের যন্ত্রশিল্প, তার বনিয়াদ হল মজুরি-খাটানো শ্রম। অর্থাৎ কিনা, পুঁজিতন্ত্রের বৈষয়িক বনিয়াদ হল যন্ত্রে-উৎপাদন, যেটা চালু থাকে পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদন-সম্পর্কের কর্তৃত্বে এবং বিকশিত হয় পুঁজিতন্ত্রের আর্থনীতিক নিয়মাবলি অনুসারে।

সমাজতন্ত্রের বৈষয়িক আর টেকনিকাল বনিয়াদ হল শিল্পে, কৃষিতে, নির্মাণে, পরিবহণে এবং অর্থনীতির অন্যান্য ক্ষেত্রে বৃহদায়তনের যন্ত্রে-উৎপাদন। অর্থাৎ কিনা, সমাজতন্ত্রের বৈষয়িক আর টেকনিকাল বনিয়াদ হল অগ্রসর যন্ত্রে-উৎপাদন, যেটা চালু থাকে সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন-সম্পর্কের কর্তৃত্বে

এবং বিকশিত হয় সমাজতন্ত্রের আর্থনীতিক নিয়মাবলি অনুসারে।

বিকশিত এবং উন্নততর হয়ে উঠতে উঠতে সমাজতন্ত্রের বৈষয়িক আর টেকনিকাল বনিয়াদটা হয়ে ওঠে কমিউনিজমের বৈষয়িক আর টেকনিকাল বনিয়াদ।

সমাজতন্ত্রের বৈষয়িক আর টেকনিকাল বনিয়াদ সৃষ্টি করার পূর্বশর্তগুলো দেখা দেয় পুঁজিতন্ত্রের আমলেই, তখন গড়ে ওঠে বৃহদায়তনের যন্ত্রশিল্প। কিন্তু, খাস সমাজতন্ত্রের বৈষয়িক আর টেকনিকাল বনিয়াদ সৃষ্টি হয় সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের জয়ের পরেই। দেশের সমাজতান্ত্রিক শিল্পযোজন আর কৃষির যৌথকরণ আর প্রযুক্তিগত পুনঃসজ্জার ফলে এবং সাংস্কৃতিক বিপ্লব, যা বৈষয়িক উৎপাদনকে প্রবলভাবে চাঙ্গা করে তোলে, তারও ফলে সৃষ্টি হয় ঐ বনিয়াদ।

সমাজতান্ত্রিক নির্মাণকাজের কালপর্যায়ে সোভিয়েত ইউনিয়নের বৈষয়িক আর টেকনিকাল বনিয়াদের বিকাশের বৈশিষ্ট্যই হল অভূতপূর্ব উঁচু মাত্রার সূচকগুলো। বিপ্লবের আগেকার ১৯১৩ সালের সঙ্গে তুলনায় ১৯৪০ এবং ১৯৭২ সাল নাগাত সোভিয়েত ইউনিয়নে শিল্পোৎপাদন বেড়েছিল যথাক্রমে ৭·৭ আর ১০৫ গুণ, জাতীয় আয় বেড়েছিল ৫·৩ আর ৫১ গুণ, অর্থনীতির মূল উৎপাদনকর পরিসম্পৎগুলির উৎপাদন বেড়েছিল ২·৬ আর ২৩ গুণ।

অষ্টম পাঁচসালা পরিকল্পনা কালপর্যায়ে (১৯৬৬—১৯৭০) শিল্পোৎপাদন বেড়েছিল ৫০ শতাংশ। ১৯৭১ সালের মার্চ — এপ্রিল মাসে অনুষ্ঠিত সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ২৪ম কংগ্রেসের নির্দেশনামা অনুসারে এই বৃদ্ধিটা নবম পাঁচসালা পরিকল্পনা কালপর্যায়ে হবে ৪২—৪৬ শতাংশ।

পৃথিবীর মোট শিল্পোৎপাদনের প্রায় ২০ শতাংশ হয় সোভিয়েত ইউনিয়নে; তার জাতীয় সম্পদের পরিমাণ জারতান্ত্রিক রাশিয়ায় যা ছিল তার চেয়ে ১৫ গুণ বেশি। জারতান্ত্রিক রাশিয়ার শিল্পে এক বছরে যে-পরিমাণ উৎপাদন হত, তার চেয়ে বেশি হয় এখন সোভিয়েত শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলিতে পাঁচ দিনে।

আর্থনীতিক বৃদ্ধির চড়া হার একটা বিশেষক উপাদান সোভিয়েত ইউনিয়নেরই শুধু নয়, সেটা সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার অন্যান্য দেশেরও, তারা গড়ে তুলছে সমাজতান্ত্রিক সমাজের বৈষয়িক আর টেকনিকাল বুনিয়াদ।

২। সমাজতন্ত্রের আর্থনীতিক নিয়মাবলি

সমাজতন্ত্রের আর্থনীতিক নিয়মাবলির ক্রিয়াপ্রণালীর বৈশিষ্ট্য

যেকোন সমাজের আর্থনীতিক জীবন বিভিন্ন মূর্ত-নির্দিষ্ট নিয়ম দিয়ে নিয়ন্ত্রিত হয়। এইসব নিয়ম বিষয়গত — এগুলি সক্রিয় থাকে মানুষের ইচ্ছা আর চেতনা থেকে স্বাধীনভাবে। বিভিন্ন ব্যাপার থাকে মানুষের ইচ্ছা আর চেতনা থেকে স্বাধীনভাবে — সেগুলির মধ্যে ভিতরকার সংযোগ প্রকাশ পায় এইসব নিয়মে। তবে, আগেকার সমস্ত রকমের সমাজ থেকে সমাজতন্ত্রের আর্থনীতিক নিয়মাবলির মর্মগত পার্থক্য আছে।

এঙ্গেলস লিখেছিলেন, যেমন পার্থক্য বজ্রের ধ্বংসকর শক্তি এবং টেলিগ্রাফের সরঞ্জামে কিংবা বাতিতে বশ-মেনে সক্রিয় বিদ্যুতের মধ্যে, অগ্নিকাণ্ড আর মানুষের উপকারী অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে, তারই সঙ্গে ঐ পার্থক্যটার তুলনা করা যেতে পারে। বজ্র এবং বাতি জ্বালাবার বিদ্যুৎ, এই দুইই একই প্রাকৃতিক

শক্তি থেকে উৎপন্ন হয়। তবে, বজ্র মানুষকে আঘাত হানে স্বতঃস্ফূর্তভাবে, সেটাকে নিয়ন্ত্রণ করতে সে অপারগ, কিন্তু বিজলীবাতিতে সক্রিয় প্রাকৃতিক শক্তিটাকে মানুষ বুঝে বশে এনেছে।

পুঁজিতন্ত্রের এবং আগেকার সমস্ত রকমের সমাজের আর্থনীতিক নিয়মাবলি সক্রিয় থাকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে। মানুষ সেগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না, ঠিক যেমন নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না বজ্রকে। উৎপাদনের উপকরণে ব্যক্তিগত মালিকানা থাকতে সামাজিক বিকাশের আর্থনীতিক নিয়মাবলিকে সচেতনভাবে ব্যবহার করতে মানুষ অপারগ, — প্রাকৃতিক শক্তিরই মতো এইসব নিয়মের ক্রিয়াপ্রণালী অন্ধ, প্রচণ্ড, ধ্বংসকর।

উৎপাদনের উপকরণে সাধারণের মালিকানার ভিত্তিতে দাঁড়ানো সমাজতন্ত্র অর্থনীতিকে একটা অখণ্ড সমগ্র সত্তায় পরিণত করে। পৃথক-পৃথক প্রত্যেকটা শিল্পপ্রতিষ্ঠানে উৎপাদনেরই মতো সমগ্র আর্থনীতিক উন্নয়ন হয়ে ওঠে সচেতন এবং উদ্দেশ্যানুযায়ী ক্রিয়াকলাপের একটা ক্ষেত্র।

সমাজতন্ত্রের আমলে লোকে বিষয়গত আর্থনীতিক নিয়মগুলোকে বুঝতে শেখে, সমগ্রভাবে সমাজের স্বার্থে আর্থনীতিক উন্নয়নের কাজে সেগুলিকে আয়ত্ত এবং প্রয়োগ করে। সমাজ, সমাজের তরফে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র সমাজতন্ত্রের আর্থনীতিক নিয়মাবলিকে প্রয়োগ করে বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে। সমাজ সেগুলোকে বাগ মানায়, ঠিক যেমন লোকে বিদ্যুৎকে বাগ মানিয়ে জ্বালে বিজলীবাতি।

সোভিয়েত ইউনিয়নে এবং অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি গড়ার ইতিহাস প্রমাণ করেছে, এটা স্বতঃস্ফূর্তভাবে ঘটতে পারে না, — সমাজ এটাকে চালায়

সচেতনভাবে, সমাজতন্ত্রের আর্থনীতিক নিয়মাবলি জেনে সমাজ সেগ্ললোকে প্রয়োগ করে। কার্যক্ষেত্রে জমে-ওঠা অভিজ্ঞতার ফলে এইসব নিয়মকে এমনভাবে প্রয়োগ করা যায়, যাতে সেগ্লি আরও বেশি ফলপ্রস্ হয়। তেমনি, সেগ্লিকে নির্ভুলভাবে প্রয়োগ করলে কার্যক্ষেত্রের বিভিন্ন করণীয় কাজ হাসিল করা যায়, আর সবার অভিন্ন লক্ষ্যের হানি ঘটে সেগ্লিকে লঙ্ঘন করা হলে।

সমাজতান্ত্রিক নির্মাণকাজের মধ্যে সমাজ এই ব্যবস্থার আর্থনীতিক নিয়মাবলি সম্বন্ধে ক্রমাগত গভীরতর জ্ঞানলাভ করে এবং ক্রমাগত অধিকতর মাত্রায় সেগ্লিকে আয়ত্ত করে। মার্কসবাদী-লেনিনবাদী তত্ত্বের জ্ঞানে সজ্জিত কমিউনিস্ট পার্টি সংসাধন করে এই কাজটা। কার্যক্ষেত্রের করণীয় কাজগ্ললোকে সম্পাদন করার সঙ্গে সঙ্গে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পার্টি বৈপ্লবিক তত্ত্বকে আরও বিকশিত করে তোলে।

সমাজতান্ত্রিক উৎপাদনের লক্ষ্য। সমাজতন্ত্রের ম্ল আর্থনীতিক নিয়ম

প্ঁজিতন্ত্র থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের ফলে উৎপাদনের লক্ষ্যটার ব্নিয়াদী পরিবর্তন ঘটে যায়। প্ঁজিতন্ত্রের আমলে মজ্রি দিয়ে খাটানো শ্রম শোষণ ক'রে লাভ উঠানোই উৎপাদনের প্রত্যক্ষ লক্ষ্য।

সমাজতান্ত্রিক সমাজে কোন প্ঁজিপতি থাকে না, মান্ষের উপর মান্ষের শোষণ চলে না। উৎপাদনের উপকরণে যৌথ মালিক শ্রমজীবী জনগণ উৎপাদন করে সমাজের এবং সমাজের সবার প্রয়োজনগ্ললো মেটাবার জন্যে।

সোভিয়েত রাজ কায়েম হবার আগেই লেনিন লিখেছিলেন, উৎপাদনের উপকরণে ব্যক্তিগত মালিকানার জায়গায়

সাধারণের মালিকানা স্থাপন ক'রে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব চালু করে সামাজিক উৎপাদনের পরিকল্পিত সংগঠন, যাতে সমাজের সবারই সমৃদ্ধি এবং সর্বতোমুখী বিকাশ নিশ্চিত হয়। সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির কর্মসূচিতে বলা হয়েছে, সামাজিক উৎপাদন অবিরাম বিকশিত এবং উন্নততর ক'রে ক্রমাগত বেশি পুরোপুরি জনগণের ক্রমবর্ধমান বৈষয়িক আর সাংস্কৃতিক প্রয়োজনগুলো মেটানোই সমাজতন্ত্রের লক্ষ্য। সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির বিপুল পরাক্রমের উৎস, মুক্ত সমাজতান্ত্রিক শ্রমের সৃজনীশক্তির অফুরন্ত উৎসটা রয়েছে সেখানেই।

শ্রমজীবী জনগণের বৈষয়িক কল্যাণ আর সাংস্কৃতিক মান বাড়াবার উদ্দেশ্যেই সমাজতান্ত্রিক সমাজে উৎপাদন সম্প্রসারিত এবং উন্নততর করা হয়। এটাই সমাজতন্ত্রের মূল আর্থনীতিক নিয়মের মর্ম। জনগণের প্রয়োজনগুলোকে ক্রমাগত আরও পুরোপুরি মেটানোর একটা আবশ্যক শর্ত হল সমাজতান্ত্রিক উৎপাদনের সমানে-বৃদ্ধি এবং ধারাবাহিক উন্নতি — সেটা সমাজতান্ত্রিক সমাজের কমিউনিজমের দিকে এগিয়ে চলার ভিত্তি।

৩। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের আর্থনীতিক ভূমিকা

জনগণের ঐতিহাসিক সৃজনশীল ক্রিয়াকলাপের সংগঠক — সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র

সামাজিক বিকাশের বিষয়গত আর্থনীতিক নিয়মাবলির সচেতন প্রয়োগের ভিত্তিতে গড়া সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিতে রাষ্ট্রের ভূমিকা স্বতঃস্ফূর্তভাবে সক্রিয় আর্থনীতিক

নিয়মাবলির নিয়ন্ত্রিত পংজিতান্ত্রিক অর্থনীতিতে রাষ্ট্রের ভূমিকা থেকে মূলগতভাবেই পৃথক।

সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের ফলে উদ্ভূত হয় একেবারে নতুন ধরনের রাষ্ট্র। এই রাষ্ট্রের সামনে এমনসব করণীয় কাজ আসে, যা অন্য কোন রাষ্ট্র কখনও হাতে নেয় নি: একে বিনষ্ট করতে হয় পুরন, সেকেলে পংজিতান্ত্রিক আর্থনীতিক ব্যবস্থাটাকে, শুধু তা নয়, নতুন-নতুন রূপের সামাজিক অর্থনীতিও স্থাপন করতে হয়, গড়তে হয় সমাজতান্ত্রিক আর্থনীতিক ব্যবস্থা।

এইসব করণীয় কাজ সমাধা করার বাস্তব সম্ভাবনা থাকে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের। শোষণের অবসান ঘটিয়ে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র জনগণকে ইতিহাসের সচেতন স্রষ্টায় পরিণত করে — সেটাই এর সৃজনক্ষমতার উৎস। জনগণের ঐতিহাসিক সৃজনশীল ক্রিয়াকলাপের সংগঠক এই রাষ্ট্র সামাজিক রূপান্তরণের মহতী করণীয় কাজগুলি সম্পাদনের জন্যে জনগণের প্রচেষ্টা পরিচালিত করে।

দীর্ঘমেয়াদী এবং চলতি আর্থনীতিক পরিকল্পনা রচনা ক'রে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র সেগুলির সংসাধন এবং সেগুলিকে ছাপিয়ে যাবার ব্যবস্থা করে। পৃথক-পৃথক শিল্পপ্রতিষ্ঠান, প্রতিষ্ঠানজোট আর অর্থনীতির শাখাগুলোর ম্যানেজার নিযুক্ত করে এই রাষ্ট্র, শ্রমিক আর কর্মচারীদের শ্রমের পারিশ্রমিকের রূপ আর নীতি নির্ধারণ করে, শিল্পজাত আর কৃষিজাত উৎপন্নের দাম-সংক্রান্ত মূর্ত-নির্দিষ্ট কর্মনীতি কার্যে পরিণত করে, পরিবহণের মাশুল ধার্য করে। রাষ্ট্রীয় বাজেট হল সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির সর্বপ্রধান আর্থিক পরিকল্পনা — সেটা সমাজের সমগ্র আর্থনীতিক জীবনের পক্ষে নিষ্পত্তিমূলক। বহির্বাণিজ্যে

রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে বৈদেশিক পুঁজির অনুপ্রবেশ আর শোষণের পথে একটা বাধা।

সামাজিক উৎপাদের বণ্টন হল সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের আর-একটা অত্যন্ত গুরুত্বসম্পন্ন কাজ। সমাজতন্ত্রের আমলে সামাজিক উৎপাদের বেশির ভাগটা আসে রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে; অর্থনীতির সমস্ত শাখায় ব্যবহারের ফলে নিঃশেষ হয়ে যাওয়া উৎপাদনের উপকরণের সাধারণ পুনঃস্থাপনা এবং উৎপাদন সম্প্রসারণের জন্যে অত্যাবশ্যক সমাজতান্ত্রিক সঞ্চয়নের ব্যবস্থা করে এই রাষ্ট্র। বিশেষভাবে রচিত ব্যবস্থাবলি বলবৎ ক'রে এই রাষ্ট্র জাতীয় আয়ের বণ্টন এমনভাবে করে, যাতে জনগণের কল্যাণ বেড়ে চলে এবং সূক্ষ্ম-জটিল সব সরঞ্জামের ভিত্তিতে উৎপাদনের বৃদ্ধি আর উন্নতি ঘটে সমানে।

সমাজতান্ত্রিক সমাজের অস্তিত্ব আর বিকাশের সময়ে পুঁজিতান্ত্রিক দেশগুলিতে সাম্রাজ্যবাদের আক্রমণমুখী শক্তিগুলো এখনও বজায় রয়েছে। তার মানে হল, সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির প্রতিরক্ষাক্ষমতা সংগঠিত এবং বজায় রাখতে হয়।

সমাজতান্ত্রিক বিশ্বব্যবস্থার ঐক্য আর সংহতি শক্তিশালী করাটা সমস্ত সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সবচেয়ে গুরুত্বসম্পন্ন করণীয় কাজ।

কমিউনিস্ট পার্টি এবং সোভিয়েত রাষ্ট্রের আর্থনীতিক কর্মনীতির বিজ্ঞানসম্মত ভিত্তি

কমিউনিস্ট পার্টির আর্থনীতিক কর্মনীতি তার সাধারণ কর্মনীতিরই মতো বিকশিত হয় মার্কসবাদী-লেনিনবাদী তত্ত্বের ভিত্তিতে, এই তত্ত্ব খুলে ধরে সামাজিক বিকাশের

বিষয়গত নিয়মগ্নলিকে এবং, বিশেষত, সমাজতন্ত্রের বিষয়গত আর্থনীতিক নিয়মগ্নলিকে।

কমিউনিস্ট পার্টির বহ্নম্নখী রাজনীতিক ক্রিয়াকলাপের মধ্যে আর্থনীতিক কর্মনীতি সংগত কারণেই থাকে একটা কেন্দ্রী অবস্থানে। সমাজতান্ত্রিক সমাজে উৎপাদন-বল এবং উৎপাদন-সম্পর্ককে বিকশিত করা এর উদ্দেশ্য। পার্টির সমগ্র কর্মনীতিতে এবং, বিশেষত, তার আর্থনীতিক কর্মনীতিতে প্রতিফলিত হয় সোভিয়েত জনগণের চ্ড়ান্ত গ্নর্ত্বসম্পন্ন স্বার্থ। এখনকার অগ্রগতি যাতে ভবিষ্যতে আরও বিরাট অগ্রগতির ভিত্তিস্থাপন করে, এখনকার লক্ষ্যগ্নলিকে যাতে ভবিষ্যতের লক্ষ্যের জন্যে বিসর্জন করতে না হয় কিংবা তার উলটোটাও না হয়, সেটা নিশ্চিত করেই রচিত হয় কমিউনিস্ট পার্টির দ্রদর্শী কর্মনীতি। এই দৃষ্টিভঙ্গি অন্সারেই পার্টি আর্থনীতিক উন্নয়নের বিভিন্ন ম্ল সমস্যার নিরসন করে, যেমন, সমগ্র অর্থনীতি এবং তার পৃথক-পৃথক শাখার বৃদ্ধির হার ধার্য করা, সামাজিক উৎপাদনে বিভিন্ন শাখার মধ্যে অন্পাত বেঁধে দেওয়া, প্রযুক্তিগত অগ্রগতির পথ নির্ধারণ করা এবং জীবনযাত্রার মান উন্নীত করার কাজ পরিচালনা করা।

জনস্বার্থ এবং সেই স্বার্থের প্রকাশক কমিউনিস্ট পার্টির কর্মনীতি সামাজিক বিকাশের বিষয়গত ধারাগ্নলোর সঙ্গে সম্প্র্ণভাবে মিলে যায়। জয়য্নক্ত সমাজতন্ত্র কমিউনিজমের দিকে অগ্রসর হয় সামাজিক বিকাশের বিষয়গত নিয়মাবলি অন্সারে, — সেই দিকে দেশের অগ্রগতি নিশ্চিত করাই পার্টির কর্মনীতির লক্ষ্য।

সমাজতন্ত্র আর কমিউনিজম গড়ার কাজের প্রত্যেকটা পর্বে পার্টি বাস্তবতার সর্বাঙ্গীণ বিশ্লেষণের ভিত্তিতে,

পরিবর্তনশীল আভ্যন্তরিক আর বহিস্থ অবস্থার সঙ্গে সংগতি রেখে আশু করণীয় কাজগুলো স্থির করে। আর্থনীতিক আর রাজনীতিক কাজগুলোর মধ্যেকার পরস্পরসম্পর্ক সম্বন্ধে, সমাজতন্ত্র আর কমিউনিজম গড়ার কাজের প্রক্রিয়ার মধ্যে অর্থনীতি আর রাজনীতির ঐক্য সম্বন্ধে লেনিনীয় কর্মবিধি অনুসারে পার্টি ঐ কাজ করে।

সমাজতান্ত্রিক আর্থনীতিক ব্যবস্থাপনে লেনিনীয় নীতি

রাশিয়ায় সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের জয়ের ঠিক পরেই লেনিন বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে বলেছিলেন, কোটি-কোটি মানুষের জীবনযাত্রার জন্যে অত্যাবশ্যক উৎপন্নগুলোর পরিকল্পিত উৎপাদন আর বণ্টনের নিয়ামক নতুন জটিল আর সূক্ষ্ম সাংগঠনিক সম্পর্কগুলোকে সৃষ্টি করাই সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে জয়যুক্ত শ্রমিক শ্রেণীর মুখ্য করণীয় কাজ। লেনিন লিখেছিলেন, বুর্জোয়াদের উপর রাজনীতিক বিজয় সাধিত এবং মজবুত হলে অর্থনীতির সংগঠনেও অনুরূপ জয়লাভ করা চাই।

গোটা আর্থনীতিক বন্দোবস্তটার সুষ্ঠু এবং সুফলপ্রদ পরিচালনার দায়িত্ব সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির ব্যবস্থাপন কর্তৃপক্ষের উপর। সমগ্র যৌগিক অর্থনীতির কাজ চলা চাই ঘড়িরই মতো, এটা নিশ্চিত করা চাই। গুণগত আর পরিমাণগত, দুদিক দিয়েই সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে, উৎপাদন-প্রক্রিয়াগুলো আরও জটিল হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে পৃথক-পৃথক শিল্পপ্রতিষ্ঠানে এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, শাখা আর আর্থনীতিক এলাকার মধ্যেও পারস্পরিক যোগসূত্র এবং

নির্ভরশীলতা ক্রমাগত বেশি জটিল হয়ে ওঠে। এই অবস্থায় আর্থনীতিক ব্যবস্থাপনের সুদক্ষ সংগঠন ক্রমবর্ধমান গুরুত্বসম্পন্ন হয়ে ওঠে।

আর্থনীতিক ব্যবস্থাপনের প্রণালীগুলোকে উন্নততর করে তুলতে গিয়ে কমিউনিস্ট পার্টি প্রয়োগ করে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনের লেনিনীয় নীতিগুলি — সেগুলির শক্তি আর কর্মক্ষমতা প্রমাণিত হয়েছে কার্যক্ষেত্রেই। সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির প্রসার, তার বৃদ্ধিশক্তির উন্নতি এবং তার কাজগুলো আরও জটিল হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে, সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির সিদ্ধান্ত অনুসারে এই নীতিগুলিকে বিকশিত এবং সমৃদ্ধ করে তোলা হয়।

সমাজতান্ত্রিক আর্থনীতিক ব্যবস্থাপনের ভিত্তি হল গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতা, তাতে একজনের ব্যবস্থাপনের নীতিটাকে যথাযথভাবে প্রতিপালন করা চাই, আর তার সঙ্গে যুক্ত হওয়া চাই উৎপাদন-প্রক্রিয়ার প্রত্যেকটা গ্রন্থিতে আর্থনীতিক ব্যবস্থাপনে শ্রমিক আর কর্মচারী জনগণের ব্যাপক অংশগ্রহণ। এর ফলে লক্ষ্য ও সঙ্কল্পের ঐক্যের সঙ্গে শ্রমজীবী জনগণের সৃজনশক্তি আর উদ্যমের জন্যে ব্যাপক বিকাশের সম্ভাবনার সংযোগ নিশ্চিত হয়, যা না থাকলে বৃহদায়তনের উৎপাদন, উঁচু মাত্রায় উন্নীত আধুনিক আর্থনীতিক বন্দোবস্তের কাজ সাধারণ-স্বাভাবিকভাবে চলতে পারত না।

আর্থনীতিক ব্যবস্থাপন আর নিয়ন্ত্রণের গণতান্ত্রিক নীতিগুলির বৃদ্ধি আর প্রসার সমাজতান্ত্রিক সমাজের সবচেয়ে গুরুত্বসম্পন্ন প্রয়োজনগুলোর একটা, এই সমাজের একটা বিষয়গত নিয়ম। সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির বিকাশের

সঙ্গে সঙ্গে, এই অর্থনীতির করণীয় কাজগুলো সম্প্রসারিত এবং আরও জটিল হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে, আর্থনীতিক ক্রিয়াকলাপের গণতান্ত্রিক ভিত্তিটার বিকাশের প্রয়োজন বাড়ে, সেটা ক্রমাগত বেশি অত্যাবশ্যক হয়ে ওঠে।

লেনিন সজোরে হুঁশিয়ারি জানিয়েছিলেন, গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার নীতিকে বিপন্ন করে দুটো জিনিস: এক, গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার আমলাতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতায় পর্যবসিত হওয়া, এবং দুই, হরেকরকমের সংকীর্ণতা কিংবা অরাজকতার ঝোঁকের দরুন কেন্দ্রিকতা লঙ্ঘন।

গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার নীতিদুটোর একই সঙ্গে বিকাশের ফলে আর্থনীতিক ব্যবস্থাপন আর নিয়ন্ত্রণের উন্নতি হয় আরও বেশি। এই নীতিদুটো হল ব্যবস্থাপনের গণতন্ত্রীকরণ এবং পরিচালনার কেন্দ্রীভূতকরণ — এই দুইয়ের সঠিক সংযুক্তি সমাজতন্ত্র আর কমিউনিজমের আর্থনীতিক নির্মাণকাজের বিজ্ঞানসম্মত ব্যবস্থাপনের জন্যে চূড়ান্ত গুরুত্বসম্পন্ন।

কমিউনিস্ট পার্টি এবং সোভিয়েত রাষ্ট্র আর্থনীতিক ব্যবস্থাপনে যেসব উন্নতি ঘটিয়েছে এবং ঘটাচ্ছে, সেগুলি সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনের বহুকাল-যাবত-পরীক্ষিত বিভিন্ন লেনিনীয় নীতির আরও বিকশিত রূপ — ঐসব নীতি হল, যেমন, গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতা, সমাজতান্ত্রিক পরিব্যয় হিসাবরক্ষণ, কাজে নীতিগত আর বৈষয়িক প্রবর্তনার সমন্বয়। এই লেনিনীয় নীতিগুলিতে প্রকাশ পায় সমাজতন্ত্রের বিষয়গত নিয়মাবলি। সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনপ্রণালীগুলির উন্নতি থেকে দেখা যাচ্ছে, এইসব নিয়মের আরও সার্থক আত্তীকরণ হয়েছে, সেগুলিকে সমাজের স্বার্থে আরও সুদক্ষভাবে প্রয়োগ করা হচ্ছে।

সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির পরিকল্পিত উন্নয়ন

১। পরিকল্পিত আর্থনীতিক সংগঠন আর ব্যবস্থাপন — এটা সমাজতন্ত্রের মুখ্য সুবিধা

সমাজতন্ত্রের আমলে পরিকল্পিত আর্থনীতিক ব্যবস্থাপনের সম্ভাব্যতা এবং প্রয়োজন

আগেই দেখা গেছে, পুঁজিতান্ত্রিক অর্থনীতিতে সামাজিক উৎপাদনের বিভিন্ন উপাদানের মধ্যেকার প্রয়োজনীয় অনুপাতগুলো স্থাপিত হয় স্বতঃস্ফূর্তভাবে — বহু ওঠানামা আর বিচ্যুতির ভিতর দিয়ে। এর ফলে, প্রতিদ্বন্দ্বিতা, সংকট এবং বেকারির ভিতর দিয়ে বিপুল পরিমাণ উৎপাদন-বল বিনষ্ট হয়। এটাই উৎপাদনে অরাজকতার মর্ম, এই অরাজকতা পুঁজিতন্ত্রের আমলে অনিবার্য।

উৎপাদনে অরাজকতা আসে পুঁজিতন্ত্রের মূল দ্বন্দ্ব থেকে — সেটা হল উৎপাদনের সামাজিক প্রকৃতি এবং আত্মসাৎ করার ব্যক্তিগত পুঁজিতান্ত্রিক ধরনের মধ্যেকার দ্বন্দ্ব। সমাজতন্ত্র এই দ্বন্দ্বটাকে দূর করে দেয়। সমাজতান্ত্রিক সমাজে উৎপাদনের উপকরণের উপর এবং তার ফলে উৎপাদনের ফলের উপর সামাজিক মালিকানা উৎপাদনের সামাজিক প্রকৃতির সঙ্গে খাপ খায়।

সমাজতান্ত্রিক সমাজের সাধারণ রূপরেখা তুলে ধরতে গিয়ে মার্কস এবং এঙ্গেলস ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন,

সমাজতন্ত্রের আমলে উৎপাদনে অরাজকতার জায়গায় আসবে সামাজিক উৎপাদন, যা পরিকল্পনা অনুসারে সংগঠিত এবং সমগ্রভাবে সমাজের আর সমাজের সবারই প্রয়োজনগুলো মেটাবার উপযোগী। লেনিন বলেছিলেন, রাষ্ট্রের গোটা আর্থনীতিক বন্দোবস্তটাকে এমন একটা কার্যকর যন্ত্রে রূপান্তরিত করতে হবে, যা একটা অখন্ড পরিকল্পনা অনুসারে কোটি-কোটি মানুষের কাজ পরিচালিত করতে সক্ষম, এই বিশাল করণীয় কাজটাকে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সমাধা করা চাই।

উৎপাদনে অরাজকতা ছাড়া পুঁজিতন্ত্র — এ তো কল্পনাই করা যায় না, ঠিক তেমনি, সমগ্র অর্থনীতির পরিকল্পিত উন্নয়ন ছাড়া সমাজতন্ত্র কল্পনাতীত। পরিকল্পিত আর্থনীতিক ব্যবস্থাপন সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির একটা মূল উপাদান। সমাজতন্ত্রের আমলে সামাজিক সম্পদ বাড়ানো এবং জীবনযাত্রার আর সাংস্কৃতিক মান সমানে উন্নীত করে চলার জন্যে আর্থনীতিক ক্রিয়াকলাপ পরিচালিত হয় একটা অখন্ড আর্থনীতিক পরিকল্পনার কাঠামের মধ্যে। বিভিন্ন সমাজতান্ত্রিক দেশের মধ্যে আর্থনীতিক সহযোগিতাও চলে পরিকল্পনা অনুসারে।

সমস্ত রাষ্ট্রীয় এবং সমবায় প্রতিষ্ঠান চালানো হয় পরিকল্পিত ভিত্তিতে। রাষ্ট্রীয় আর্থনীতিক উন্নয়ন পরিকল্পনায় সামাজিক পরিসরে জাতদ্রব্যের উৎপাদন আর বণ্টন একটা অখন্ড ব্যবস্থায় একজোট করা হয়। শিল্প, কৃষি, পরিবহণ, নির্মাণ আর বাণিজ্যের সংগঠনগুলোই শুধু নয়, বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠান, সাংস্কৃতিক, শিক্ষা আর চিকিৎসা সংস্থাগুলিরও কাজ চলে পরিকল্পনা অনুসারে। সমাজতান্ত্রিক সমাজে সমগ্র আর্থনীতিক আর সাংস্কৃতিক

উন্নয়নের ক্ষেত্রে এবং সমাজতন্ত্র আর কমিউনিজম গড়ার কাজের গোটা বিশাল প্রক্রিয়ায় লক্ষ্য আর সংকল্পের ঐক্য নিশ্চিত করার উপযোগী করে পরিকল্পনা রচিত হয়।

অর্থাৎ কিনা, পরিকল্পিত আর্থনীতিক ব্যবস্থাপনকে সম্ভাবনীয় এবং আবশ্যক করে তোলে সমাজতন্ত্র। আর্থনীতিক পরিকল্পন সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির একটা সহজাত উপাদান, সাধারণের সম্পত্তি তার বনিয়াদ, তাতে মানুষের উপর মানুষের শোষণের কোন স্থান নেই, সমাজের প্রয়োজনগুলো মেটানোই তার একমাত্র উদ্দেশ্য, সেটা গড়ে-বেড়ে চলে বিষয়গত আর্থনীতিক নিয়মাবলি অনুসারে, সেইসব নিয়ম উপলব্ধি করে সমাজ সেগুলিকে প্রয়োগ করে সমাজতন্ত্র এবং কমিউনিজম গড়ার কাজে।

পরিকল্পিত, সমানুপাতিক উন্নয়নের নিয়ম

অর্থনীতির পরিকল্পিত, সমানুপাতিক উন্নয়ন সমাজতন্ত্রের একটা বিষয়গত আর্থনীতিক নিয়ম। এই নিয়ম প্রয়োগ ক'রে সমাজতান্ত্রিক সমাজ অর্থনীতির পরিচালনে ক্রমাগত বেশি সাফল্যলাভ করে।

সমগ্র অর্থনীতির পরিকল্পিত সংগঠনের প্রয়োজনটা প্রকাশ পায় পরিকল্পিত সমানুপাতিক উন্নয়নের নিয়মে। এ একটা নতুন করণীয় কাজ — এটা দেখা দেয় কেবল সমাজতান্ত্রিক সমাজেই। উৎপাদনের উপকরণে ব্যক্তিগত মালিকানার ভিত্তিতে দাঁড়ানো পুঁজিতান্ত্রিক সমাজে আর্থনীতিক ব্যবস্থাপন থাকে কেবল পৃথক-পৃথক শিল্পপ্রতিষ্ঠান, কারবার আর কনসার্নের কাঠামের ভিতরেই। বুর্জোয়া রাষ্ট্রে, বিশেষত সমসাময়িক অবস্থায়, আর্থনীতিক

উন্নয়নে পরিকল্পনের কিছু-কিছু উপাদান চালু করতে চেষ্টা করে বটে, কিন্তু পুঁজিতন্ত্রের আমলে অর্থনীতি সমগ্রভাবে ব্যবস্থাপনের অসাধ্যই থাকে — থেকে যায় পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদনপ্রণালীর স্বতঃস্ফূর্ত নিয়মগুলোর আয়ত্তে। পুঁজিতান্ত্রিক ব্যক্তিগত সম্পত্তির সংকীর্ণ গণ্ডি সমগ্র অর্থনীতির পরিকল্পিত সংগঠন চালু হতে দেয় না।

আর্থনীতিক পরিকল্পন অবিরাম উন্নীত করার ভিতর দিয়ে সমাজতন্ত্রের আমলে অর্থনীতির পরিকল্পিত সমানুপাতিক উন্নয়নের নিয়ম ক্রমাগত বেশি মাত্রায় আয়ত্ত হয়। পরিকল্পিত, সমানুপাতিক উন্নয়নের নিয়ম যাতে সক্রিয় রাখার ব্যবস্থাবলির সমষ্টিটা নিয়ে পরিকল্পিত ব্যবস্থাপন, সেটার অবলম্বন হল সমাজতন্ত্রের বিষয়গত আর্থনীতিক নিয়মাবলি। আর্থনীতিক সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে খামখেয়ালীপনা পরিকল্পনের সঙ্গে একেবারেই অচল।

অর্থনীতি, তার চালিকাশক্তিগুলি এবং বিভিন্ন প্রবণতা বিকাশের বিষয়গত অবস্থাগুলির যথাযথ মূল্যায়ন আর্থনীতিক পরিকল্পনের ভিত্তি। পরিকল্পনায় সমাজতন্ত্রের বিষয়গত অবস্থা এবং আর্থনীতিক নিয়মগুলি যত বেশি আদ্যোপান্ত বিবেচিত হয়, পরিকল্পনার সংসাধন ততই বেশি সাফল্যমণ্ডিত হয়। বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে সামাজিক প্রয়োজনগুলো নির্ধারণ করা এবং উৎপাদনকর সংগতি-সংস্থান আর সংরক্ষিত ক্ষমতার বিষয়গত মূল্যায়ন সমাজতান্ত্রিক পরিকল্পনার ভিত্তি। অর্থনীতি উন্নয়নের সবচেয়ে ফলপ্রদ উপায়াদি এতে দেখানো হয়।

জাতীয় অর্থনীতিতে আবশ্যক অনুপাতগুলোকে পরিকল্পিতভাবে স্থাপন করা একটা নতুন করণীয় কাজ —

এটা সামনে এসে গেছে কেবল সমাজতন্ত্র কায়েম হবার পরে। আর্থনীতিক পরিকল্পনপ্রণালীগুলোর উন্নতিবিধান ক'রে সমাজতান্ত্রিক সমাজ বেশি সাফল্যের সঙ্গে এই কাজ সমাধা করে। কিন্তু, এটা একটা অসাধারণ রকমের কঠিন কাজ বলে কোন-কোন আর্থনীতিক অনুপাত কখনও সাময়িকভাবে লঙ্ঘিত হতেও পারে। সেক্ষেত্রে, উদ্ভূত অসামঞ্জস্যটাকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ধরে ফেলে তার প্রতিকারের কার্যকর ব্যবস্থা করা অর্থনীতির পরিকল্পিত ব্যবস্থাপনের দায়িত্ব।

সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিতে উঁচু মাত্রার এবং সুস্থিত বৃদ্ধির হার নিশ্চিত করার জন্যে উৎপাদনের উন্নতিশীল শাখাগুলোকে অগ্রাধিকার দিয়ে আর্থনীতিক গঠনটাকে বদলে ফেলা চূড়ান্ত গুরুত্বসম্পন্ন। পরিকল্পিত, সমানুপাতিক আর্থনীতিক উন্নয়ন এবং কমিউনিজমের বৈষয়িক আর টেকনিকাল বনিয়াদ গড়ার জন্যে সামাজিক উৎপাদনের গঠনটাকে সমানে উন্নততর করে চলা একটা বিশেষ করণীয় কাজ।

শ্রমে মিতব্যয়িতার নিয়ম

সতর্ক ব্যবস্থাপন ছাড়া পরিকল্পিত আর্থনীতিক উন্নয়নের কথা চিন্তাই করা যায় না। মিতব্যয়িতার প্রয়োজন এবং তার সম্ভাবনীয়তা আসছে সমাজতান্ত্রিক আর্থনীতিক ব্যবস্থার প্রকৃতি থেকেই। সমাজতান্ত্রিক উৎপাদনের লক্ষ্যই এই প্রয়োজনটা ঘটাচ্ছে — এই লক্ষ্যটা হল সামাজিক প্রয়োজনগুলো মেটানো। এটা সম্ভবপর, তার কারণ, সমাজতন্ত্রে উৎপাদনের অরাজকতা, ধ্বংসকর প্রতিদ্বন্দ্বিতা, আর্থনীতিক সংকট আর বেকারির কোন স্থান নেই,

পংজিতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিশেষক আরোগ্যের অতীত অন্যান্য ব্যাধিরও স্থান নেই।

সমাজতন্ত্রের আমলের জন্যে শ্রমে মিতব্যয়িতার অতি গুরুত্বপূর্ণ নীতিটির কথা বিশেষ জোর দিয়ে বলে গেছেন মার্কসবাদ-লেনিনবাদের প্রতিষ্ঠাতারা। লেনিন দৃঢ়ভাবে বলতেন ব্যয়সংকোচের কথা। তিনি বলতেন, টাকা-পয়সার অপব্যয় চলবে না, সমাজতান্ত্রিক সমাজে অপচয় বরদাস্ত করা যায় না। মার্কসের মতো তিনিও সমাজতান্ত্রিক নির্মাণকাজের সমগ্র প্রক্রিয়াটার পরিকল্পিত ব্যবস্থাপনের সঙ্গে মিতব্যয়িতাকে যুক্ত করে দেখিয়েছেন। সর্বনিম্ন পরিমাণে ব্যয় করে সমাজকল্যাণের জন্যে সর্বাধিক পরিমাণ ফললাভ করাটা সমাজতান্ত্রিক সমাজে আর্থনীতিক উন্নয়নের একটা অপরিবর্তনীয় নিয়ম।

সমাজতান্ত্রিক সমাজে প্রধান-প্রধান অনুপাত

সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির পরিকল্পনে সমগ্রভাবে অর্থনীতির প্রধান-প্রধান অঙ্গ আর গ্রন্থিগুলোর মধ্যে প্রয়োজনীয় পরিমাণগত অনুপাত নিশ্চিত হওয়া চাইই।

অর্থনীতিতে প্রধান-প্রধান অনুপাত হল প্রধান ক্ষেত্রগুলির মধ্যেকার অনুপাত, অর্থাৎ, শিল্প, কৃষি আর পরিবহণের উন্নয়নের মধ্যেকার অনুপাত। উৎপাদনের উপকরণ উৎপাদন এবং ভোগ্য পণ্য উৎপাদনের মধ্যেকার অনুপাতও খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

শিল্প আর কৃষির উৎপাদনসমষ্টি হল ভোগ-ব্যবহার এবং সঞ্চয়নের উপায়-উপকরণের একটা উৎস। ভোগ-ব্যবহার আর সঞ্চয়নের মধ্যেকার অনুপাতও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ

আর্থনীতিক অনুপাতগুলোর একটা, সেটাকে সমাজতান্ত্রিক সমাজে স্থাপন করে বজায় রাখা হয় পরিকল্পনা অনুসারে।

অর্থনীতির সাধারণ-স্বাভাবিক বিকাশের জন্যে উৎপাদন আর বিক্রয়ের মধ্যে অনুরূপতা থাকা আবশ্যক। অর্থাৎ কিনা, জনসাধারণের ক্রয়ক্ষমতা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে, বিক্রির জন্যে ছাড়া জিনিসের পরিমাণেরও অনুরূপ বৃদ্ধি আবশ্যক। রাষ্ট্রের ব্যয় এবং রাজস্বের মধ্যেও মূর্ত-নির্দিষ্ট অনুপাত থাকা চাই।

উৎপাদনের গঠনেই শুধু নয়, শ্রম-বল কাজে লাগাবার বেলায়ও নির্দিষ্ট অনুপাত বজায় রাখা অত্যাবশ্যক।

আন্তঃএলাকা অনুপাতগুলোও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। দেশের সমস্ত আর্থনীতিক এলাকার দ্রুত উন্নয়ন এবং উৎপাদন-বলগুলোর যুক্তিসম্মত বণ্টন নিশ্চিত করে সমাজতন্ত্র। প্রত্যেকটা এলাকার সর্বাঙ্গীণ উন্নয়ন চলে তার প্রাকৃতিক সম্পদ অনুসারে বিশেষীকরণের সঙ্গে সঙ্গে। বিশেষীকরণের ফলে বিভিন্ন আন্তঃএলাকা গাঁটছড়া গড়ে তোলার প্রয়োজন দেখা দেয়, সেটা ক্রমাগত বেশি পরিমাণে নানারূপী হয়ে উঠতে থাকে।

জাতীয় অর্থনীতিতে বিভিন্ন ভারসাম্য

জাতীয় আর্থনীতিক ভারসাম্যগুলোর ভিত্তিতে পরিকল্পনার অঙ্গ-উপাদানগুলোর সমন্বয় সমাজতান্ত্রিক পরিকল্পনের একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক। মূল ভারসাম্যগুলোর মধ্যে পড়ে — জাতীয় আয় এবং সেটা কাজে লাগানোর মধ্যে ভারসাম্য; শ্রম-বল এবং সেটাকে কাজে লাগানোর মধ্যে ভারসাম্য — সেটা বিশেষত বিভিন্ন আর্থনীতিক এলাকা অনুসারে নির্ধারণ করা; জনসমষ্টির নগদ আয় এবং ব্যয়ের মধ্যে ভারসাম্য; আর্থিক সংস্থান এবং প্রধান-প্রধান বৈষয়িক

সম্বল-সংগতির মধ্যে ভারসাম্য। জাতীয় অর্থনীতিতে সঠিক অনুপাত আর সম্পর্ক স্থাপনের প্রধান শর্ত হল বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে প্রস্তুত-করা ভারসাম্য ব্যবস্থা সৃষ্টি করা।

জাতীয় আয় এবং তার বণ্টনের মধ্যেকার ভারসাম্যে ফুটে ওঠে জাতীয় আয়ের প্রধান দুটো অঙ্গ-উপাদানে — ভোগ-ব্যবহার আর সঞ্চয়নে — ঐ আয়ের বিভাগটা। কত শ্রম-বল প্রয়োজন এবং শ্রম-বলের এইসব প্রয়োজন মেটাবার প্রণালী নির্ধারণ করতে সহায়ক হয় শ্রম-বলের ভারসাম্য।

জনসমষ্টির নগদ আয় আর ব্যয়ের মধ্যেকার ভারসাম্যে বিবেচনায় রাখা হয়, একদিকে, শ্রমিক আর কর্মচারীদের মজুরি, যৌথখামারীদের আয়, পেনশন এবং জনসমষ্টির অন্যান্য নগদ আয়, এবং অন্যদিকে, জনসমষ্টির কাছে যা বিক্রি করা যেতে পারে এমনসব জিনিস আর সেবাকার্যের পরিব্যয় এবং সমস্ত রকমের দেওন বাবত জনসমষ্টির খরচ। নগদ আয় এবং ব্যয়ের মধ্যেকার ভারসাম্য অর্থ প্রচলন পরিকল্পনের জন্যে একটা গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার। রাষ্ট্রীয় বাজেট হল রাষ্ট্রীয় আয় আর ব্যয়ের মধ্যেকার ভারসাম্য।

বৈষয়িক ভারসাম্যগুলোর মধ্যে একটা প্রধান ভূমিকায় থাকে উৎপাদনের বিভিন্ন উপকরণের ভারসাম্যগুলি — যেমন, বিদ্যুৎ, জালানি, ধাতু, সমস্ত রকমের যন্ত্র, নির্মাণের মালমশলা, রাসায়নিক উৎপাদ, ইত্যাদি। নিষ্কাশনের শিল্প আর প্রসেসিং শিল্পের সমন্বয়সাধন এবং অনুষঙ্গী শিল্পগুলোর উন্নয়ন পরিকল্পনের জন্যে ঐসব ভারসাম্য সহায়ক হয়। অন্যান্য বৈষয়িক ভারসাম্য হল বিভিন্ন ভোগ্য সামগ্রীর (শিল্পোৎপন্ন আর খাদ্যসামগ্রীর) ভারসাম্যগুলো।

সমগ্ররূপে ভারসাম্যগুলি গোটা অর্থনীতি জুড়ে থাকে এবং অর্থনীতির প্রধান অঙ্গ-উপাদানগুলোর মধ্যে

পরস্পরসম্পর্কের একটা চিত্র তুলে ধরে। অর্থনীতিতে সঠিক অনুপাতগুলো স্থাপন করা যায় এবং আভ্যন্তরিক সম্বল-সংগতি আর সংরক্ষিত ক্ষমতা খুলে ধরা যায় ভারসাম্যগুলোর সাহায্যে।

উৎপাদনের ফলপ্রদতা বাড়াবার প্রধান-প্রধান উপায়

পরিকল্পন সর্বোপযোগী হলে, পৃথক-পৃথক আর্থনীতিক করণীয় কাজগুলো সমাধা করার সর্বোপযোগী উপায় নির্ধারণ করা হলে সামাজিক উৎপাদনের ফলপ্রদতা সমানে বাড়িয়ে চলা যায়, তার মধ্যে পড়ে যাবতীয় প্রক্রিয়া, যেগুলি গুণগত আর পরিমাণগত উভয় দিক দিয়ে উৎপাদনবৃদ্ধি নির্ধারণ করে সবচেয়ে কম পরিমাণ সামাজিক ব্যয়ে. এটা কথাটার ব্যাপকতম অর্থে। কাজেই, এর থেকে ব্যাপারটা দাঁড়ায় এই যে, কোন নির্দিষ্ট অবস্থায় যাকিছু উৎপাদনের ফল বাড়াতে সহায়ক, সেইসবই হল সামাজিক উৎপাদনের ফলপ্রদতা বাড়াবার মূল উপাদান। এইসব উপাদানের মধ্যে পড়ে — শ্রমের উৎপাদিকাশক্তিবৃদ্ধি, কাঁচামাল এবং অন্যান্য মালমশলায় মিতব্যয়িতা, জাতদ্রব্য আরও সরেস করে তোলা এবং, বিশেষত, উৎপাদনকর পরিসম্পতের প্রতি ইউনিটে উৎপাদের পরিমাণবৃদ্ধি — পরিসম্পৎ/উৎপাদ অনুপাতের বৃদ্ধি।

জনকল্যাণ দ্রুত বাড়াবার জন্যে সামাজিক উৎপাদনের ফলপ্রদতা বাড়ানো নিষ্পত্তিকর। সমাজতান্ত্রিক সমাজে সামাজিক শ্রমের উৎপাদিকাশক্তি যত বাড়ে, উৎপাদনকর পরিসম্পতের টাকাপিছু উৎপাদ যত বেশি হয়, কাঁচামাল এবং অন্যান্য মালমশলার প্রতি টন থেকে উৎপন্ন জিনিস যত বেশি হয়, ততই দ্রুত বাড়ে সামাজিক ভোগ্য তহবিল। এর ফলে,

শ্রমিক শ্রেণী, যৌথখামারীরা এবং বুদ্ধিজীবীরা সামাজিক উৎপাদনের ফলপ্রদতা বাড়াতে খুবই আগ্রহান্বিত হয়, ঐজন্যে নেওয়া সমস্ত ব্যবস্থা তারা সমর্থন করে।

পরিকল্পন সর্বোপযোগীকরণ

পরিকল্পনাকে বাস্তবতাসম্মত করতে হলে সেটায় ভারসাম্য থাকা চাই। পরিকল্পনার সমস্ত অঙ্গ-উপাদানকে পরস্পরসম্পর্কযুক্ত করা না গেলে বিভিন্ন অসামঞ্জস্য দেখা দেয়, তার দরুন, পরিকল্পনা সংসাধনের প্রক্রিয়ার মধ্যে সেটা সংশোধন করার দরকার হয়। তবে, মনে রাখা দরকার, পরিকল্পনার অনেকগুলো সুষম এবং কার্যক্ষেত্রে সাধনসাধ্য রূপ-ভেদ থাকতে পারে।

কাজেই, সর্বশ্রেষ্ঠ রূপটাকে বেছে নেওয়া চূড়ান্ত গুরুত্বসম্পন্ন। আর্থনীতিক পরিকল্পনায় ধার্য হার আর অনুপাতগুলো সর্বোপযোগী হওয়া চাই। অর্থাৎ কিনা, সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিতে নিহিত সমস্ত সম্ভাবনা আর সম্বল-সংস্থানের সবচেয়ে ফলপ্রদ সদ্ব্যবহারের ব্যবস্থা থাকা চাই।

সমাজতান্ত্রিক সমাজের বেড়ে-চলা প্রয়োজনগুলো অনুসারেই শুধু নয়, উৎপাদনের ফলপ্রদতাবৃদ্ধি সমানে বজায় রাখার জন্যেও পরিকল্পনা আবশ্যক। যাতে উৎপাদনবৃদ্ধির হার হবে চড়া, আর্থনীতিক অনুপাতগুলো হবে সবচেয়ে যুক্তিসম্মত, উৎপাদ হবে উঁচু মাত্রায় সরেস — সামাজিক শ্রম ব্যয় হবে সবচেয়ে কম পরিমাণ, এই রকমের সুষম পরিকল্পনাই রচনা করা দরকার।

সর্বোপযোগী পরিকল্পনাটা বেছে নেবার প্রয়োজনীয়তা আসছে সমাজতান্ত্রিক পরিকল্পনের একেবারে মর্ম থেকেই।

সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি যত বাড়ে, আর তাতে করণীয় কাজগুলো হয়ে ওঠে যত বেশি জটিল, অর্থনীতিতে পরস্পরনির্ভরশীলতা সম্বন্ধে যথাযথ বিচার-বিশ্লেষণের ভিত্তিতে পরিকল্পন সর্বোপযোগীকরণও হয়ে ওঠে ততই বেশি গুরুত্বসম্পন্ন। পরিকল্পনকে সর্বোপযোগী করে তোলা হয় গণিতের সাহায্যে। আধুনিক গণিত আর গণনকৌশল যে-মাত্রায় উঠেছে, তাতে পরিকল্পনার সর্বোপযোগী রূপগুলোকে নির্ধারণ করা যায়।

জনসমষ্টির কল্যাণ আবশ্যক-মাত্রায় নিশ্চিত করা এবং সমাজের শ্রম-বলের সম্পূর্ণভাবে ব্যবহার করার সঙ্গে সঙ্গে, জাতীয় আয়বৃদ্ধির হার হল সবচেয়ে সাধারণ নিরিখ, যার ভিত্তিতে বিচার করা যায় পরিকল্পনাটা একটা সর্বোপযোগী রূপের কিনা।

পরিকল্পনা রচনা এবং সংসাধন

সমাজতান্ত্রিক নির্মাণকাজে পাওয়া অভিজ্ঞতার ফলে মূর্ত-নির্দিষ্ট প্রয়োগীয় পরিকল্পনপ্রণালী গড়ে তোলা সম্ভব হয়েছে।

সোভিয়েত ইউনিয়নে আর্থনীতিক উন্নয়ন পরিকল্পনা রচনা করা হয় পার্টি এবং রাষ্ট্রের অনুমোদিত নির্দেশনামার ভিত্তিতে। পরিকল্পনার মূল রাজনীতিক আর আর্থনীতিক করণীয় কাজগুলি এবং অর্থনীতির বিভিন্ন শাখা আর দেশের আর্থনীতিক এলাকাগুলির পরিমাণগত লক্ষ্যমাত্রাগুলো নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয় এই নির্দেশনামায়। তাতে বেঁধে দেওয়া হয় পুঁজি-বিনিয়োগের পরিমাণ আর ক্ষেত্র এবং প্রযুক্তিগত

অগ্রগতি চাঙ্গা করার আর আর্থনীতিক ব্যবস্থাপন উন্নততর করার প্রণালী।

অর্থনীতির প্রধান গ্রন্থি — বিভিন্ন শিল্পপ্রতিষ্ঠানে পরিকল্পনা রচনার বিপুল পরিমাণের কাজের উপর নির্ভর করে কেন্দ্রীয় পরিকল্পন সংস্থাগুলি পার্টি আর সরকারের নির্দেশনামার ভিত্তিতে বিভিন্ন খসড়া পরিকল্পনা আর লক্ষ্যমাত্রা প্রস্তুত করে। শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলিতে যেসব পরিকল্পনা তৈরি করা হয়, সেগুলির সারসংক্ষেপ করা হয় আর্থনীতিক শাখাগুলোর পরিকল্পনায়। পরিকল্পনার সূচকগুলিকে উচ্চতর আর্থনীতিক সংস্থা অনুমোদন করলে সেগুলি হয় সংশ্লিষ্ট শিল্পপ্রতিষ্ঠানের ক্রিয়াকলাপের ভিত্তি।

সোভিয়েত ইউনিয়নে প্রচলিত আর্থনীতিক সংস্কার অনুসারে উচ্চতর সংস্থা সমর্থন করে পরিকল্পনার অল্প কয়েকটামাত্র মূল সূচক, বাদবাকি সবগুলি নির্ধারিত হয় সংশ্লিষ্ট শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলিতে স্বাধীনভাবে, তার ভিত্তি হয় সেগুলোর কাজের নির্দিষ্ট অবস্থা এবং সুযোগ-সম্ভাবনা।

প্রতিষ্ঠানের কাজের প্রযুক্তিগত, আর্থনীতিক এবং আর্থিক দিকগুলোর অঙ্গাঙ্গিসমন্বয় হয় তার পরিকল্পনায়, এটাকে বলা হয় প্রযুক্তিগত, শিল্পগত এবং আর্থিক পরিকল্পনা। এতে নির্ধারিত হয় শিল্পপ্রতিষ্ঠানের উৎপাদন-সংক্রান্ত প্রযুক্তিগত এবং আর্থিক ক্রিয়াকলাপ। এর মধ্যে থাকে উৎপাদনের কর্মসূচি এবং এইসব বিষয়ে পরিকল্পনা, প্রযুক্তিগত উন্নয়ন, মালমশলা আর প্রযুক্তিগত যোগান, শ্রম আর মজুরি, উৎপাদন-পরিব্যয়, অর্থ এবং বিভিন্ন সাংগঠনিক আর প্রযুক্তিগত ব্যবস্থা।

প্রযুক্তিগত, শিল্পগত আর আর্থিক পরিকল্পনার প্রধান গ্রন্থিটা হল উৎপাদনের কর্মসূচি। উৎপাদনের এবং বিক্রি

করার লক্ষ্যমাত্রা এতে ধার্য হয়। উৎপাদনের কর্মসূচিতে বেঁধে দেওয়া হয় উৎপাদনের তালিকা, মালের রকম এবং গুণ। পরিকল্পনার যেসব বিভাগ শিল্পপ্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপের নিয়ামক, সেগুলির ভিত্তি হল একই গোড়াকার সূচকগুলো। আন্তঃকারখানা পরিকল্পনের মধ্যে এই শিল্পপ্রতিষ্ঠানের পরিকল্পনার সূচকগুলিকে উৎপাদনের পৃথক-পৃথক অংশ, কর্মশালা, বিভাগ এবং কর্মিদলের লক্ষ্যমাত্রা হিসেবে বাঁটোয়ারা করে দেওয়া হয়।

প্রত্যেকটা শিল্পপ্রতিষ্ঠানের পরিকল্পনার মধ্যে অন্যান্য শিল্পপ্রতিষ্ঠান থেকে কাঁচামাল, জালানি, বিদ্যুৎশক্তি এবং সরঞ্জাম পাবার ব্যবস্থা থাকে। যোগানদার আর ব্যবহারক শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে সম্পর্কের নিয়ামক আর্থনীতিক চুক্তিতে শিল্পপ্রতিষ্ঠানের ক্রিয়াকলাপের ঐদিকটা প্রকাশ পায়। এই চুক্তিতে নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয় কী কী মালমশলা যোগানো হবে, যোগানের সময়, প্রত্যেকটা মশলার দাম এবং দেবার শর্তাদি। চুক্তি প্রতিপালন করা উভয় পক্ষের জন্যে বাধ্যতামূলক। যেকোন পক্ষ চুক্তির শর্ত লঙ্ঘন করলে তার বৈষয়িক দায়িত্ব বর্তায় ঐ পক্ষের উপর।

পরিকল্পনা রচনা করা তো পরিকল্পিত আর্থনীতিক ব্যবস্থাপনের আরম্ভমাত্র, — পরিকল্পনা সংসাধনের বন্দোবস্ত করাই ঐ ব্যবস্থাপনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ।

পরিকল্পনা সংসাধিত হতে থাকবার সময়ে শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলোর কর্মীদের সৃজনশীল কর্মোদ্যোগে উৎপাদন বাড়াবার এবং জিনিস আরও সরেস করার বিভিন্ন অতিরিক্ত সুযোগ-সম্ভাবনা বের করা হয়। বিভিন্ন শিল্পপ্রতিষ্ঠানে, কর্মশালায়, বিভাগে, যৌথ আর রাষ্ট্রীয় খামারে ভিতরকার সংরক্ষিত ক্ষমতা এবং সুপ্ত সম্ভাবনার

জন্যে তারা সন্ধান চালায়। নতুন-নতুন এলাকা উন্নয়নের বিষয়ে, সদ্য-আবিষ্কৃত প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণের ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন আলোচ্য বিষয় হয়ে ওঠে। নতুন সরঞ্জাম আর প্রযুক্তি চালু করা এবং কাজ আর উৎপাদনের সংগঠন উন্নততর করার ব্যাপারে বড়রকমের সব করণীয় কাজ হাতে নেওয়া হয়।

জাতীয় আর্থনীতিক পরিকল্পনাটা কতকগুলো বিমূর্ত অঙ্কের সংগ্রহ নয় — এটা হল সমাজতন্ত্র আর কমিউনিজম গড়ার কাজে ব্যাপৃত জনগণের ক্রিয়াকলাপের একটা প্রতিফলন। পরিকল্পনা সংসাধন এবং লক্ষ্যমাত্রা ছাপিয়েও কাজ করার চেষ্টায় বিভিন্ন শিল্পপ্রতিষ্ঠান, কর্মিদল এবং পৃথক-পৃথক শ্রমিকের মধ্যে সমাজতান্ত্রিক প্রতিযোগিতা অভিযান চালানো হয়।

সমাজতান্ত্রিক পরিকল্পন হল বাস্তবিকপক্ষে সমগ্র অর্থনীতির পরিকল্পিত ব্যবস্থাপন। জাতীয় আর্থনীতিক পরিকল্পনায় সর্বাগ্রাধিকার পায় জাতীয় স্বার্থ। এর জন্যে পরিকল্পনা সংসাধন করতে গিয়ে কড়াকড়ি শৃঙ্খলা মেনে চলা আবশ্যক হয়, সমগ্রভাবে অর্থনীতির স্বার্থের পক্ষে হানিকর সমস্ত রকমের সংকীর্ণতা আর বিভাগীয়তা দূর করতে হয়।

দীর্ঘমেয়াদী এবং চলতি পরিকল্পন

সমাজতান্ত্রিক পরিকল্পনের ভিত্তি হল দীর্ঘমেয়াদী আর চলতি পরিকল্পনার অঙ্গাঙ্গিসমন্বয়।

সমসাময়িক অবস্থায় পাঁচসালা পরিকল্পনাই বিজ্ঞানসম্মত পরিকল্পনের মুখ্য রূপ। উৎপাদনের ফলপ্রদতা উন্নততর

করা এবং বাড়াবার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন বড়রকমের করণীয় কাজ নিষ্পন্ন করার পক্ষে যথেষ্ট কালপর্যায়ের জন্যে কল-কারখানা ইত্যাদির উৎপাদনকর এবং আর্থনীতিক ক্রিয়াকলাপের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার চিত্র এতে তুলে ধরা হয়। পাঁচসালা পরিকল্পনার সবচেয়ে গুরুত্বসম্পন্ন লক্ষ্যমাত্রাগুলোকে বিভিন্ন বাৎসরিক লক্ষ্যমাত্রায় ভাগ-ভাগ করে দেওয়া হয়। সমাজের সম্বল-সংস্থান আর প্রয়োজনগুলোতে চলতি পরিবর্তন অনুসারে এবং প্রযুক্তিগত আর আর্থনীতিক অগ্রগতির ব্যাপারটা ঠিকমতো বিবেচনায় রেখে বার্ষিক পরিকল্পনাগুলি বিভিন্ন লক্ষ্যমাত্রা বিচার-বিবেচনা করে মূর্ত-নির্দিষ্ট করা হয়।

উৎপাদনবৃদ্ধি, বৈজ্ঞানিক আর প্রযুক্তিগত সাধনগুলির ব্যাপক প্রয়োগ এবং সামাজিক উৎপাদনের গঠনে বিভিন্ন উন্নতিশীল পরিবর্তনের ব্যাপারে অর্থনীতির জন্যে নির্দিষ্ট করণীয় কাজগুলোর সুষ্ঠু প্রযুক্তিগত আর আর্থনীতিক ভিত্তি যোগাবার উপযুক্ত করে রচিত হয় পাঁচসালা পরিকল্পনা। ঐ কালপর্যায়ে পরিচালিত ব্যবস্থাবলির আর্থনীতিক ফলপ্রদতার নির্ভুল মূল্যায়ন করা যায় পাঁচসালা পরিকল্পনার সাহায্যে (যেমন, নতুন-নতুন এলাকা উন্নয়ন, বড়-বড় বিদ্যুৎকেন্দ্র, কারখানা, ইত্যাদি নির্মাণের ব্যাপারে)।

এর সঙ্গে সঙ্গে, বিভিন্ন মূর্ত-নির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা যথাসময়ে সংসাধন, আর্থনীতিক গঠনকাজের আশু করণীয় কাজগুলো হাসিল করার জন্যে শ্রমজীবীদের পৃথক-পৃথক সমষ্টিগুলির প্রচেষ্টা একজোট করা এবং অর্থনীতির সমস্ত শাখায় পরিকল্পিত স্বচ্ছন্দ উৎপাদনবৃদ্ধি নিশ্চিত করার জন্যে চাই

চলতি পরিকল্পনাগুলো। ১৫—২০ বছরজোড়া দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা সম্বন্ধে কিছুকাল যাবত ক্রমেই বেশি-বেশি গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে।

পরিকল্পিত কোটা

অর্থনীতির পরিকল্পিত সংগঠনে আর ব্যবস্থাপনে পরিকল্পিত কোটা বা হার সর্বাধিক গুরুত্বসম্পন্ন।

মালমশলা আর শ্রম-বলের এবং আর্থিক খরচেরও সদ্ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করা হয় কোটা দিয়ে। কোটা বেঁধে দেওয়া হয় উৎপাদের প্রতি-এককে শ্রম, মালমশলা, জ্বালানি, বিদ্যুৎশক্তি খরচের জন্যে, সরঞ্জাম ব্যবহার করার হার আর আধা-তৈরি জিনিসের উপযুক্ত হারের জন্যে, কাঁচামাল, জ্বালানি, ইত্যাদির মজুদের জন্যে।

কোটা অপরিবর্তিত থেকে যায় না। আর্থনীতিক উন্নয়ন, প্রযুক্তিগত অগ্রগতি, শ্রম আর উৎপাদন সংগঠনের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে কোটা বাড়ে। যন্ত্রপাতি আর সরঞ্জাম কাজে লাগাবার ক্ষেত্রে কোটা বাড়ে — যেমন, ব্ল্যাস্ট ফার্নেসের কেজো আয়তন সদ্ব্যবহারের গুণাঙ্ক, ওপ্‌ন-হার্থ ফার্নেসে হার্থের প্রতি-বর্গমিটারে ইস্পাতের উৎপাদ, বিদ্যুৎকেন্দ্র কত ঘণ্টা চালু থাকে তার সংখ্যা, কম্বাইনপিছু কয়লার উৎপাদ, ইত্যাদি। উৎপাদের প্রতি-ইউনিটে শ্রম আর মালমশলার খরচের কোটা নামাও খুবই গুরুত্বসম্পন্ন।

যন্ত্রপাতি আর সরঞ্জামের সদ্ব্যবহারের বেলায় কোটা বাড়ানো, কাঁচামাল এবং অন্যান্য মালমশলার ব্যয়সংকোচ করা, শ্রমের উৎপাদিকাশক্তি বাড়ানো, উৎপাদন-পরিব্যয় কমানোর বিপুল সম্ভাবনা সৃষ্টি করে সেরা সেরা শ্রমিকদের অভিজ্ঞতা।

অগ্রসর শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলি এবং উন্নতিশীল শ্রমিক, ইঞ্জিনিয়র আর টেকনিশিয়নদের অভিজ্ঞতা অবলম্বন করে থাকে সমাজতান্ত্রিক পরিকল্পন। অর্থনীতির সমস্ত শাখায় বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে নির্ধারিত উন্নতিশীল কোটা সমানে চালু করার লক্ষ্য নিয়ে চলে পরিকল্পিত আর্থনীতিক ব্যবস্থাপন। যন্ত্রপাতি আর সরঞ্জাম এবং কাঁচামাল আর অন্যান্য মালমশলা সদ্ব্যবহারের জন্যে, তেমনি, কাজ সমাধা করার প্রযুক্তিগত প্রণালী আর কাজ যথাসময়ে পূরণ করার জন্যেও উন্নতিশীল পরিকল্পিত কোটা সংশ্লিষ্ট শিল্পপ্রতিষ্ঠানের আভ্যন্তরিক সম্বল-সংস্থান এবং সংরক্ষিত ক্ষমতা জড়ো করার কাজটাকে প্রবলতর করে তোলে।

পরিকল্পন এবং হিসাবরক্ষণ

আর্থনীতিক হিসাবরক্ষণ এবং পরিসংখ্যান পরিকল্পনের সবচেয়ে গুরুত্বসম্পন্ন একটা হাতিয়ার। লেনিন বলেছিলেন, সমাজতন্ত্র হল হিসাবরক্ষণ। কমিউনিজম গড়ার কাজের সময়ে হিসাবরক্ষণ হয়ে ওঠে আরও গুরুত্বসম্পন্ন।

সমাজতান্ত্রিক সমাজে হিসাবরক্ষণ আর বিবরণ দাখিল করা আর্থনীতিক পরিকল্পনার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে সংশ্লিষ্ট। পরিকল্পনার মধ্যে আর্থিক আর ভৌত সূচক থাকে বলে হিসাবরক্ষণ চালানো হয় আর্থিক আর ভৌত দুই রূপেই।

হিসাবরক্ষণ আর বিবরণ দাখিল করার স্বচ্ছন্দে-সক্রিয় বন্দোবস্ত থাকলে সমগ্র পরিকল্পনা এবং তার পৃথক-পৃথক অংশ সংসাধনে অগ্রগতি নিয়ন্ত্রণ করা যায়, সেটা সংসাধনের পথে প্রতিবন্ধ কী সেটা বের করা যায়, কাজ উন্নততর করার ব্যবস্থা স্থির করা যায়। হিসাবরক্ষণ আর বিবরণ দাখিল

করার ব্যবস্থা থেকে পাওয়া তথ্যাদি পরবর্তী কালপর্যায়ের পরিকল্পনা রচনার জন্যে অপরিহার্য।

সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিতে হিসাবরক্ষণের প্রধান-প্রধান রূপ হল পরিসংখ্যান আর বুক্‌কীপিং।

অর্থনীতিতে আর তার পৃথক-পৃথক ক্ষেত্রে চালু প্রক্রিয়াগুলো সম্বন্ধে সংখ্যাগত তথ্যাবলির সারসংক্ষেপ করা হয় পরিসংখ্যানে। হিসাবরক্ষণের তথ্যাবলির প্রণালীবদ্ধ সংগ্রহ আর শ্রেণীবিন্যাস, সেগুলির সমগ্রতা আর তুলনাযোগ্যতা পরিসংখ্যানে নিশ্চিত হয়। অর্থনীতির উন্নয়নে দুর্বল গ্রন্থিগুলো পরিসংখ্যানে ধরা পড়ে এবং আর্থনীতিক অসামঞ্জস্যের বিপদ সম্বন্ধে বেশ আগে-আগেই হুঁশিয়ারি পাওয়া যায়।

কাজেই, সমাজতান্ত্রিক হিসাবরক্ষণের গোটা ব্যবস্থাটায় সংগঠক আর পরিচালকের কাজ করে পরিসংখ্যান। সামাজিক উৎপাদনপ্রণালীর নিয়মাবলি সম্বন্ধে জ্ঞানের ভিত্তিতে গড়ে-তোলা বিজ্ঞানসম্মত আর্থনীতিক ব্যবস্থাপন হতেই পারে না পরিসংখ্যান ছাড়া, পরিসংখ্যান বিবরণের যথাযথতা আর উপযোগিতা পরিকল্পিত আর্থনীতিক ব্যবস্থানের জন্যে বিপুল গুরুত্বসম্পন্ন।

প্রত্যেকটা শিল্পপ্রতিষ্ঠানে আর সংগঠনে মালমশলা আর আর্থিক সংস্থানের দৈনন্দিন চলাচল লিপিবদ্ধ করার একটা উপায় হল বুক্‌কীপিং। এটা করা হয় হিসাবনিকাশের ধরনে, এতে পাওয়া যায় সংশ্লিষ্ট শিল্পপ্রতিষ্ঠানের ক্রিয়াকলাপের আর্থিক ফলাফলের বিশেষক উপাদানটা। বুক্‌কীপিংয়ে আর্থ সূচকগুলোর মধ্যে দেখা যায় সংশ্লিষ্ট শিল্পপ্রতিষ্ঠানের কাজের সমস্ত দিক, উৎপাদনে তার সাফল্যগুলো আর ত্রুটিবিচ্যুতি।

পরিকল্পনার সংসাধন এবং সংশ্লিষ্ট শিল্পপ্রতিষ্ঠানের হাতে রাষ্ট্রের দেওয়া বৈষয়িক মূল্যবস্তুগুলো আর অর্থের অবস্থা এবং চলাচল নিয়ন্ত্রণ করার একটা উপায় হল বুক্‌কীপিং। এটা হওয়া চাই যথাযথ, আবার সহজ-সরলও, যাতে এটা শ্রমজীবী জনগণের বিস্তৃত অংশের নাগালের মধ্যে থাকে। পরিব্যয় হিসাবরক্ষণ চালাবার জন্যে, কু-ব্যবস্থাপনের বিরুদ্ধে লড়াই চালাবার জন্যে এবং প্রত্যেকটা শিল্পপ্রতিষ্ঠানে পরিকল্পনা সংসাধনের জন্যে বুক্‌কীপিংয়ের সুষ্ঠু বন্দোবস্ত অত্যাবশ্যক।

২। সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির পরিকল্পন আর ব্যবস্থাপনের উন্নতিবিধান

সমাজতান্ত্রিক আর্থনীতিক পরিকল্পনপ্রণালীর আরও উন্নতিবিধানের প্রয়োজন কী

পরিবর্তনশীল অবস্থা এবং অর্থনীতির সামনে নতুন-নতুন করণীয় কাজের সঙ্গে সংগতি রেখে পরিকল্পিত আর্থনীতিক ব্যবস্থাপনের বিভিন্ন মূর্ত-নির্দিষ্ট রূপ গড়ে-বেড়ে এবং উন্নততর হয়ে ওঠে। সোভিয়েত ইউনিয়নে এবং অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশে চালু করা আর্থনীতিক সংস্কারের সবচেয়ে জরুরী একটা করণীয় কাজ হল সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির পরিকল্পিত ব্যবস্থাপনের উন্নতিবিধান।

প্রথমত এবং সর্বোপরি সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির বৃদ্ধি এবং বিকাশের ফলেই সমাজতান্ত্রিক আর্থনীতিক ব্যবস্থাপনপ্রণালীর উন্নতিবিধানের প্রয়োজন দেখা দেয়।

উন্নয়নের গোড়ার দিকে সোভিয়েত ইউনিয়নের অর্থনীতিতে কয়লা, ধাতু, সিমেন্ট, ইত্যাদি ব্যাপক ধরনের উৎপাদ ছিল অপেক্ষাকৃত সীমাবদ্ধ পরিসরে। সে-অবস্থায় জাতীয় অর্থনীতির সম্বল-সংস্থান এবং প্রয়োজন নির্ধারণ করা অপেক্ষাকৃত সহজ ছিল।

কিন্তু, অর্থনীতির দ্রুত বৃদ্ধির ফলে তার উন্নয়নের পরিবেশ আরও জটিল হয়ে দাঁড়াল। এখন সোভিয়েত শিল্পে এমন বহুরকমের জিনিস উৎপন্ন হয়, যেগুলির উৎপাদন অসম্ভব হয়েছে মাত্র অল্প কয়েক বছর আগে। বৈজ্ঞানিক আর প্রযুক্তিগত অগ্রগতির ভিত্তিতে উৎপন্ন নতুন-নতুন ধরনের জিনিসের সংখ্যা দ্রুত বেড়ে চলেছে। উৎপাদের মোট পরিমাণের বৃদ্ধি হয়েছে বিপুল। উৎপাদনের দ্রুত বৃদ্ধি এবং আর্থনীতিক গঠনের বর্ধিত জটিলতা অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশেরও বিশেষক উপাদান।

সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে আর্থনীতিক উন্নয়ন ছিল প্রসারিত, হয়েছে নিবিড়, তার স্বাভাবিক ফল হিসেবেই আর্থনীতিক ব্যবস্থাপনপ্রণালীর উন্নতিবিধানের প্রয়োজন দেখা ছিল। প্রসারিত উন্নয়নের অর্থ হল, প্রধানত, অতিরিক্ত পুঁজি-বিনিয়োগ করে এবং উৎপাদনপ্রক্রিয়ায় নতুন-নতুন শ্রমশক্তি লাগিয়ে উৎপাদনের প্রসার ঘটানো। উৎপাদনের সমস্ত উপকরণ — শ্রমের হাতিয়ার এবং মালমশলা দুইয়েরই প্রয়োগের চড়া মাত্রায় উন্নতিবিধান, আরও উন্নত ধরনের শ্রম সংগঠন এবং শ্রমের উৎপাদিকাশক্তি আরও বেশকিছুটা বাড়াবার ফলে উৎপাদনের যে-বৃদ্ধি ঘটে, তাকে বলে উৎপাদন নিবিড় করে তোলা।

নিবিড় উৎপাদনের একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক হল উৎপাদের গুণগত উন্নতি। ভোগ্য পণ্যের বেলায়, জিনিসটা আরও

সরেস হলে বিক্রি হওয়া নিশ্চিত হয়, তার জন্যে খদ্দেরদের চাহিদা বাড়ে। জনকল্যাণ বাড়ার ফলে উৎপন্ন জিনিসপত্রের গুণ, শেষ-উৎকর্ষ, ইত্যাদি লোকে চায় আরও বেশি। উৎপাদনের উপকরণের বেলায়, কাঁচামাল আরও সরেস আর বিশুদ্ধ হলে, শ্রমের উপকরণ আরও টেকসই হলে, মেরামত ছাড়াই আরও বেশি কাল ব্যবহার্য হলে এবং তা আরও বেশি নির্ভরযোগ্য হলে সমাজের হাতে দেওয়া বৈষয়িক সম্পদের মোট পরিমাণ বাড়ে।

বৈষয়িক উৎপাদনের সমগ্র ক্ষেত্রটাকে, এই উৎপাদনের সমস্ত শাখা আর প্রক্রিয়াকে সমানে নিবিড় করে তোলার জন্যে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির পরিকল্পিত ব্যবস্থাপনকে উচ্চতর পর্বে তোলা দরকার। কাজেই, এর থেকে দেখা যাচ্ছে, আর্থনীতিক ব্যবস্থাপনের সাংগঠনিক রূপ আর প্রণালীর মূলগত উন্নতিবিধানের প্রয়োজন ঘটল সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির বিকাশের ফলেই। অর্থনীতির বিকাশ নতুন-নতুন প্রয়োজন ঘটাল এবং তদনুসারে ব্যবস্থাপনের নতুন-নতুন কায়দা চালু করার দরকার হল পুরন কায়দার বদলে।

লেওনিদ ব্রেঝনেভ বলেছেন, 'বলা যেতে পারে, নয়া আর্থনীতিক কর্মনীতির এবং প্রথম-প্রথম পাঁচসালা পরিকল্পনার কালপর্যায়গুলিতে আমরা সমাজতান্ত্রিক আর্থনীতিক ব্যবস্থাপনের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছিলাম। এখন আমাদের সামনে রয়েছে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির উচ্চতর বিদ্যালয়ের বিভিন্ন করণীয় কাজ। সেগুলি হল কমিউনিজমে পেঁছবার পথে সবচেয়ে জটিল এবং সৃজনশীল করণীয় কাজ।'

পরিকল্পনের নতুন প্রণালী এবং উৎপাদনের আর্থনীতিক প্রবর্তনা

ব্যবস্থাপন আর পরিকল্পনের উন্নতিবিধান এবং সামাজিক উৎপাদনের আর্থনীতিক প্রবর্তনা প্রবলতর করার উদ্দেশ্যে অবলম্বিত এক-প্রস্থ ব্যবস্থা হল সোভিয়েত ইউনিয়নে আর্থনীতিক সংস্কার। সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির উন্নয়নে কেন্দ্রীকৃত পরিকল্পিত ব্যবস্থাপনের নেতৃত্বের ভূমিকা ধরে চলেছে এই সংস্কার। মূল আর্থনীতিক অনুপাতগুলো এবং উৎপাদনের স্থাননির্বাচনের উন্নতিবিধান এবং আর্থনীতিক এলাকাগুলোর বহুমুখী উন্নয়ন প্রবলতর করাই কেন্দ্রীকৃত পরিকল্পিত ব্যবস্থাপনের প্রধান উদ্দেশ্য। উৎপাদনের এবং অত্যাবশ্যক পণ্যগুলি যোগানের আরও চড়া হারের ব্যবস্থা করা পরিকল্পিত ব্যবস্থাপনের একটা করণীয় কাজ। প্রযুক্তিগত অগ্রগতি, পুঁজি-বিনিয়োগ, শ্রম বাবত পারিশ্রমিক, দাম, লাভ, ফিনান্স আর ক্রেডিটের ক্ষেত্রে একরূপ রাষ্ট্রীয় কর্মনীতি বলবৎ করা এবং উৎপাদন তহবিল, শ্রম-সম্পদ বৈষয়িক আর প্রাকৃতিক সম্পদের কার্যকর সদ্ব্যবহারের উপর আর্থনীতিক নিয়ন্ত্রণ খাটানো পরিকল্পিত ব্যবস্থাপনের কাজ।

এই আর্থনীতিক সংস্কার হল লেনিনীয় গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার নীতির বিকাশের ক্ষেত্রে একটা নতুন পর্ব, এতে লক্ষ্য আর সঙ্কল্পের ঐক্যের সঙ্গে শ্রমজীবী জনগণের বিস্তৃত অংশের সৃজনশীল কর্মশক্তি আর উদ্যোগ বিকাশের ব্যাপক সুযোগের সংযুক্তি নিশ্চিত হয়। এই সবকিছু সমাজতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলির এবং সমগ্রভাবে অর্থনীতির সাধারণ-স্বাভাবিক কাজের জন্যে অবশ্যপ্রয়োজনীয়।

সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির বৃদ্ধি কেন্দ্রীকৃত আর্থনীতিক ব্যবস্থাপনের গুরুত্ব বাড়িয়ে তোলে এবং, তার সঙ্গে সঙ্গে, জনগণের উদ্যমের তাৎপর্যটাকে বড় করে। পরিকল্পিত সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিতে গণতান্ত্রিক নীতিগুলির বৃদ্ধি আর প্রসার সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার একটা বিষয়গত নিয়ম।

ব্যবস্থাপনের এই নতুন প্রণালীতে সমন্বিত হয়েছে শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলির ষোল-আনা পরিব্যয় হিসাবরক্ষণের সঙ্গে একরূপ রাষ্ট্রীয় পরিকল্পন, বিস্তৃত অঙ্গ-প্রজাতান্ত্রিক আর স্থানীয় উদ্যমের সঙ্গে কেন্দ্রীকৃত শাখাগত ব্যবস্থাপন এবং উৎপাদন কর্মিসমষ্টিগুলির বর্ধিত ভূমিকার সঙ্গে এক-ব্যক্তির ব্যবস্থাপনের নীতি।

এইভাবেই, ব্যবস্থাপনের গণতান্ত্রিক নীতিগুলি আরও বিকশিত হয়, উৎপাদন ব্যবস্থাপনে জনগণের বিস্তৃততর অংশগ্রহণের আর্থনীতিক পূর্বশর্ত সৃষ্টি হয়, শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলির আর্থনীতিক ক্রিয়াকলাপে জনগণের প্রভাব প্রবলতর হয়।

অর্থনীতির পরিকল্পিত ব্যবস্থাপনের উন্নতিবিধান এবং রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনের বৈজ্ঞানিক মান বাড়াবার প্রয়োজন ঘটে ব্যবস্থাপনের এই নতুন প্রণালীতে। প্রথমত এবং সর্বোপরি, এর অর্থ হল উৎপাদনবৃদ্ধির পরিকল্পিত হারগুলি, জাতীয় আয় এবং জাতীয় অর্থনীতির বুনিয়াদী অনুপাতগুলি নির্ধারিত হওয়া চাই বৈজ্ঞানিক হিসাবের ভিত্তিতে। নিহিত সম্ভাবনাগুলো আর সম্বল-সংস্থানের সবচেয়ে যুক্তিসম্মত প্রয়োগ ঘটাবার জন্যে এবং নতুন বৈজ্ঞানিক আর প্রযুক্তিগত সাধনসাফল্যগুলিকে উৎপাদনে দ্রুত চালু করাবার জন্যে পরিকল্পনা রচনা করা হয়। বৈজ্ঞানিক আর প্রযুক্তিগত অগ্রগতির ফলে খুলে-যাওয়া সম্ভাবনার কথাও পরিকল্পনায় বিবেচনায় রাখা হয়।

শিল্প আর কৃষি উভয় ক্ষেত্রে আর্থনীতিক পরিকল্পনপ্রণালী এবং উৎপাদনের আর্থনীতিক প্রবর্তনা প্রবলভাবে উন্নততর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, পরিকল্পনের বৈজ্ঞানিক মাত্রা এবং কেন্দ্রীকৃত আর্থনীতিক ব্যবস্থাপন বাড়ে।

এই আর্থনীতিক সংস্কারের মর্ম হল কেন্দ্রীকৃত পরিকল্পনের উন্নতিবিধানের মাধ্যমে উৎপাদনকর উপায়-উপকরণ পূর্ণ মাত্রায় সদ্ব্যবহার করতে, উৎপাদনের ফলপ্রদতা বাড়াতে শ্রমিকসমষ্টিগুলিকে আগ্রহান্বিত করা, এইসব লক্ষ্যসাধনে তাদের উদ্যম আরও জাগিয়ে তোলা। বিভিন্ন আর্থনীতিক প্রবর্তনা ব্যবহার ক'রে প্রত্যেকটি শ্রমিক, প্রতিষ্ঠান এবং সমগ্রভাবে সমাজের স্বার্থকে সমন্বিত করা এবং দেশের বিপুল উৎপাদন-বলের যুক্তিসম্মত সদ্ব্যবহার, দ্রুত জনকল্যাণবৃদ্ধি আর সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার শ্রেষ্ঠত্বকে পুরোপুরি বাস্তবায়িত করাই নতুন ব্যবস্থাপনপ্রণালীর করণীয় কাজ।

৩। পরিকল্পিত সমাজতান্ত্রিক পণ্য উৎপাদন

পণ্য-অর্থ সম্পর্কের পরিকল্পিত প্রকৃতি

উৎপাদনের উপকরণে ব্যক্তিগত মালিকানা খতম করে সাধারণের মালিকানা কায়েম হবার ফলে পণ্য উৎপাদনের প্রকৃতি এবং পণ্য-অর্থ সম্পর্কের ভূমিকা আমূল বদলে যায়।

সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির কর্মসূচিতে বলা হয়েছে, সমাজতন্ত্রের আমলে পণ্য-অর্থ সম্পর্কের নতুন মর্মবস্তুর সঙ্গে সংগতি রেখে কমিউনিজম গড়ার কাজে এই সম্পর্কের ষোল-আনা সদ্ব্যবহার করা আবশ্যক। এ ব্যাপারে একটা মস্ত ভূমিকায় থাকছে আর্থনীতিক উন্নয়নের বিভিন্ন হাতিয়ার —

যেমন, পরিব্যয় হিসাবরক্ষণ, অর্থ, দাম, উৎপাদন-পরিব্যয়, লাভ, বাণিজ্য, ক্রেডিট, ফিনান্স।

সমাজতান্ত্রিক সমাজে প্রায় সমস্ত উৎপাদই বেরোয় সমাজতান্ত্রিক শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলো থেকে। তার বেশির ভাগটাই উৎপন্ন হয় বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠানে — কাজেই, সেটা সমগ্র জনগণের সম্পত্তি। একটা অংশ উৎপন্ন হয় যৌথখামারগুলিতে — সেটা জনগণের বিভিন্ন সমষ্টির এজমালি সম্পত্তি। সমাজতান্ত্রিক উৎপাদনে জাতদ্রব্যাদিতে সরাসরি অঙ্গীভূত হয় জাতীয় পরিসরে সংগঠিত সামাজিক শ্রম, সেটা ব্যক্তি-উৎপাদকের শ্রম নয়।

কাজেই, সমাজতন্ত্রের আমলে পণ্য উৎপাদনটাকে দেখতে হবে পরিকল্পিত পণ্য উৎপাদন হিসেবে। উৎপাদনের উপকরণে ব্যক্তিগত মালিকানার আওতায় উৎপাদনে-অরাজকতা থেকে পয়দা-হওয়া দ্বন্দ্ব এতে থাকে না। এটা নতুন, সমাজতান্ত্রিক পণ্য উৎপাদন।

পণ্য যখন সমাজতান্ত্রিক উৎপাদনের ফল

পণ্য হল, একদিকে, উপযোগ-মূল্য, আবার, অন্যদিকে, মূল্যবস্তু। আমাদের বিবেচনায়, সমাজতান্ত্রিক উৎপাদনের ফল যে-পণ্য, তারও আছে এই দুটো গুণ।

সমাজতান্ত্রিক আর্থনীতিক ব্যবস্থায় পণ্যের উপযোগ-মূল্য এবং মূল্যের মধ্যে কোন দ্বন্দ্ব নেই, — ব্যক্তিগত সম্পত্তির আধিপত্যে পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদনপ্রণালীর যাবতীয় বৈরিতার উদ্ভব হয় ঐ দ্বন্দ্ব থেকে। কিন্তু, তাই বলে, সমাজতন্ত্রের আমলে পণ্যের উপযোগ-মূল্য আর মূল্যের মধ্যে কোন দ্বন্দ্বই নেই, তা নয়। কখনও-কখনও, উৎপাদ নিরেস কিংবা তার দাম চড়া বলে

সেটা বিক্রি হয় না। পরিকল্পিত আর্থনীতিক ব্যবস্থাপনপ্রণালী নিখুঁত করে তুলতে গিয়ে, সমাজতান্ত্রিক সমাজে উৎপন্ন পণ্যের উপযোগ-মূল্য আর মূল্যের মধ্যে দ্বন্দ্ব দেখা দেবার সম্ভাবনাটা বিবেচনার বিষয়ীভূত হয়।

পণ্যের মূল্য নির্ধারিত হয় সেটার উৎপাদনে ঠিক যে-পরিমাণ ব্যক্তিগত শ্রম ব্যয় হয়, তা দিয়ে নয়, — সেটার উৎপাদনে আর পুনরুৎপাদনে সামাজিকভাবে আবশ্যক শ্রমের পরিমাণ দিয়েই তা নির্ধারিত হয়। সমাজতান্ত্রিক সমাজে ব্যয়ের ক্ষতিপূরণ হল সামাজিকভাবে আবশ্যক ব্যয়ের ক্ষতিপূরণ। যেমন, কোন শিল্পপ্রতিষ্ঠান যদি এমনসব জিনিস উৎপন্ন করে, যা দিয়ে কারও কোন দরকার নেই, তাহলে ব্যয় বাবত ঐ শিল্পপ্রতিষ্ঠান যা ক্ষতিপূরণ পাবে তাতে সমাজের সম্পদের মোট পরিমাণ সরাসরি কমে যাবে। কোন শিল্পপ্রতিষ্ঠান যদি উৎপাদনের নির্দিষ্ট পরিবেশে যা অবশ্যক তার চেয়ে বেশি শ্রম আর বৈষয়িক সম্পদ ব্যয় ক'রে জিনিস উৎপন্ন করে, সেক্ষেত্রেও ঐ একই ব্যাপার ঘটে।

পরিবর্তিত উৎপাদন-পরিবেশ, আরও ভাল সরঞ্জাম আর প্রযুক্তি চালু করা এবং শ্রমের উৎপাদিকাশক্তিবৃদ্ধির ফলে উৎপাদের ইউনিটপিছু অঙ্গীভূত সামাজিকভাবে আবশ্যক শ্রমের পরিমাণ বদলে যায়। পরিকল্পিত আর্থনীতিক ব্যবস্থাপনে দাম ধার্য করা, শ্রম বাবত পারিশ্রমিক বাঁধা, ইত্যাদি ব্যাপারে সমাজ ঐসব বিষয়গত উপাদান বিবেচনায় রাখে।

পরিকল্পিত অর্থনীতিতে মূল্য-সংক্রান্ত নিয়মের ভূমিকা

অর্থনীতির পরিকল্পিত ব্যবস্থাপনে উৎপাদনের ব্যয়কে তার ফলাফলের সঙ্গে যথাপরিমেয় এবং তুলনা করা আবশ্যক

হয়। উৎপাদনে ব্যয়ের দুটো উপাদান থাকে — এক, সরাসরি ব্যয় করা মানুষের শ্রম এবং, দুই, উৎপাদনের উপকরণ রূপে মূর্ত শ্রমের ব্যয় — সেগুলি হল কাঁচামাল, জ্বালানি, যন্ত্রপাতি আর সরঞ্জাম।

প্রত্যেকটা শিল্পপ্রতিষ্ঠানে সবচেয়ে কম খরচে সবচেয়ে বেশি উৎপাদ হলে সামাজিক উৎপাদনের ফলপ্রদতা হয় সর্বোচ্চ মাত্রায়। সমাজতান্ত্রিক আর্থনীতিক ব্যবস্থাপনের এই অপরিবর্তনীয় নিয়মটা কিভাবে প্রতিপালিত হয়, সেটা বিচার করা সম্ভব কেবল উৎপাদনের ফলাফলের সঙ্গে সর্বমোট উৎপাদন-ব্যয়ের তুলনা করেই। কোন একটা নির্দিষ্ট কালপর্যায়ে কোন শিল্পপ্রতিষ্ঠানে উৎপন্ন উৎপাদসমষ্টির সঙ্গে ঐ সময়ে ঐ শিল্পপ্রতিষ্ঠানের ব্যয়ের তুলনা করতে হলে ঐ ব্যয় আর উৎপাদনের ফল এই দুটোকেই একই সাধারণ হরে পরিণত করা দরকার। পণ্য-অর্থ সম্পর্কের প্রকাশক বিভিন্ন আর্থনীতিক নিরিখই ঐ হর।

সমাজতন্ত্রের আমলে কাজ করে লোকে যতটা সমাজকে দেয়, ততটা সমাজের কাছ থেকে পায়, সামাজিক প্রয়োজন বাবত যতটা যায় সেটা বাদে। সমাজকে সে এক রূপে যে-পরিমাণ শ্রম দেয়, সেটা সে ফেরত পায় অন্য রূপে। পৃথক-পৃথক শ্রমিক এবং পৃথক-পৃথক শিল্পপ্রতিষ্ঠান আর শাখা, উভয় ক্ষেত্রেই এটা প্রযোজ্য। ব্যয়ের ক্ষতিপূরণ হলে, একমাত্র তবেই উৎপাদনের কোন প্রতিষ্ঠান কিংবা শাখা সাধারণ-স্বাভাবিকভাবে বিকশিত হতে পারে। ব্যয়ের ক্ষতিপূরণ হল উৎপাদনে বৈষয়িক প্রবর্তনার বনিয়াদ। এটা স্পষ্টই যে, মূল্য-সংক্রান্ত নিয়ম হল সমাজতন্ত্রের অন্তর্নিহিত একটা বিষয়গত আর্থনীতিক নিয়ম — সেটা পরিকল্পিত আর্থনীতিক ব্যবস্থাপনের আর্থনীতিক প্রণালীর এবং উৎপাদনে আর্থনীতিক প্রবর্তনার বিষয়গত ভিত্তি।

কমিউনিস্ট সমাজে আর্থনীতিক উন্নয়ন পরিচালিত হবে সরাসরি শ্রম-মিতব্যয়ের নীতি অনুসারে, তাতে শ্রমব্যয়কে মূল্যের হিসেবে ধরা হবে না। তখন আসবে একই অভিন্ন সাধারণের কমিউনিস্ট রূপের সম্পত্তি এবং বণ্টনের কমিউনিস্ট প্রণালী, — অর্থনীতিগতভাবে পণ্য-অর্থ সম্পর্কের প্রয়োজন ফুরিয়ে যাবে।

সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিতে
মূল্য-সম্পর্কের ব্যবস্থা

সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির সাধারণ-স্বাভাবিক কাজ সরাসরি নির্ভর করে পরস্পরসম্পর্কযুক্ত একগুচ্ছ মূল্য-সম্পর্কের উপর, সেগুলির মধ্যে পড়ে — দাম আর লাভ, মজুরি আর বোনাস, বাণিজ্য, ফিনান্স আর ক্রেডিট, সাপেক্ষ রাজস্ব, সুদ, কর, ইত্যাদি।

এখানে বলা দরকার, সমাজতন্ত্রের মূল্যের নিরিখগুলোর সামাজিক-আর্থনীতিক মর্মবস্তু পুঁজিতন্ত্রের ঐ নিরিখগুলোর মর্মবস্তু থেকে একেবারেই পৃথক।

ব্যক্তিগত সম্পত্তির আধিপত্যের আমলে উৎপাদনে-অরাজকতা আর ধ্বংসকর প্রতিযোগিতার অবস্থার মধ্যে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সক্রিয় মূল্য-সংক্রান্ত নিয়মের একরকমের প্রকাশ হল দাম। সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিতে দাম হল পরিকল্পিত আর্থনীতিক উন্নয়নের সবচেয়ে গুরুত্বসম্পন্ন একটা উপায়: উৎপাদনের উপকরণে সাধারণের মালিকানার অবস্থায় সক্রিয় মূল্য-সংক্রান্ত নিয়মের একরকমের প্রকাশ।

পুঁজিতান্ত্রিক সমাজে মজুরি হল পুঁজিপতিদের কাছে প্রলেতারিয়েতের বিক্রি করা শ্রমশক্তির দাম। সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিতে মজুরি হল শোষণমুক্ত এবং সামাজিক উৎপাদনে ব্যাপৃত শ্রমিকদের শ্রম বাবত একরকমের পারিশ্রমিক।

পঁুজিতন্ত্রের আমলে শ্রমের উপর পঁুজির শোষণের ফল হল লাভ, — শ্রমিকদের মুফতে দেওয়া শ্রম দিয়ে সৃষ্টি করা এবং শোষক পঁুজিপতি শ্রেণীর আত্মসাৎ করা উদ্বৃত্ত মূল্য এতে অঙ্গীভূত হয়। সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিতে লাভ হল সামাজিক উৎপাদন বিকাশে এবং সামাজিক সম্পদ বাড়িয়ে তুলতে প্রত্যেকটা শিল্পপ্রতিষ্ঠানের অবদান নির্ধারণ করার নিরিখ।

অন্যান্য সমস্ত মূল্য-নিরিখের প্রকৃতি আর ভূমিকাও ঐ একইভাবে বদলে যায়। পঁুজিতান্ত্রিক উৎপাদন-সম্পর্কের বিভিন্ন রূপের প্রকাশ না হয়ে সেগুলি সবই হয়ে ওঠে সমাজতন্ত্রের উৎপাদন-সম্পর্ক প্রকাশের বিভিন্ন রূপ।

সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিতে বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপ বিনিময়ের নিয়ামক সমাজতান্ত্রিক মূল্য-সম্পর্কের প্রণালী এমন অবস্থা সৃষ্টি করে, যাতে যাকিছু সমাজের পক্ষে লাভজনক, সেইসবই উৎপাদন-কর্মিসমষ্টিগুলির পক্ষে, প্রত্যেকটি শ্রমিকের পক্ষেও লাভজনক।

পরিকল্পনা এবং মূল্য-সংক্রান্ত নিয়মের সাকল্য

সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিতে পণ্য-অর্থ সম্পর্কের নতুন প্রকৃতিটা হল এই যে, এতে প্রকাশ পায় সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন-সম্পর্ক, পরিকল্পিত সমাজতান্ত্রিক উৎপাদনের সম্পর্ক।

সমাজতান্ত্রিক পণ্য উৎপাদন, মূল্য-সংক্রান্ত নিয়ম এবং সমাজতন্ত্রের আমলে এই নিয়মটার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সমস্ত নিরিখেরই বুনিয়াদী বৈশিষ্ট্যগুলো নির্ধারিত হয় তাই দিয়ে। এক, সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিতে মূল্য-সংক্রান্ত নিয়মটা আর দামের অন্তহীন ওঠানামার ভিতর দিয়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবে কাজ করে না। সমাজতান্ত্রিক মূল্য-সংক্রান্ত নিয়ম থেকে উৎপাদনে-অরাজকতা এবং ধ্বংসকর সংকট ঘটতে পারে না। দুই, মানুষের উপর

মানুষের শোষণ খতম হতে শ্রমশক্তি আর পণ্য নয়, বেচা-কেনার বস্তু নয়। ভূমি-রাষ্ট্রীয়করণের ফলে এবং, বিশেষত, কৃষির সমাজতান্ত্রিক পুনঃসংগঠনের পরে ভূমি আর কেনা কিংবা বেচা চলে না।

মূল্য-সংক্রান্ত নিয়ম অনিবার্যভাবেই যেসব পরিণতির উদ্ভব ঘটায় ব্যক্তিগত সম্পত্তির পরিবেশে, তা সমাজতন্ত্রের আমলে হয় না। যাবতীয় অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্ব নিয়ে যে পুঁজিতান্ত্রিক সম্পর্ক, তার উদ্ভব ঘটাতে পারে না এই নিয়মটা — কেননা, সমাজতান্ত্রিক সমাজে উৎপাদনের উপকরণ শোষণের উপায়ে পরিণত হতে পারে না, পুঁজিতে পরিণত হতে পারে না। কেনা-বেচা হতে পারে এবং ব্যক্তির নিজস্ব সম্পত্তি হতে পারে শুধু ভোগ-ব্যবহারের জিনিসপত্র।

এইভাবে, সমাজতান্ত্রিক সমাজে মূল্য-সংক্রান্ত নিয়ম এবং এই নিয়মভিত্তিক নিরিখগুলো — দাম, মজুরি, লাভ, ইত্যাদিতে একটা নতুন মর্মবস্তু আসে। সেগুলো পরিকল্পিত সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির আর্থনীতিক নিরিখ, তাতে মানুষের উপর মানুষের শোষণ, উৎপাদনে-অরাজকতা, ইত্যাদি রহিত হয়।

সমাজতান্ত্রিক আর্থনীতিক ব্যবস্থায় মূল্য-সংক্রান্ত নিয়ম অর্থনীতির পরিকল্পিত, সমানুপাতিক উন্নয়নের পক্ষে অস্বভাবী নয়। এর সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে সংশ্লিষ্ট এই নিয়মটা সমাজতন্ত্রের বিষয়গত আর্থনীতিক নিয়মাবলির সমগ্র বন্দোবস্তের একটা অঙ্গ-উপাদান হয়ে ওঠে এবং জাতীয় অর্থনীতির পরিকল্পিত সংগঠনে সচেতনভাবে প্রযুক্ত হয়।

এইসব নিয়মের সাকল্য, এগুলির পরস্পরসম্পর্ক আর পারস্পরিক ক্রিয়া কেন্দ্রীকৃত পরিকল্পিত আর্থনীতিক ব্যবস্থাপন এবং মূল আর্থনীতিক গ্রন্থিগুলোর —শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলোর বিস্তৃত পরিচালনগত আর আর্থনীতিক স্বাধীনতা সমন্বিত

করার বিষয়গত প্রয়োজন সৃষ্টি করে হয়। এই সমন্বয়ের মানে সমাজতান্ত্রিক মূল্য-নিরিখগুলোর বন্দোবস্তটার সাহায্যে পরিকল্পিত ব্যবস্থাপনের আর্থনীতিক প্রণালীগুলির সর্বতোমুখী বিকাশ আর শক্তিবৃদ্ধি।

সমাজতান্ত্রিক সমাজে অর্থের ক্রিয়াপ্রণালী

সমাজতন্ত্রের আমলে অর্থব্যবস্থা থাকে বলে মূল্য-সংক্রান্ত নিয়ম চালু থাকে। দাম, উৎপাদন-পরিব্যয়, মজুরি, লাভ এবং অন্যান্য মূল্য-নিরিখ প্রকাশ করা হয় অর্থের হিসেবে।

সমাজতান্ত্রিক আর্থনীতিক ব্যবস্থায় অর্থের মধ্যে প্রকাশ পায় সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন-সম্পর্ক; পরিকল্পিত সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনে একটা গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ারের কাজ করে অর্থ। অর্থ কতকগুলি কর্ম সম্পাদন করে।

এক, অর্থ হল মূল্যের একটা পরিমাপ। কোন পণ্যের মূল্য — সেটা উৎপাদনে সামাজিকভাবে আবশ্যক প্রত্যক্ষ আর মূর্ত শ্রম-ব্যয় — প্রকাশ করা হয় নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ দিয়ে — এটা ঐ পণ্যের দাম। এই প্রসঙ্গে অর্থ আবার দাম পরিমাপের একটা উপায়ও বটে: অর্থের সাহায্যে পণ্যসমূহের দামের মধ্যে তুলনা এবং যথাপরিমাণ করা যায়।

মূল্যের একটা পরিমাপ হিসেবে কাজ ক'রে অর্থ হল শ্রম পরিমাপের এবং সমাজের সদস্যদের ভোগ-ব্যবহার পরিমাপের উপর সাধারণের নিয়ন্ত্রণের একটা উপায়। সমাজের সদস্যদের শ্রমের পরিমাপ করা হয় অর্থের হিসেবে। শ্রমিক আর কর্মচারীরা এবং যৌথখামারীরা বহুলাংশে কাজের বাবত অর্থ পায়।

মূল্যের একটা পরিমাপ হিসেবে কাজে অর্থ পরিব্যয় হিসাবরক্ষণের একটা হাতিয়ারও বটে। পণ্য উৎপাদনে আবশ্যক

শ্রম-ব্যয়, কাঁচামাল এবং অন্যান্য মালমশলা আর জালানি খরচা, সরঞ্জাম আর ঘর-বাড়ির ক্ষয়-ক্ষতি উৎপাদনের ব্যবস্থাপন বাবত খরচা, মালের ভাড়া, বাণিজ্য সংগঠনের মারফত ব্যবহারকের কাছে মাল পেঁীছে দেবার খরচ, ইত্যাদিও প্রকাশ করা হয় অর্থ দিয়ে। কোন শিল্পপ্রতিষ্ঠানের কাজের ফলাফল সবচেয়ে পুরোপুরি এবং সবচেয়ে সাধারণভাবে প্রকাশ করা যায় অর্থের হিসাবে।

দুই, সমাজতন্ত্রের আমলে প্রচলনের একটা উপায় হল অর্থ। রাষ্ট্রীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলির শ্রমিক আর কর্মচারীরা মজুরি খরচ করে জিনিসপত্র কিনতে। যৌথখামারীরাও তাদের রোজগার করা পয়সা দিয়ে জিনিস কেনে। পণ্যের কেনা-বেচা চলে অর্থ দিয়ে।

সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিতে প্রচলনের উপায় হিসেবে অর্থের ক্রিয়াপ্রণালীতে দ্বন্দ্ব থাকে না, যা পুঁজিতান্ত্রিক সমাজে থাকে, তেমনি সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিতে সংকটের বিপদও ঠাসা থাকে না। সমাজতান্ত্রিক সমাজে বিক্রি করা জিনিসের বেশির ভাগটাই প্রত্যক্ষ, সামাজিক শ্রমের উৎপাদ। এই কারণে, জিনিস বিক্রি করার ব্যাপারটা তেমনি কোন বাধার সম্মুখীন হয় না, যেসব অনিবার্য বাধা দেখা দেয় পুঁজিতন্ত্রের আমলে উৎপাদনের সামাজিক প্রকৃতি এবং ব্যক্তিগত পুঁজিতান্ত্রিক কায়দায় ভোগ-দখলের মধ্যেকার দ্বন্দ্বের দরুন।

কোন কোন পণ্য যদি বিক্রি না হয়, তার কারণ জিনিসগুলো নিরেস, বাণিজ্য সংগঠনের কাজে ত্রুটিবিচ্যুতি, ইত্যাদি। এসব ব্যাপার সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির প্রকৃতিতে বদ্ধমূল নয়, — আর্থনীতিক ব্যবস্থাপনের উন্নতি ঘটলে এগুলো দূর হয়ে যায়।

তিন, সমাজতান্ত্রিক সমাজে অর্থ হল দেওনের একটা উপায়। দেওনের উপায় হিসেবে অর্থ ব্যবহৃত হয় বিভিন্ন

শিল্পপ্রতিষ্ঠানের মধ্যে হিসাবনিকাশের জন্যে, শ্রমিক আর কর্মচারীদের মজুরি দেবার জন্যে, কর আর রাষ্ট্রীয় ঋণের সুদ দেবার জন্যে, ইত্যাদি।

পুঁজিতন্ত্রের আমলে দেওনের উপায় হিসেবে অর্থের ক্রিয়াপ্রণালী পণ্যের মধ্যে নিহিত দ্বন্দ্বটাকে প্রকোপিত করে এবং, কাজেই, আর্থনীতিক সংকট পাকিয়ে তুলতে আনুকূল্য করে। সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিতে এইসব দ্বন্দ্ব নেই। কোন সমাজতান্ত্রিক শিল্পপ্রতিষ্ঠান জিনিসপত্র আর সেবাকাজের বাবত দেওনে দেরি করলে, তার কারণ হতে পারে শুধু উৎপাদন কিংবা নির্মাণের পরিকল্পনা সংসাধনে অপারগতা, নিরেস উৎপাদ, অতি-মাত্রায় উৎপাদন পরিব্যয় কিংবা বৈষয়িক উপায়-উপকরণের প্রচলনে ধীরতা। সংশ্লিষ্ট শিল্পপ্রতিষ্ঠানের কাজের উন্নতি ঘটিয়ে এবং চুক্তির বাধ্যবাধকতা পালনে শিল্পপ্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব বাড়িয়ে দেওনের ঐসব বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করা হয়।

চার, সমাজতান্ত্রিক সমাজে অর্থ সমাজতান্ত্রিক সঞ্চয়ন আর শ্রমজীবীদের টাকা জমাবার একটা উপায়। সমগ্র অর্থনীতিতে সঞ্চয়নের সমাহরণ ঘটে অর্থ হিসেবে। সমাজতান্ত্রিক উৎপাদনের প্রসার, দেশের আর্থনীতিক শক্তি আর প্রতিরক্ষাক্ষমতা বাড়ানো এবং শ্রমজীবী জনগণের বৈষয়িক আর সাংস্কৃতিক যোগানের জন্যে এইসব সংগতি-সংস্থান ব্যবহার করা হয়।

শেষে, সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে অর্থ আন্তর্জাতিক কারেন্সির কাজ করে। এইভাবে, সমাজতান্ত্রিক বিশ্বব্যবস্থার দেশগুলি এবং তার বাইরেকার কয়েকটা দেশের সঙ্গে পণ্য-বিনিময় এবং অন্যান্য আর্থনীতিক সম্পর্কের ব্যাপারে দেওনের একটা মাধ্যম হল সোভিয়েত কারেন্সি। যেসব সমাজতান্ত্রিক দেশের বিস্তৃত আর্থনীতিক সম্পর্ক আছে বহির্জগতের সঙ্গে, তাদের কারেন্সিগুলিও কিছু-না-কিছু মাত্রায় অনুরূপ ভূমিকায় আছে।

পরিব্যয় হিসাবরক্ষণ

১। উৎপাদনকর সমাজতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান

জাতীয় অর্থনীতির মূল গ্রন্থি — প্রতিষ্ঠান

শিল্প, নির্মাণ, কৃষি, পরিবহণ এবং অর্থনীতির অন্যান্য শাখায় হাজার-হাজার রাষ্ট্রীয়-মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান নিয়ে সমাজতান্ত্রিক আর্থনীতিক ব্যবস্থা। রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলি ছাড়াও আছে যৌথখামার আর সমবায় প্রতিষ্ঠানগুলি, প্রধানত যৌথখামার, সেগুলিতে উৎপন্ন হয় কৃষিজাত দ্রব্যের বেশির ভাগটা।

কোন প্রতিষ্ঠান হল উৎপাদনের এবং প্রযুক্তিগত ইউনিট। তাতে নির্দিষ্ট রকমের উৎপাদ উৎপন্ন হয়, সেটা করা হয় যথোপযুক্ত বন্দোবস্তের সাহায্যে, তাতে ব্যবহৃত হয় উপযুক্ত কাঁচামাল এবং অন্যান্য মালমশলা। এটা আবার সামাজিক-আর্থনীতিক ইউনিটও বটে: অর্থনীতির কোন নির্দিষ্ট কোষে নিযুক্ত মেহনতী জনগণ।

শিল্পপ্রতিষ্ঠান হল অর্থনীতির মূল গ্রন্থি। প্রত্যেকটা প্রতিষ্ঠানকে রাষ্ট্র যোগায় বৈষয়িক আর আর্থিক সংগতি-সংস্থান: ঘর-বাড়ি, যন্ত্রপাতি, সরঞ্জাম, কাঁচামালের মজুদ, জালানি, ইত্যাদি। প্রত্যেকটা প্রতিষ্ঠান তার উৎপাদ বিক্রি করে পাওয়া অর্থ দিয়ে উৎপাদনব্যয় মেটায়।

১৯৬৫ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের মন্ত্রিপরিষদের অনুমোদিত 'সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রীয় উৎপাদনকর শিল্পপ্রতিষ্ঠানের সংবিধি'তে প্রতিষ্ঠানগুলির অধিকার এবং কর্তব্যগুলি নির্দিষ্ট করা আছে। এই সংবিধিতে লিপিবদ্ধ আছে — প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপন এবং উৎপাদন আর আর্থনীতিক ক্রিয়াকলাপের নিয়ামক সাধারণ নীতি, এবং পরিকল্পন, বুনিয়াদী নির্মাণকাজ আর মেরামত, উৎপাদনের কৃতকৌশল আর প্রযুক্তি এবং মালমশলা আর টেকনিকাল যোগানের উন্নতিবিধান-সংক্রান্ত অধিকার, তাছাড়া, বিক্রি, ফিনান্স, শ্রম আর মজুরির বিষয়ে অধিকার। এই সংবিধিতে প্রতিষ্ঠানগুলির অধিকার, আর্থনীতিক উদ্যম এবং স্বাধীনতা অনেকটা বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। কেবল শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলির নয়, নির্মাণ শিল্প, কৃষি, পরিবহণ এবং যোগাযোগ সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানগুলিরও সামনে যেসব গুরুত্বপূর্ণ করণীয় কাজ রয়েছে, ষোল-আনাই তদনুযায়ী হয়েছে এই সংবিধি।

প্রত্যেকটা প্রতিষ্ঠান একটা বিধিসম্মত এবং আর্থনীতিক ইউনিট, সেটা তার ক্রিয়াকলাপের ফলাফলের জন্যে দায়ী। প্রতিষ্ঠানের আর্থনীতিক স্বাধীনতা আর নিজস্ব উদ্যমের সঙ্গে কেন্দ্রীকৃত পরিচালনার সমন্বয় এর ক্রিয়াকলাপের ভিত্তি। পরিব্যয় হিসাবরক্ষণের ভিত্তিতে পরিকল্পনা অনুসারে কাজ চালিয়ে প্রতিষ্ঠানগুলিকে সর্বনিম্ন পরিমাণ শ্রম, মালমশলা আর অর্থ ব্যয় করে সর্বোচ্চ মাত্রায় ফললাভ করতে হয়। সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের হাতে যেসব উৎপাদন-সামর্থ্য, আভ্যন্তরিক সঞ্চিত ক্ষমতা, জমি এবং অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদ থাকে সেগুলির ষোল-আনা সদ্ব্যবহার হওয়া চাই ঐ উদ্দেশ্যে।

প্রতিষ্ঠানগুলিকে কড়াকড়ি ব্যয়সংকোচের ব্যবস্থা করতে হয়: বিজ্ঞান, প্রযুক্তি এবং প্রগতিশীল অভিজ্ঞতার সর্বাধুনিক

সাধনসাফল্যগুলি চালু করতে হয়, কাঁচামাল আর অন্যান্য মালমশলা, জালানি আর বিদ্যুৎশক্তি ব্যয়ের জন্যে উন্নতিশীল কোটা ধার্য করতে হয়। উৎপাদন-পরিব্যয় কমানো এবং উৎপাদনের লাভপ্রদতা বাড়ানো প্রতিষ্ঠানগুলির কর্তব্যকর্ম। বিস্তৃত অধিকার এবং আর্থনীতিক উদ্যম দেখাবার যাবতীয় সুযোগ আছে বলে প্রতিষ্ঠানগুলি এইসব দায়িত্ব পালন করতে পারে।

কার্যক্ষেত্রে দেখা-দেওয়া প্রয়োজন অনুসারে শিল্পসংগঠনের একটা নতুন এবং খুবই গুরুত্বসম্পন্ন রূপ হল পরিব্যয় হিসাবরক্ষণের ভিত্তিতে পরিচালিত শাখা পরিমেল। এই পরিমেলগুলি স্থাপিত হবার ফলে বিশেষীকরণ, সহযোগিতা এবং উৎপাদন কেন্দ্রীভূত করার বিস্তৃত সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে এবং দক্ষ কর্মিবাহিনীর দেশজোড়া সদ্ব্যবহার এবং প্রতিষ্ঠানগুলির আরও ভাল প্রযুক্তিগত আর আর্থনীতিক ব্যবস্থাপন আরও সুষ্ঠু হয়েছে।

প্রতিষ্ঠানের পরিসম্পৎ

সমাজতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের উৎপাদনের উপকরণ হল তার উৎপাদনকর পরিসম্পৎ। সেটা দু'রকমের: স্থির পরিসম্পৎ এবং পরিবৃত্তিশীল পরিসম্পৎ। শ্রমের উপকরণগুলি নিয়ে স্থির পরিসম্পৎ আর পরিবৃত্তিশীল পরিসম্পৎ হল শ্রমের বস্তুসমূহ। স্থির পরিসম্পৎ কতকগুলি উৎপাদন-পর্যায়ে উৎপাদন-প্রক্রিয়ায় খাটে, তখন দীর্ঘকাল ধরে একটু-একটু করে তার মূল্যটা পাত্রান্তরিত হয়ে যায় তৈরি উৎপাদে। সমগ্র উৎপাদন-প্রক্রিয়ার মধ্যে তার ভৌত রূপটা বজায় থাকে। পরিবৃত্তিশীল পরিসম্পৎ প্রত্যেকটা উৎপাদন-পর্যায়ে একেবারে নিঃশেষিত হয়ে যায়,

তার মূল্যটা পুরোপুরিই পাত্রান্তরিত হয় তৈরি উৎপাদে। উৎপাদন-প্রক্রিয়ার মধ্যে সেটা রূপান্তরিত হয়ে পরিণত হয় নতুন উৎপাদে, যা কোন বিশেষ-নির্দিষ্ট সামাজিক প্রয়োজন মেটায়।

পরিবর্ত্তিশীল পরিসম্পৎ হল — এক, যেসব শ্রমের বস্তু উৎপাদন-প্রক্রিয়ায় ঢোকে নি এবং, দুই, যেসব শ্রমের বস্তু উৎপাদন-প্রক্রিয়ায় লেগে গেছে। তদনুসারে, পরিবর্ত্তিশীল পরিসম্পৎ হল — (১) উৎপাদনের জন্যে মজুদ (কাঁচামাল, জ্বালানি, ইত্যাদি) এবং (২) অসমাপ্ত উৎপাদ।

প্রতিষ্ঠানের উৎপাদনকর স্থির পরিসম্পৎ ছাড়াও থাকে অনুৎপাদী স্থির পরিসম্পৎ — সেগুলি হল বসতবাড়ি, বিদ্যালয়, ক্লাব, ইত্যাদি।

প্রত্যেকটা প্রতিষ্ঠানের থাকে প্রচলনের পরিসম্পৎ — তা হল প্রচলনের ক্ষেত্রে তার সংস্থান। সেগুলি হল তৈরি কিন্তু আপাতত অবিক্রীত উৎপাদ এবং মজুরি দেওয়া, কাঁচামাল আর অন্যান্য মালমশলা কেনা এবং এটা-ওটা দেওনের জন্যে আর্থিক সংস্থান।

কোন প্রতিষ্ঠানের উৎপাদনকর পরিবর্ত্তিশীল পরিসম্পৎ এবং প্রচলনের পরিসম্পৎ মিলিয়ে হয় তার চলতি তহবিল। চলতি তহবিলের একাংশ রাষ্ট্র দেয় প্রতিষ্ঠানের হাতে। এটা প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব চলতি পরিসম্পৎ। অপরাংশটা হল ব্যাঙ্ক থেকে ক্রেডিটে পাওয়া তহবিল।

কোন প্রতিষ্ঠানের কাজ ফলপ্রদ করতে হলে তার সমস্ত পরিসম্পৎ এবং উপায়-উপকরণের সবচেয়ে যুক্তিসম্মত সদ্ব্যবহার হওয়া চাই। তার মানে, স্থির পরিসম্পৎ — উৎপাদনকর এলাকা, ঘর-বাড়ি, সরঞ্জাম, যন্ত্রপাতি, লেদ — সর্বোচ্চ মাত্রায় ব্যবহৃত হওয়া চাই। তার উপর, এজন্যে চলতি পরিসম্পৎ ব্যয়

করা চাই বিচক্ষণতার সঙ্গে: উৎপাদের প্রতি ইউনিটের জন্যে কাঁচামাল, অন্যান্য মালমশলা এবং জালানি খরচ কমানো এবং উদ্বৃত্ত কিংবা অপ্রয়োজনীয় মজুদ দূর করে এবং তৈরি উৎপাদের বিক্রি ত্বরিত করে চলতি পরিসম্পতের পাত্রান্তরণ আরও দ্রুত করা।

পরিব্যয় হিসাবরক্ষণের মর্ম এবং করণীয় কাজ

উপরে যা বলা হল তার থেকে এটা স্পষ্ট যে, সমাজের স্বার্থে সবচেয়ে কম খরচে সবচেয়ে বেশি ফললাভ করাটা সমাজতন্ত্রের আমলে আর্থনীতিক উন্নয়নের একটা অটল নিয়ম। সমাজতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানে সবচেয়ে কড়াকড়ি মিতব্যয়িতা চালাবার সবচেয়ে গুরুত্বসম্পন্ন উপায় হল পরিব্যয় হিসাবরক্ষণ।

পরিব্যয় হিসাবরক্ষণ হল প্রতিষ্ঠানের ব্যয় এবং তার ক্রিয়াকলাপের ফলাফলের মধ্যে অর্থের হিসেবে তুলনার ভিত্তিতে সমাজতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের পরিকল্পিত ব্যবস্থাপনের একটা প্রণালী। পরিব্যয় হিসাবরক্ষণের ভিত্তিতে যেখানে কাজ চলে, এমন সমস্ত শিল্পপ্রতিষ্ঠান একটা ব্যালান্স শীট তৈরি করে, তাতে যথাযথভাবে ফুটে ওঠে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের আয় আর ব্যয়, লাভ আর লোকসান। স্টেট ব্যাঙ্কে প্রতিষ্ঠানের একটা চলতি আমানত থাকে, সেই আমানতের টাকা প্রতিষ্ঠানটি ব্যবহার করতে পারে বিদ্যমান নিয়ম অনুসারে। প্রতিষ্ঠানটি অন্যান্য প্রতিষ্ঠান আর সংগঠনের সঙ্গে চুক্তি সই করে এবং সেই চুক্তি পালন করবার জন্যে দায়ী থাকে। নিজস্ব সম্বল-সংস্থায় অভাবপূরণের জন্যে প্রতিষ্ঠানটির ব্যাঙ্কের ক্রেডিট পাবার অধিকার থাকে।

কাজেই, এর থেকে দেখা যাচ্ছে, পরিব্যয় হিসাবরক্ষণ হল সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র আর শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যেও একটা স্পষ্ট-নির্দিষ্ট রূপের সম্পর্ক। পরিব্যয় হিসাবরক্ষণের নীতি সংগতিপূর্ণভাবে মেনে চলা হলে সেটা প্রতিষ্ঠানের সমস্ত সম্বল-সংস্থা বের করতে এবং তার পূর্ণ সদ্ব্যবহারের সহায়ক হয়। প্রত্যেকটা পণ্য উৎপাদনের জন্যে শ্রমব্যয় যাতে সামাজিকভাবে আবশ্যক সর্বনিম্ন মাত্রায় নামানো যায়, সেটা পরিব্যয় হিসাবরক্ষণ দিয়ে নিশ্চিত হয়। এটা ব্যয় সংকোচব্যবস্থার সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে সংশ্লিষ্ট — কেননা, এর জন্যে থাকা চাই শ্রম, মালমশলা আর অর্থের যুক্তিসম্মত আর বিচক্ষণ ব্যয়, অর্থাৎ, অর্থনীতির সমস্ত শাখায় লোকসান এবং অনুৎপাদী ব্যয় এড়িয়ে চলা।

কোন প্রতিষ্ঠানের পরিসম্পতের সদ্ব্যবহার এবং কাজের ফলাফলের জন্যে পরিব্যয় হিসাবরক্ষণ দায়ী করে পরিচালন কর্তৃপক্ষকে। প্রতিষ্ঠানে কড়াকড়ি শৃঙ্খলা, প্রতিষ্ঠানের সমস্ত মালমশলা আর অর্থাদির যথাযথ জমাখরচ এবং সেগুলি খরচের উপর কড়া নিয়ন্ত্রণ পরিব্যয় হিসাবরক্ষণের মধ্যে নিহিত থাকে।

সমাজতন্ত্রের আমলে প্রত্যেকটা প্রতিষ্ঠানে এবং জাতীয় পরিসরে বিচক্ষণ ব্যবস্থাপনে সমস্ত মেহনতী মানুষ বিশেষভাবে আগ্রহী। তার উপর, পরিকল্পনা সংসাধনে এবং লক্ষ্যমাত্রা ছাড়িয়েও কাজ করতে, সবচেয়ে কম খরচে সবচেয়ে বেশি ফললাভে প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠানের কর্মিদলকে বৈষয়িক দিক দিয়ে আগ্রহান্বিত করে তোলে পরিব্যয় হিসাবরক্ষণ। পরিব্যয় হিসাবরক্ষণের ভিত্তিতে উৎপাদনে আর্থনীতিক প্রবর্তনাব্যবস্থার ভিতর দিয়ে ঐ লক্ষ্য সাধিত হয়।

উৎপাদন-কর্মিসমষ্টি সমগ্র প্রতিষ্ঠানের কাজে সাফল্যে আগ্রহান্বিত, কেননা, তার সম্পাদিত সমগ্র কাজের উপর নির্ভর

করে সঞ্চয়ন এবং শ্রমিক, ইঞ্জিনিয়র, টেকনিশিয়ন আর ব্যবস্থাপন কর্মিদলকে বোনাস দেবার টাকার প্রবর্তনা তহবিলের পরিমাণ, কর্মিবাহিনীর সাংস্কৃতিক সুযোগ-সুবিধা আর জীবনযাত্রার অবস্থার উন্নতিবিধান এবং উৎপাদনের আরও বিকাশ।

কারখানার ভিতরকার পরিব্যয় হিসাবরক্ষণ

জাতীয় আর্থনীতিক পরিকল্পনার সাফল্য নির্ভর করে সমস্ত শিল্পপ্রতিষ্ঠানের কর্মসম্পাদনের উপর, তেমনি, প্রত্যেকটা প্রতিষ্ঠানে পরিকল্পনার সাফল্য নির্ভর করে কর্মশালা, বিভাগ আর কর্মিদলগুলির কর্মসম্পাদনের উপর, প্রকৃতপক্ষে, প্রত্যেকটি কর্মীর ক্রিয়াকলাপের উপর।

পরিব্যয় হিসাবরক্ষণ কেবল বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যেকার আর্থনীতিক যোগসূত্রগুলিকে জুড়ে থাকলে সেটা স্বভাবতই পূর্ণাঙ্গ হতে পারে না। পূর্ণাঙ্গ হতে হলে পরিব্যয় হিসাবরক্ষণের আওতায় আসা চাই প্রতিষ্ঠানের ভিতরকার সম্পর্কগুলি, প্রতিষ্ঠানের অঙ্গগুলি — কর্মশালা, বিভাগ আর কর্মিদলগুলির মধ্যেকার সম্পর্ক।

কর্মশালা, বিভাগ আর কর্মিদলের ভিতরে প্রযুক্ত কারখানার ভিতরকার পরিব্যয় হিসাবরক্ষণে ঐ লক্ষ্য সাধিত হয়। কাজটা হল, এর প্রত্যেকটা বিভাগে উৎপাদনব্যয়ের সঙ্গে তার ফলাফলের তুলনা করা।

কারখানার (কর্মশালা) ভিতরকার পরিব্যয় হিসাবরক্ষণ উৎপাদনে আর্থনীতিক প্রবর্তনাব্যবস্থার একটা অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। ব্যবস্থাপনের নতুন প্রণালী চালু হবার সঙ্গে সঙ্গে, কারখানার ভিতরকার পরিব্যয় হিসাবরক্ষণের বিকাশ আরও বেশি গুরুত্বসম্পন্ন হয়ে উঠেছে।

কারখানার ভিতরকার পরিব্যয় হিসাবরক্ষণ বলতে সর্বপ্রথমে বুঝায় যে, পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রাগুলি তুলে দেওয়া হয়েছে প্রত্যেকটা উৎপাদন বিভাগের কাছে। সংশ্লিষ্ট কর্মশালা, বিভাগ আর কর্মিদলকে বোনাস দিয়ে পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছতে এবং তা ছাড়িয়ে যেতে উৎসাহ যোগানো হয়।

২। পরিব্যয় হিসাবরক্ষণের মূলনীতিগুলি

উৎপাদনের লাভপ্রদতা এবং তা বাড়াবার উপায়

সমাজতান্ত্রিক আর্থনীতিক ব্যবস্থাপনের সবচেয়ে অপরিহার্য একটা উপাদান হল পরিব্যয় হিসাবরক্ষণ।

শিল্পপ্রতিষ্ঠানের ক্রিয়াকলাপের লাভপ্রদতা নিশ্চিত করাই পরিব্যয় হিসাবরক্ষণের উদ্দেশ্য। পরিব্যয় হিসাবরক্ষণের ভিত্তিতে পরিচালিত প্রত্যেকটা প্রতিষ্ঠানের আয় থেকে তার খরচ-খরচা মেটা চাই শুধু তাই নয়, লাভও হওয়া চাই।

উৎপাদনের লাভপ্রদতা বাড়াবার উপায় হল — প্রতিষ্ঠানের হাতের সমস্ত সম্বল-সংস্থানের আরও সুষ্ঠু সদ্ব্যবহার, সমস্ত লোকসান দূর করা, সমস্ত কাজ-কারবারের উপর কড়াকড়ি আর্থিক নিয়ন্ত্রণ, উৎপাদন-পরিব্যয় কমানো, উৎপাদ খুবই সরেস করা।

সত্যিকারের পরিব্যয় হিসাবরক্ষণ মজবুত করা আর বিকশিত করা এবং এইভাবে লাভপ্রদতা বাড়াবার জন্যে নিম্নলিখিত ব্যবস্থাগুলি আবশ্যক। এক, প্রতিষ্ঠান যাতে তার উৎপাদনকর পরিসম্পতের সর্বোপযোগী সদ্ব্যবহার করতে, উৎপাদনের পরিমাণ বাড়াতে এবং লাভ বাড়াতে আগ্রহান্বিত হয়, এমন অবস্থা সৃষ্টি

করতে হবে। দুই, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সম্পর্কের ক্ষেত্রে পরিব্যয় হিসাবরক্ষণ মজবুত করা, ডেলিভারি-সংক্রান্ত বাধ্যবাধকতা পালন করা এবং এই ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের বৈষয়িক দায়িত্ব বাড়ানো অবশ্যপ্রয়োজনীয়। তিন, পরিব্যয় হিসাবরক্ষণের ভিত্তিতে প্রত্যেকটা প্রতিষ্ঠান, কর্মশালা এবং বিভাগের কর্মীদের আগ্রহান্বিত করা দরকার লক্ষ্যমাত্রাগুলো পূরণ করতেই শুধু নয়, — গোটা প্রতিষ্ঠানের ক্রিয়াকলাপের মোট ফল উন্নততর করতে, আরও উঁচু লক্ষ্যমাত্রা ধার্য এবং পূরণ করতে এবং উৎপাদনের লাভপ্রদতা বাড়াবার উদ্দেশ্যে আভ্যন্তরিক সম্বল-সংস্থানের আরও সুষ্ঠু সদ্ব্যবহার করতেও তাদের আগ্রহান্বিত করা দরকার।

প্রতিষ্ঠানের কর্মসম্পাদন উন্নততর করার জন্যে, উৎপাদন সম্প্রসারিত করতে, লাভপ্রদতা বাড়াতে, উৎপাদ আরও সরেস করতে এবং উৎপাদনকর পরিসম্পতের সর্বোপযোগী সদ্ব্যবহার করতে কর্মিসমষ্টির আর প্রত্যেক কর্মীর আগ্রহ প্রবলতর করা পূর্ণাঙ্গ পরিব্যয় হিসাবরক্ষণ চালু করার উদ্দেশ্য। পৃথক-পৃথক প্রতিষ্ঠান, শিল্পের সমগ্র শাখা এবং আর্থনীতিক এলাকার আর্থনীতিক ক্রিয়াকলাপের সুদক্ষ সন্ধানী বিশ্লেষণ ছাড়া সত্যিকারের পরিব্যয় হিসাবরক্ষণ অসম্ভব।

উৎপাদনের ফলপ্রদতা ঠেলে বাড়িয়ে তোলার জন্যে নেওয়া ব্যবস্থাগুলোর গুরুত্ব বিপুল। যথাসম্ভব কম সামাজিক ব্যয়ে উৎপাদনের পরিমাণ আর গুণ উন্নত করার গোটা একগুচ্ছ প্রক্রিয়া মিলিয়ে হয় সামাজিক উৎপাদনের ফলপ্রদতা। সামাজিক উৎপাদনের ফলপ্রদতা বাড়াবার প্রধান-প্রধান উপাদান হল সেই সমস্ত উপায়-উপকরণ, যা কোন নির্দিষ্ট অবস্থায় উৎপাদনের ফল বাড়িয়ে তোলে। সেগুলি হল: শ্রমের উৎপাদিকাশক্তিবৃদ্ধি, কাঁচামাল এবং অন্যান্য মালমশলা আরও বিচক্ষণতার সঙ্গে

ব্যবহার করা, উৎপাদ আরও সরেস করা এবং, বিশেষত, উৎপাদনকর পরিসম্পতের প্রতি ইউনিটে উৎপাদের পরিমাণবৃদ্ধি — অর্থাৎ, পরিসম্পৎ/উৎপাদ অনুপাতের বৃদ্ধি।

সামাজিক উৎপাদনের ফলপ্রদতা বাড়াবার জন্যে আর্থনীতিক নির্মাণকাজে কোন-কোন ত্রুটিবিচ্যুতি দূর করা এবং রোধ করা অবশ্যপ্রয়োজনীয় — যেমন, বিনিয়োজিত পুঁজি বেশি ছড়িয়ে পড়া, এবং তার সঙ্গে যা সংশ্লিষ্ট, নতুন-নতুন প্রকল্প নির্মাণে এবং নতুন-নতুন উৎপাদন-সামর্থ্য, যন্ত্রপাতি আর সরঞ্জাম আত্তীকরণে বেশি সময় লাগানো; কাঁচামাল এবং অন্যান্য মালমশলা অত্যধিক পরিমাণে মজুদ করার দরুন তহবিল আটক পড়া, অসমাপ্ত উৎপাদের পরিমাণবৃদ্ধি এবং প্রত্যক্ষ আর মূর্ত শ্রমের অপচয় রোধ করা দরকার। অর্থাৎ কিনা, সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির সম্বল-সংস্থান এবং নিহিত শক্তিগুলিকে সর্বোচ্চ পরিমাণে জড়ো করা এবং সমাজতান্ত্রিক আর্থনীতিক ব্যবস্থার সুবিধা এবং নিহিত সম্ভাবনাগুলোকে যথাসম্ভব পূর্ণাঙ্গ মাত্রায় ব্যবহার করা অত্যাবশ্যক।

সামাজিক উৎপাদনের ফলপ্রদতা এবং বৈজ্ঞানিক আর প্রযুক্তিগত অগ্রগতি

সামাজিক উৎপাদনের ফলপ্রদতা বাড়াবার সহায়ক ব্যবস্থাগুলির মধ্যে একটা মূল অবস্থানে রয়েছে প্রযুক্তিগত অগ্রগতি। বৈজ্ঞানিক আর প্রযুক্তিগত বিপ্লবের একেবারে পুরোভাগে এসে যাবার জন্যে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির সমস্ত সুযোগ-সুবিধা আছে এবং এই বিপ্লবের ফলগুলিকে সবচেয়ে দ্রুত কাজে লাগায়। বিজ্ঞানের সমস্ত শাখার বিকাশের অনুকূল অবস্থা নিশ্চিত করে সমাজতন্ত্র। তালিম দিয়ে

বিজ্ঞানকর্মিবাহিনী গড়ে তোলাতে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি বিপুল গুরুত্ব দেয় এবং বৈজ্ঞানিক গবেষণা ইনস্টিটিউটগুলি গ'ড়ে সুসজ্জিত করার জন্যে মোটা-মোটা টাকা বরাদ্দ করে। বিজ্ঞানের বহু মূল শাখায় সোভিয়েত ইউনিয়ন পৃথিবীর মধ্যে সর্বাগ্রগামী।

প্রযুক্তিগত অগ্রগতি দ্রুততর করা, আরও জটিল-সূক্ষ্ম এবং উৎপাদনকর সরঞ্জাম, যন্ত্রপাতি আর লেদ বসানো এবং উৎপাদনের প্রয়োজনের অনুযায়ী প্রযুক্তি উন্নততর করা এখন চূড়ান্ত গুরুত্বসম্পন্ন। কমিউনিজমের বৈষয়িক আর টেকনিকাল বনিয়াদ গড়ে তোলার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট করণীয় কাজগুলির জন্যে বিজ্ঞানের ভূমিকা বড় করে তোলা এবং, বিশেষত, বৈষয়িক উৎপাদনের সমস্ত ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের সাধনসাফল্যগুলিকে আরও দ্রুত প্রয়োগ করার প্রয়োজন অত্যন্ত জরুরী। সোভিয়েত জনগণের কল্যাণের প্রসার এবং কমিউনিজমের পথে তাদের এগিয়ে যাওয়ার হার বিজ্ঞান আর প্রযুক্তিবিদ্যার অব্যাহত অগ্রগতির সাপেক্ষ। শিল্প আর কৃষি উৎপাদনে, পরিবহণ আর যোগাযোগের ক্ষেত্রে বিজ্ঞান আর প্রযুক্তিবিদ্যার সর্বসাম্প্রতিক সাধনসাফল্যগুলিকে দ্রুত প্রয়োগ করা এবং সবচেয়ে অগ্রসর টেকনিকাল ভিত্তিতে দেশের উৎপাদনকর বন্দোবস্তটার নিরবচ্ছিন্ন বৃদ্ধি নিশ্চিত করার যাবতীয় ব্যবস্থা নেওয়া চূড়ান্ত গুরুত্বসম্পন্ন।

যন্ত্রপাতি, সরঞ্জাম এবং অন্যান্য উৎপাদনকর উপায়াদি সমাজতন্ত্রের আমলে ব্যবহৃত হয় যুক্তিসম্মতভাবে — এটা পুঁজিতন্ত্রের উপর সমাজতন্ত্রের একটা বিরাট শ্রেষ্ঠত্ব। সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিতে কোন অত্যুৎপাদনের সংকট নেই, উৎপন্ন পণ্যের পরিমাণ দ্রুত বেড়ে চলেছে, তার বাজার যথেষ্ট বিস্তৃত — এতে উৎপাদনকর বন্দোবস্তটার যতখানি ক্ষমতা আছে, সবটাই সক্রিয় থাকে সব সময়েই।

কোন শিল্পপ্রতিষ্ঠানের উৎপাদনকর পরিসম্পৎগুলির যুক্তিসম্মত সদ্ব্যবহারের জন্যে প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব এই কারণে আরও বেড়ে যায়। পূর্ণাঙ্গ পরিব্যয় হিসাবরক্ষণের অবস্থায় কাঁচামাল, অন্যান্য মালমশলা আর সরঞ্জামের সদ্ব্যবহারের উপর নির্ভর করে প্রতিষ্ঠানের লাভের পরিমাণ আর লাভপ্রদতার মাত্রা, কাজেই, প্রবর্তনা তহবিলের পরিমাণও। এই অবস্থায়, কড়াকড়ি মিতব্যয়িতার ব্যবস্থা করতে এবং কাঁচামাল আর অন্যান্য মালমশলা এবং জালানি আর বিদ্যুৎশক্তি উন্নতিমূলক খরচের কোটা ধার্য করতে কর্মিসমষ্টি আগ্রহশীল হয়।

সতর্ক বিলি-বন্দেজ এবং মিতব্যয়িতার জন্যে সংগ্রাম

কাঁচামাল আর অন্যান্য মালমশলা, জালানি আর বিদ্যুৎশক্তি ব্যবহার করায় সতর্ক বিলি-বন্দেজ সামাজিক উৎপাদনের ফলপ্রদতা বাড়াবার একটা অপরিহার্য শর্ত। উৎপাদের প্রতি ইউনিটে মশলা/উৎপাদ এবং বিদ্যুৎশক্তি/উৎপাদ অনুপাত, অর্থাৎ জিনিসটার উৎপাদনে খরচ করা মালমশলা আর বিদ্যুৎশক্তির পরিমাণ নিয়মিতভাবে কমিয়ে আনাই কাজ।

কাঁচামাল, অন্যান্য মালমশলা এবং বিদ্যুৎশক্তি বাঁচাবার অর্থ হল সেগুলির সবচেয়ে লাভজনক সদ্ব্যবহার। এতে আরও বুঝায় যে, উৎপাদনে ঝড়তি-পড়তি নিয়মিতভাবে কমানো চাই, মালমশলা অসতর্কভাবে গুদামজাত করার দরুন কিছু বাতিল কিংবা নষ্ট হওয়া চলবে না। তার উপর, এর আরও অর্থ হল এই যে, শুধু উঁচু মাত্রায় সরেস জিনিসই উৎপন্ন হওয়া চাই — কেননা, নিরেস জিনিস উৎপন্ন করা তো মূল্যবান মালমশলা অপচয় করারই শামিল। উৎপাদের ইউনিটপিছু কাঁচামাল আর অন্যান্য মালমশলা এবং জালানি আর বিদ্যুৎশক্তি খরচের উন্নতিমূলক কোটা ধার্য করাটা মহাতাৎপর্যসম্পন্ন। এইসব

কোটা হওয়া চাই টেকনিকভিত্তিক এবং অগ্রসর প্রযুক্তিবিদ্যা আর উৎপাদন-সংগঠনের আধুনিক মাত্রার অনুযায়ী।

বিভিন্ন অগ্রসর কর্মিসমষ্টি এবং নবপ্রবর্তকদের অভিজ্ঞতা দেখিয়ে দিচ্ছে যে, বৈষয়িক সম্বল-সংস্থানে মিতব্যয়িতার সম্ভাবনা রয়েছে বিস্তর। এইসব সম্ভাবনা রয়েছে শিল্পে, কৃষিতে, নির্মাণে, পরিবহণে, বাণিজ্যে, গবেষণায় আর ডিজাইন করার প্রতিষ্ঠানগুলিতে এবং সরকারী সংস্থাগুলিতে।

সমাজতান্ত্রিক অর্থে মিতব্যয়িতার কোন মিল নেই পুঁজিতান্ত্রিক অর্থলিপ্সার সঙ্গে। পুঁজিতন্ত্রের বিশেষক প্রকৃতিই হল, একদিকে, অতি নিরর্থক অপচয় আর, অন্যদিকে, যাকিছু শ্রমকে অপেক্ষাকৃত সহজ আর উন্নত করে সেগুলির বেলায় কাটছাঁট। তার বিপরীতে, সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনের অর্থ হল ক্ষয়-ক্ষতি আর অপ্রয়োজনীয় খরচার বিরুদ্ধে চূড়ান্ত সংগ্রাম, আর তার সঙ্গে শ্রমকে সহজসাধ্য করা এবং শ্রমের পরিবেশ উন্নততর করার জন্যে গরজ।

এইভাবে, বিদ্যুৎশক্তি যাতে নষ্ট না হয় সেজন্যে ব্যবস্থাদি বলবৎ করা বলতে যেকোন মূল্যে বিদ্যুৎশক্তি বাঁচানো কিংবা যেকোন ক্ষেত্রে এই শক্তিব্যয় কমানো বুঝায় না। তার উলটো, শ্রমে ব্যবহৃত শক্তির পরিমাণবৃদ্ধি এবং উৎপাদনস্থলে আরও ভাল আলো আর বায়ুচলাচলের ব্যবস্থা ইত্যাদির সাহায্যে কাজের পরিবেশের উন্নতিবিধানের সঙ্গে সঙ্গে হওয়া চাই বিদ্যুৎশক্তির যুক্তিসম্মত সদ্ব্যবহার।

মিতব্যয়িতা চলা চাই অত্যন্ত বিচক্ষণতার সঙ্গে। যে-'ব্যয়সংকোচে' উৎপাদের গুণ, নির্ভরযোগ্যতা আর টেকসই হবার অবস্থা ক্ষুণ্ণ হয় কিংবা সরঞ্জামের সঠিক তত্ত্বাবধান ব্যাহত হয়, সেটা কিছুতেই চলতে পারে না। নিরেস জিনিস উৎপাদন করা অতি বিপজ্জনক রকমের অপচয়।

উৎপাদনকর পরিসম্পৎ
ব্যবহার করার বাবত দেওন

উৎপাদনকর পরিসম্পৎগুলি হল জাতীয় সম্পদের মূল বনিয়াদ — সেই হিসেবে, সেগুলির পরিমাণগত আর গুণগত বৃদ্ধি হল সামাজিক শ্রমের উৎপাদিকাশক্তি এবং জাতীয় আয় বাড়াবার প্রধান শর্ত। সমাজ তার সম্পদের একাংশ ব্যবহারের জন্যে কোন প্রতিষ্ঠান আর তার কর্মিদলের হাতে দিয়ে স্বভাবতই আশা করে জাতীয় সম্পদ বাড়াতে তাদেরও অবদান থাকবে। এই অবদানের একটা অংশ হল পরিসম্পৎ ব্যবহার করার বাবত দেওন।

পরিসম্পৎ মুফতে দেওয়াটা পরিকল্পিত সমাজতান্ত্রিক পণ্য উৎপাদনের নীতিবিরুদ্ধ। এতে শিল্পপ্রতিষ্ঠানের কর্মসম্পাদনের একটা বিকৃত চিত্র ফুটে ওঠে, — প্রতিষ্ঠানের ক্রিয়াকলাপের মধ্যে উৎপাদনকর পরিসম্পৎ সদ্ব্যবহারের মাত্রার মতো গুরুত্বপূর্ণ দিকটা তাতে বিবেচনায় ধরা হয় না। কাজেই, উৎপাদনকর পরিসম্পৎ ব্যবহারের পরিমাণ ছাড়া শিল্পপ্রতিষ্ঠানের উৎপাদনব্যয় পুরোপুরি হিসেব করার কোন উপায় নেই। প্রতিষ্ঠানের ব্যবহারের জন্যে উৎপাদনকর পরিসম্পৎ তার হাতে মুফতে দেওয়া হলে ঐ পরিসম্পতের সর্বোচ্চ মাত্রায় সদ্ব্যবহারের প্রবর্তনা আসত না।

শিল্পপ্রতিষ্ঠান যাতে উৎপাদ বাড়াতে আগ্রহান্বিত হয় এবং আরও আগ্রহান্বিত হয় মোট লাভ বাড়াতেই শুধু নয়, তার উপর উৎপাদনের লাভপ্রদতা বাড়াতেও, অর্থাৎ, উৎপাদনকর পরিসম্পতের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট করে লাভের পরিমাণ বাড়াতে, এইজন্যেই উৎপাদনকর পরিসম্পৎগুলি ব্যবহার করার বাবত দেওনের ব্যবস্থা চালু করা হয়। উৎপাদনকর পরিসম্পৎ ব্যবহার

করার বাবত প্রদেয় দামটা এমনই, যাতে সেটা মেটাবার পরে যেকোন সাধারণ-স্বাভাবিকভাবে চালু প্রতিষ্ঠানের লাভের যে-অংশটা হাতে থাকে সেটা দিয়ে প্রবর্তনা তহবিল গড়া এবং পরিকল্পিত ব্যয় মেটানো যায়।

যৌথখামারে পরিব্যয় হিসাবরক্ষণের বিশেষ-নির্দিষ্ট উপাদান

রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলিতেই শুধু নয়, যৌথখামারগুলিতেও যুক্তিসম্মত ব্যবস্থাপনের ভিত্তি হল পরিব্যয় হিসাবরক্ষণ।

কোন রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের মতো যৌথখামারেও সতর্ক-বিচক্ষণ ব্যবস্থাপন বলতে বুঝায় যে, যাবতীয় উৎপাদনব্যয় আর উৎপাদনের ফলাফলের পুরো হিসাব এবং যথাযথ তুলনা।

কোন যৌথখামারের কর্মসম্পাদন বিচার করার নিরিখ হল খামারের উৎপাদের পরিমাণ, গুণ আর উৎপাদন-পরিব্যয়, কিংবা আরও যথাযথভাবে, উৎপাদের ইউনিটপিছু শ্রমব্যয়। যৌথখামারের উৎপাদন-পরিব্যয় হিসাব করার নিজস্ব বিশেষ বিশেষ দিক আছে। এই বৈশিষ্ট্যগুলো আসছে এই ব্যাপারটা থেকে: যৌথখামারে জাতদ্রব্যাদির একটা নির্দিষ্ট অংশ স্বভাবজ রূপেই একই খামারে আরও উৎপাদনের জন্যে ব্যবহৃত হয় (বীজ, পশু), আর অন্য একটা অংশ যৌথখামারীদের মধ্যে বাটোয়ারা করা হয়।

রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের মতো যৌথখামারেও ক্রিয়াকলাপের সাধারণ আর্থনীতিক ফলাফল নির্ধারণ করা হয় উৎপাদনের ব্যয় আর ফলাফলের মধ্যেকার অনুপাত দিয়ে। এর ফলে যৌথখামার কৃষি উৎপাদনের ইউনিটপিছু সামাজিক শ্রম আর বৈষয়িক উপকরণাদির খরচা নিয়মিতভাবে কমাতে আগ্রহান্বিত

হয়। এই সবকিছু যেভাবে করা হয় সেগুলি হল উৎপাদনের উপকরণ আর শ্রমশক্তির সর্বতোভাবে সদ্ব্যবহার করা, শ্রম বাবত পারিশ্রমিক দেবার সমাজতান্ত্রিক নীতি সুষ্ঠুভাবে প্রতিপালন, যৌথখামারের সম্পদের বিলি-বন্দেজে সতর্ক-বিচক্ষণতা, যৌথখামারের সাধারণের সম্পত্তি বাড়িয়ে চলা।

সবচেয়ে মূল্যবান বিভিন্ন ফসল উৎপাদনে যুক্তিসম্মতভাবে জমি ব্যবহার ক'রে যথাসম্ভব সেরা ফল পাওয়া যায়। তার উপর, খামারের সুদক্ষ ব্যবস্থাপনের মধ্যে পড়ে: ভূমি পুনরুদ্ধার, সারের ব্যাপক ব্যবহার, পতিত জমি উদ্ধার করে তাতে চাষআবাদ, বিল থেকে জলনিকাশ, জলসেচ, জলাশয় তৈরি করা, সঠিক শস্যপর্যায় চালু করা।

উৎপাদনের উপকরণের যুক্তিসম্মত সদ্ব্যবহারের অর্থ হল সরঞ্জামের কুশলী সদ্ব্যবহার এবং ব্যাপক যন্ত্রসজ্জা। কাজেই, যৌথ আর রাষ্ট্রীয় খামারগুলিতে আরও বেশি, আরও ভাল সরঞ্জাম সরবরাহ করা এবং উন্নততর কৃষি যন্ত্রপাতির ডিজাইন করা আবশ্যক। প্রযুক্তিগত অগ্রগতির ফলে খামারগুলো কমসংখ্যক যন্ত্র দিয়ে আরও বেশি পরিমাণ কাজ করতে পারে, সেটার ভূমিকা এই প্রসঙ্গে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

সমস্ত কর্মক্ষম যৌথখামারী খামারের কাজে যতখানি সম্ভব ব্যাপকভাবে শামিল হলে যৌথখামারের শ্রম-বলের ব্যাপক সদ্ব্যবহার হয়। কৃতকর্মের গুণ আর পরিমাণ অনুসারে পারিশ্রমিক দেবার সমাজতান্ত্রিক নীতি ঠিকমতো খাটানো এবং শ্রম বাবত পারিশ্রমিক দেবার সবচেয়ে অগ্রসর ধরনের ব্যবস্থা চালু করার উপর যৌথখামারে শ্রম-বলের সবচেয়ে পুরোপুরি সদ্ব্যবহার নির্ভর করে।

যন্ত্রপাতি, সরঞ্জাম, খামারের ঘর-বাড়ি আর স্থাপনাগুলোকে ভাল অবস্থায় বজায় রাখা, কাঁচামাল এবং অন্যান্য মালমশলার

সতর্ক-বিচক্ষণ সদ্ব্যবহার, পশুর তত্ত্বাবধান, ইত্যাদিও যৌথখামারের সম্পদের যুক্তিসম্মত ব্যবহারের অঙ্গ।

উৎপাদনের যন্ত্রসজ্জা, বিদ্যুৎসজ্জা আর রসায়নসজ্জার ভিত্তিতে কৃষিকাজ সমানে নিবিড়তর করে তোলা এবং প্রতিকূল প্রাকৃতিক অবস্থার এলাকাগুলোতে ভূমি-উন্নয়নকাজের ব্যাপক প্রসারই কৃষিজাত দ্রব্যাদির উৎপাদন বাড়াবার প্রধান উপায়।

সাপেক্ষ ভূমি-রাজস্ব

অনপেক্ষ ভূমি-রাজস্ব যে-অবস্থায় দেখা দেয়, সেটা ভূমি রাষ্ট্রীয়করণের ফলে দূর হয়ে গেছে। কিন্তু, সাপেক্ষ ভূমি-রাজস্বের বেলায় তা নয়।

বেশি স্বভাবজ উর্বরাশক্তির ফলে এবং বাজারের কাছাকাছি হবার কারণে কোন কোন জমি থেকে অন্যান্য জমির চেয়ে যে অতিরিক্ত আয় হয়, সেটাকে বলে সাপেক্ষ ভূমি-রাজস্ব।

যেসব যৌথখামারের জমি অন্যান্যের চেয়ে বেশি উর্বর, তাদের জাতদ্রব্যের প্রতি ইউনিটে শ্রম-খরচা কম পড়ে। খামারের নিয়ম-প্রণালী একই হলে, সমান শ্রমব্যয় ক'রে এবং একই মাত্রায় যন্ত্রসজ্জা দিয়ে অপেক্ষাকৃত বেশি উর্বর জমিতে স্থাপিত যৌথখামার অপেক্ষাকৃত নিরেস জমির যৌথখামারের চেয়ে বেশি উৎপাদন করতে পারে।

রেলস্টেশন, জাহাজঘাটা, মালগুদাম, শহর এবং খামারজাত জিনিস বিক্রি করার অন্যান্য জায়গা থেকে বিভিন্ন যৌথখামারের দূরত্বের বিভিন্নতার ফলেও সাপেক্ষ রাজস্ব ওঠে। তার ফলে, ঐসব জায়গা থেকে অপেক্ষাকৃত বেশি দূরের যৌথখামারগুলির চেয়ে অপেক্ষাকৃত কম দূরবর্তী যৌথখামারে উৎপাদের ইউনিটপিছু ব্যয় অপেক্ষাকৃত কম।

সাপেক্ষ রাজস্বের ব্যাপারে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের আর্থনীতিক কর্মনীতির ভিত্তি-সূত্রটা এই: অপেক্ষাকৃত ভাল জমির স্বাভাবিক উর্বরতা এবং ব্যবহারক বাজারের নৈকট্যের ফলে পাওয়া বাড়তি আয় যাবে সাধারণের প্রয়োজন মেটাতে।

কৃষি উৎপাদনের পক্ষে অবস্থার বিভিন্নতা অনুসারে বিভিন্ন এলাকার কৃষিজাতদ্রব্যাদির পৃথক-পৃথক দাম ধার্য করা হয় — প্রধানত এই উপায়ে উপরোক্ত নীতিটিকে রূপায়িত করা হয়। সাপেক্ষ ভূমি-রাজস্বের একাংশ থেকে যায় যৌথখামারের হাতে, সেটা হয় তাদের উৎপাদন সম্প্রসারিত করা এবং যৌথখামারীদের জীবনযাত্রার অবস্থা উন্নততর করার একটা উপায়।

উৎপাদন-পরিব্যয় এবং তার গঠন

কোন প্রতিষ্ঠানের উৎপাদের মূল্য তার উৎপাদনের মোট ব্যয়ের সমান। কোন প্রতিষ্ঠানের উৎপাদ উৎপাদনের প্রত্যক্ষ খরচ-খরচার কয়েকটা অংশ থাকে:

এক, মজুরি — অর্থাৎ, শ্রমিকদের শ্রমের পারিশ্রমিক;

দুই, কাঁচামাল, অন্যান্য মালমশলা আর জালানি বাবত খরচ;

তিন, স্থির পরিসম্পৎ — অর্থাৎ, উৎপাদনে ব্যবহৃত হয়ে নিঃশেষ হওয়া শ্রমের উপকরণ পুনঃস্থাপন করার খরচ-খরচা।

মজুরি দিতে এবং কাঁচামাল, অন্যান্য মালমশলা আর জালানি বাবত খরচ করা অর্থের সবটাই কোন একটা নির্দিষ্ট কালপর্যায়ে উৎপন্ন উৎপাদের পরিব্যয়ের মধ্যে ধরা হয়। কিন্তু, যন্ত্রপাতি, সরঞ্জাম আর উৎপাদনে ব্যবহৃত ঘর-বাড়ি মেরামত, পুনঃস্থাপন আর নবীকরণের বেলায় তা নয়। শ্রমের এইসব উপকরণের সাহায্যে এগুলির সমগ্র কার্যকালে উৎপন্ন মোট

উৎপাদের উৎপাদন-পরিব্যয়ের মধ্যে এইসব খরচ-খরচা ধরা হয় আনুপাতিক অংশভাগে অবচয় বাবত ছাড় হিসেবে। স্থির পরিসম্পৎগুলির সমগ্র কার্যকালে অবচয় বাবত ছাড়ের পরিমাণ এমন হওয়া চাই, যাতে সেটা এইসব স্থির পরিসম্পৎ পাবার জন্যে এবং সেগুলির আংশিক পুনঃস্থাপনা আর আধুনিকীকরণের যাবতীয় খরচের ক্ষতিপূরণের পক্ষে যথেষ্ট হয়।

মজুরি, কাঁচামাল আর অন্যান্য মালমশলার জন্যে খরচ এবং অবচয় বাবত ছাড় ছাড়াও, উৎপাদন-পরিব্যয়ের মধ্যে আরও থাকে কর্মশালাগুলোতে এবং গোটা প্রতিষ্ঠানে উৎপাদন সংগঠনের খরচ-খরচা। এই খরচের মধ্যে পড়ে — পরিচালনকর্মিদল, ইঞ্জিনিয়র, টেকনিশিয়ন এবং সেবাকার্যের কর্মিদলের মজুরি, তাছাড়া, উৎপাদনের ঘর-বাড়ি আর স্থাপনার মেরামতের খরচ, বৈদ্যুতিক সরঞ্জামের কাজ এবং কারখানার ভিতরকার পরিবহণব্যয়। এই সব খরচকে বলা হয় কারখানা আর কর্মশালার সাধারণ খরচ।

শেষে, পুরো উৎপাদন-পরিব্যয়ের মধ্যে আরও থাকে — গুদামজাত করা, প্যাকিং আর পরিবহণের খরচ এবং উৎপাদ বিক্রি করার ব্যাপারে অন্যান্য খরচ-খরচা।

উৎপাদন-পরিব্যয়ের বিভিন্ন অঙ্গ-উপাদানের অনুপাতকে বলা হয় তার গঠন। উৎপাদন-পরিব্যয়ের গঠন শিল্পের বিভিন্ন শাখায় বিভিন্ন; শিল্পের একই শাখায় বিভিন্ন কারখানায়ও সেটা বিভিন্ন হতে পারে কারখানার আকার, প্রযুক্তিগত মান, অবস্থান, ইত্যাদি অনুসারে।

নিষ্কর্ষী শিল্পে উৎপাদন-পরিব্যয়ের একটা বড় অংশ হল মজুরি — কেননা, শ্রমের বস্তু (কয়লা, আকরিক) যোগায় প্রকৃতি। এগুলি শ্রমবহুল শিল্প। অন্যদিকে, কারখানায়-

উৎপাদনের শিল্পে উৎপাদন-পরিব্যয়ের বৃহত্তর অংশটা মালমশলা বাবত খরচ — এগুলি মালমশলাবহুল শিল্প। শিল্পের কোন কোন শাখায় (যেমন, লৌহেতর ধাতুশিল্পে) বিদ্যুৎশক্তি খরচ হয় খুব বেশি — এগুলি শক্তিবহুল শিল্প। আবার, শিল্পের কোন কোন শাখায় সরঞ্জামের অবচয় বাবত ব্যয় খুব বেশি (যেমন, তৈল শিল্পে)। এইসব শিল্পে পুঁজি/উৎপাদ অনুপাতটা চড়া।

দৃষ্টান্তস্বরূপ, ১৯৭১ সালে সমগ্র সোভিয়েত শিল্পে উৎপাদন-পরিব্যয়ের গঠন ছিল মোটামুটি নিম্নলিখিতরূপ: কাঁচামাল এবং অন্যান্য মালমশলা ৬৪·১ শতাংশ, আনুষঙ্গিক মালমশলা ৪·৬ শতাংশ, জালানি ৩·৮ শতাংশ, বিদ্যুৎশক্তি ২·৫ শতাংশ, অবচয় বাবত ৫·৩ শতাংশ, মজুরি আর সমাজবিমা বাবত ১৫·৫ শতাংশ, অন্যান্য খরচ ৪·২ শতাংশ।

সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিতে দাম

কোন সমাজতান্ত্রিক শিল্পপ্রতিষ্ঠানে উৎপন্ন পণ্যের দাম হল সেটার মূল্যের আর্থিক রূপ। মূল্য-সংক্রান্ত নিয়ম আয়ত্ত ক'রে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র পণ্যের দাম ধার্য করে সেটার উৎপাদনে শ্রমের সামাজিকভাবে আবশ্যক ব্যয়ের ভিত্তিতে।

সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিতে দাম-সংক্রান্ত ব্যবস্থাটাকে অবিরাম উন্নততর ক'রে প্রযুক্তিগত অগ্রগতি, উৎপাদন আর ভোগ-ব্যবহারের বৃদ্ধি এবং উৎপাদনব্যয়হ্রাসের অনুযায়ী করা দরকার। দামে ক্রমাগত বেশি মাত্রায় প্রতিফলিত হওয়া চাই সামাজিকভাবে আবশ্যক শ্রমব্যয়, উৎপাদন আর প্রচলনের খরচা উঠে আসা চাই, আর সাধারণ-স্বাভাবিকভাবে চালু প্রত্যেকটা শিল্পপ্রতিষ্ঠানের কিছু লাভ থাকা চাই।

সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিতে দামের একটা বড়রকমের নির্দিষ্ট ক্রিয়া আছে। দাম, এই সাধারণ নিরিখটার সাহায্যে উৎপাদনের সমস্ত খরচ-খরচার মোট পরিমাণ নির্ধারণ ক'রে সেটাকে উৎপাদনের ফলাফলের সঙ্গে তুলনা করা হয়। দামের মধ্যে দেখা যায় সমগ্র অর্থনীতির এবং প্রত্যেকটা শিল্প-প্রতিষ্ঠানের খরচ-খরচা আর ফলাফল। জাতীয় অর্থনীতির পরিকল্পিত ব্যবস্থাপনের সমস্ত সূত্র এসে মেলে দাম-সংক্রান্ত ব্যবস্থা এই কেন্দ্রবিন্দুতে। অর্থনীতির পৃথক-পৃথক শাখার ভিতরকার এবং বিভিন্ন শাখার মধ্যেকার সমস্ত জটিল সম্পর্কের সমন্বয়বিধান করে দাম। উৎপাদন-পরিব্যয় নির্ভর করে কাঁচামাল আর অন্যান্য মালমশলার দাম এবং বিদ্যুৎশক্তি আর পরিবহণের মাসুলের উপর, অন্যদিকে উৎপাদন-পরিব্যয়ের কোন নির্দিষ্ট মাত্রায় লাভ নির্ভর করে শিল্পপ্রতিষ্ঠানে উৎপন্ন জিনিসের দামের উপর।

শিল্পোৎপন্নের দামে প্রতিফলিত হয় এই দুইয়ের একটা — হয় পরিব্যয় হিসাবরক্ষণের ভিত্তিতে চালু বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের মধ্যেকার সম্পর্ক (পাইকারী দাম), নইলে ভোগ্য পণ্য বণ্টনের ক্ষেত্রে রাষ্ট্র এবং সমাজতান্ত্রিক সমাজের পৃথক-পৃথক লোকের মধ্যেকার সম্পর্ক (খুচরা দাম)। রাষ্ট্র এবং যৌথখামারের মধ্যেকার সম্পর্ক প্রকাশ পায় যৌথখামারের জাতদ্রব্যের কেনা-দামে।

কোন পণ্যের দামের বনিয়াদ হল শিল্পের শাখায় সেটার গড় উৎপাদন-পরিব্যয়। কিন্তু, সেটা উৎপাদন-পরিব্যয়ের সমান হতে পারে না। ঐ উৎপাদন-পরিব্যয়ের মধ্যে থাকে কোন উৎপাদের জন্যে সামাজিকভাবে আবশ্যক ব্যয়ের শুধু একাংশ, অর্থাৎ, কাঁচামাল আর অন্যান্য মালমশলার খরচ, স্থির পরিসম্পতের অবচয় এবং প্রদত্ত মজুরি। তার সঙ্গে সঙ্গে,

উৎপন্ন পণ্যে অঙ্গীভূত থাকে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির শ্রমিকের উদ্বৃত্ত মূল্য, সেটার মূল্য উৎপাদন-পরিব্যয়ের মধ্যে ধরা হয় না। এইভাবে, পণ্য উৎপাদনে প্রযুক্ত সামাজিকভাবে আবশ্যক ব্যয়ের সবটা উৎপাদন-পরিব্যয়ের মধ্যে পড়ে না — কাজেই, সেটা থেকে লাভ আর সঞ্চয়ন হতে পারে না।

পণ্যে অঙ্গীভূত থাকে উৎপাদনে সামাজিকভাবে আবশ্যক ব্যয়ের মোট পরিমাণটা — এই পণ্যের দাম হয় পণ্য বাবত সংশ্লিষ্ট শাখার গড় পরিব্যয় এবং তার উপর একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ লাভ। সমাজের উৎপন্ন সমস্ত পণ্যের দামের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত লাভের মোট পরিমাণটা সামাজিক উৎপাদনে ব্যয় করা মোট উদ্বৃত্ত শ্রমের মূল্যের সমান। সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির উৎপন্ন সমস্ত পণ্যের দামের মোট পরিমাণটা সেগুলির মোট মূল্যের সমান।

পণ্য উৎপাদনের শ্রম/উৎপাদ অনুপাত এবং মালমশলা/উৎপাদ অনুপাত দেখা যায় উৎপাদন-পরিব্যয়ের মধ্যে, আর লাভের মধ্যে আরও প্রকাশ পাওয়া চাই পরিসম্পৎ/উৎপাদ অনুপাত। যে-উৎপাদ উৎপাদনে সমাজ থেকে বেশি পরিমাণ পুঁজি বিনিয়োগ করা (অর্থাৎ, স্থির আর চলতি উৎপাদনকর পরিসম্পতের মোটারকমের ব্যয়) দরকার হয়, তার পরিব্যয়টা যার উৎপাদনে পুঁজি বিনিয়োগ করা লাগে অপেক্ষাকৃত কম, সেই উৎপাদের চেয়ে বেশি। তদনুসারে, উৎপন্ন পণ্যের দামের মধ্যে সাধারণত থাকা চাই পরিব্যয় ছাড়াও তদুপরি ছাঁকা লাভের একটা নির্দিষ্ট অংশ; এই অংশটার পরিমাণ নির্ভর করে পণ্যের পরিসম্পৎ/উৎপাদ অনুপাতের উপর।

আগেই দেখা গেছে, দাম হল সর্বাগ্রে পরিকল্পিত সমাজতান্ত্রিক পণ্য উৎপাদনে পরিব্যয় হিসাবরক্ষণের একটা

সাধারণ উপায়। সঙ্গে সঙ্গে, দাম-নিরিখটা আরও কয়েকটা কাজেও আসে। দাম এমনভাবে ধার্য করা হয়, যাতে প্রযুক্তিগত অগ্রগতি প্রবলতর হয়, উৎপাদন সম্প্রসারিত হয়, উৎপাদন-পরিব্যয় সমানে কমে আসে। নির্দিষ্ট কোন কোন পণ্যের উৎপাদন বাড়াবার সঙ্গে ঐসব জিনিসের জন্যে ব্যবহারকদের চাহিদা যাতে সমন্বিত হয়, সেইভাবেও দাম ধার্য হয়। দাম আর তার বনিয়াদের মধ্যে পরিকল্পিত বিচ্যুতির আবশ্যকতার ভিত্তি এটাই।

বিভিন্ন বিরল কাঁচামালের বিচক্ষণ-সতর্ক ব্যয় এবং নতুন-নতুন মালমশলার সদ্ব্যবহারের আনুকূল্য করা — দাম-সংক্রান্ত কর্মনীতির একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক। পৃথক-পৃথক পণ্যের দামের অনুপাত এমনভাবে ধার্য করা হয় যাতে যেসব জিনিসের উৎপাদন দ্রুত সম্প্রসারিত করা যায় (কাঁচামাল, উৎপাদন সামর্থ্য, ইত্যাদি থাকায়), সেগুলির ব্যবহার বেড়ে যায়।

বিনিময়ে পণ্যগুলির সঠিক দাম ধার্য করাটা চূড়ান্ত গুরুত্বসম্পন্ন। এসব ক্ষেত্রে, যেসব পণ্য জাতীয় আর্থনীতিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে অপেক্ষাকৃত বেশি লাভজনক, সেগুলির উৎপাদন বাড়াতে দাম অনুকূল হওয়া দরকার।

প্রযুক্তিবিদ্যার সমানে উন্নতিবিধানের পক্ষে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের দাম-সংক্রান্ত কর্মনীতি সহায়ক। দাম এমন হওয়া চাই যাতে অপেক্ষাকৃত বেশি সূক্ষ্ম-জটিল ধরনের সরঞ্জাম, যন্ত্রপাতি আর মাপনযন্ত্র উৎপাদন বাড়ে। সঙ্গে সঙ্গে, যেসব পণ্য টেকনিকের দিক থেকে সেকেলে হয়ে যায়, শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলি যাতে সেগুলির উৎপাদন বন্ধ করে দেয়, দাম তার সহায়ক হওয়া দরকার।

শিল্পপ্রতিষ্ঠানের সাধনসাফল্য মূল্যায়নে লাভের তাৎপর্য

অর্থনীতিতে আবশ্যক সমানুপাত বজায় রাখার জন্যে প্রত্যেকটা শিল্পপ্রতিষ্ঠানের বিক্রি করা উৎপাদের পরিমাণ এবং মূল উৎপাদতালিকার বিষয়ে নির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা সংসাধন করা চাই। এইসব লক্ষ্যমাত্রা পূরণ হলে প্রতিষ্ঠানের সাধনসাফল্যের সবচেয়ে সাধারণ নিরিখ বলে বিবেচিত হয় নিম্নলিখিত দুটো জিনিস: উৎপাদনে মোট ব্যয় এবং তৈরি উৎপাদ বিক্রি করে পাওয়া অর্থের মধ্যেকার বিয়োগফল — লাভ, এবং মোট লাভ আর উৎপাদনকর পরিসম্পৎগুলির মধ্যেকার অনুপাত — লাভপ্রদতা।

বিক্রি করা উৎপাদের পরিমাণ, লাভের মোট পরিমাণ এবং লাভপ্রদতার সূচকগুলোর মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। বিক্রি করা উৎপাদের পরিমাণটা উৎপাদনের ফলাফলের প্রকৃতিনির্দেশ করে, কিন্তু সেটা আপনাতে উৎপাদনের ব্যয় সম্বন্ধে কোন তথ্য যোগায় না। উৎপাদনে মোট ব্যয়ের হিসাব পাওয়া যায় উৎপাদন-পরিব্যয়ে। তবু, কেবল এই সূচকটার ভিত্তিতেই উৎপাদনের ফলাফল মূল্যায়ন করা অসম্ভব। উৎপাদন-পরিব্যয় কমানো খুবই গুরুত্বসম্পন্ন কাজ হলেও, সমাজের সম্পদ যে বাড়ে, সেটা উৎপাদের ইউনিটপিছু পরিব্যয় কমিয়েই শুধু নয়, — উৎপন্ন আর বিক্রি-করা উৎপাদের পরিমাণ বাড়িয়ে এবং উৎপাদ আরও সরেস করার ফলেও সেটা হয়।

লাভ, এই সূচকটা গুরুত্বপূর্ণ — কেননা, শিল্পপ্রতিষ্ঠানের উৎপাদন ক্রিয়াকলাপের সমস্ত দিকই এতে প্রতিফলিত হয়। কাঁচামালের মিতব্যয়িতা, সরঞ্জামের আরও সুষ্ঠু প্রয়োগ, শ্রমের উৎপাদিকাশক্তিবৃদ্ধি, ইত্যাদি — প্রতিষ্ঠানের কাজে যেকোন

উন্নতির ফলে লাভ বাড়ে, আর লাভ কমে যায় প্রতিষ্ঠানের কাজে যেকোন অবনতি ঘটলে। উৎপাদন সম্প্রসারিত করে পাওয়া বেশি আয় থেকে এবং উৎপাদন-পরিব্যয়সংকোচের উপায়ে খরচা কমাবার ফলে লাভ বাড়ে। কাজেই, কোন শিল্পপ্রতিষ্ঠানের সাফল্যের ম্‌ল্যায়নে লাভই সবচেয়ে সাধারণ নিরিখ।

লাভপ্রদতা, এই স্‌চকটার নির্দিষ্ট ক্রিয়া খ্‌বই গ্‌র্‌ত্বসম্পন্ন, এতে উৎপাদনের ফলপ্রদতা পরিলক্ষিত হয়, — উৎপাদনকর পরিসম্পতের প্রতি-র্‌বলে লাভ যত বেশি, ততই বেশি হয় ফলপ্রদতা।

আর্থিক নিয়ন্ত্রণ

উৎপাদ বিক্রি করে পাওয়া অর্থ, ব্যাঙ্কের ক্রেডিট, বাজেটে প্রদত্ত অর্থ — কোন শিল্পপ্রতিষ্ঠানের এই সমস্ত আর্থিক সংস্থান রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্কে এই প্রতিষ্ঠানের আমানতে জমা হয়।

অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে এবং বিভিন্ন সংস্থা, সংগঠন আর আর্থিক ব্যবস্থার সঙ্গে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান হিসাবনিকাশ করে লিখিত হ্‌ন্ডি দিয়ে। মজ্‌রি দেওয়া এবং আরও কোন-কোন খরচের জন্যে টাকা তোলা হয় ঐ আমানত থেকে। কোন-কোন বিরল ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষের মত না নিয়েই আমানত ডেবিট করে দেওয়া হতে পারে: সাধারণত, যারা বাকি-বকেয়ায় পড়ে এবং পরিকল্পিত আর্থিক শ‌ৃঙখলা লঙঘন করে, কেবল তেমনি প্রতিষ্ঠানের বেলায়ই এমনটা হয়।

প্রতিষ্ঠানের ব্যাঙক অ্যাকাউন্ট বাস্তবিকপক্ষে সেটার খাজাঞ্চী — কেননা, প্রতিষ্ঠানের সমস্ত আয় আর ব্যয় এর ভিতর দিয়ে চলে। উৎপাদন আর বিক্রির পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রাগ্‌লো কীভাবে সংসাধিত হচ্ছে না হচ্ছে, তার সঠিক চিত্র পাওয়া যায় ঐ অ্যাকাউন্টে অর্থ আমানত করা থেকে। ঐ প্রতিষ্ঠানের

আমানতের অবস্থা এবং তার আর্থিক বিবরণী আর তহবিল থেকে ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানের পরিকল্পনা সংসাধনে অগ্রগতি সম্বন্ধে সঠিক ধারণা পেতে পারে। আবশ্যক হলে, প্রতিষ্ঠানের উচ্চতর আর্থনীতিক সংস্থাগুলির কাছে প্রতিষ্ঠানের আর্থিক অবস্থা এবং তার কাজের উন্নতিবিধানের জন্যে ব্যবস্থা নেওয়া সম্বন্ধে ব্যাঙ্ক যথাসময়ে হুঁশিয়ারি জানায়। ব্যাঙ্ক এইভাবে প্রত্যেকটা প্রতিষ্ঠানের ক্রিয়াকলাপের উপর আর্থিক নিয়ন্ত্রণ খাটায়।

নিজ ক্রিয়াকলাপের ফলাফলের উপর এবং অন্যান্য — ব্যবহারক আর যোগানদার — প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে চুক্তির দায়-দায়িত্ব পালন করার উপর প্রতিষ্ঠানের যে আর্থিক নির্ভরশীলতা থাকে, সেটাই ঐ নিয়ন্ত্রণের ভিত্তি। প্রতিষ্ঠানের কাজকর্ম যত ভাল হয়, কাঁচামাল আর অন্যান্য মালমশলা এবং জালানি আর অর্থ যত বেশি হিসেব করে বিচক্ষণতার সঙ্গে ব্যবহার করা হয়, আর পরিসম্পতের পরিবৃত্তি হয় যত বেশি দ্রুত, ততই আরও ভাল হয়ে ওঠে প্রতিষ্ঠানের আর্থিক অবস্থা।

অন্যদিকে, চমৎকারভাবে পরিচালিত প্রতিষ্ঠানেরও আর্থিক অবস্থা অসন্তোষজনক হতে পারে — যদি তার উৎপাদের খদ্দের টাকা বাকি ফেলে, কিংবা কাঁচামাল, অন্যান্য মালমশলা এবং জালানির যোগানদার যদি জিনিস অসময়ে যোগায় কিংবা যদি দেয় নিরেস মাল ইত্যাদি। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান এবং আর্থনীতিক সংগঠনের মধ্যে পারস্পরিক নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনটা এর থেকে স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

প্রতিষ্ঠানের প্রবর্তনা তহবিল

প্রতিষ্ঠানের লাভের একটা অংশ কেটে নিয়ে গড়া হয় বৈষয়িক প্রবর্তনা তহবিল, সামাজিক আর সাংস্কৃতিক উদ্দেশ্যে

আর গৃহনির্মাণের জন্যে বিভিন্ন তহবিল এবং উৎপাদন উন্নয়ন তহবিল।

বৈষয়িক প্রবর্তনা তহবিল হল বোনাস দেবার জন্যে। সারা বছর ধরে উৎপাদনের উঁচু মাত্রায় সূচকের জন্যেই বারবার বোনাস দেওয়া হয় শুধু তা নয়, এক বছরে প্রতিষ্ঠানের ক্রিয়াকলাপের ফলাফল অনুসারে বছরের শেষে থোক টাকার পারিতোষিক হিসেবেও বোনাস দেওয়া হয়।

প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের বিভিন্ন জরুরী প্রয়োজন মেটাবার জন্যেই সামাজিক আর সাংস্কৃতিক ব্যবস্থাবলি এবং গৃহনির্মাণের তহবিল। গৃহনির্মাণ আর সামাজিক উন্নয়ন, প্রতিষ্ঠানের মালিকানাধীন বাড়িগুলোর মেরামত, কর্মীদের কল্যাণ আর চিকিৎসাব্যবস্থার উন্নতিবিধান, বিশ্রামাগারে আর স্বাস্থ্যনিবাসে থাকার টিকিট কেনা এবং থোক টাকা অনুদানের জন্যে অর্থ যোগানো হয় এই তহবিল থেকে।

নতুন সরঞ্জাম কেনা, চালু সরঞ্জামের আধুনিকীকরণ এবং উৎপাদন সম্প্রসারণের জন্যে ব্যবহৃত হয় উৎপাদন উন্নয়ন তহবিল।

কাজে শ্রমিকদের ব্যক্তিগত সাফল্যের জন্যে শুধু নয়, সমগ্রভাবে প্রতিষ্ঠানের অর্থনীতিগত ফলপ্রদ কাজের জন্যে বৈষয়িক পারিতোষিক দিতেও ব্যবহৃত হয় প্রবর্তনা তহবিল। এর ফলে শ্রমজীবীদের বৈষয়িক স্বার্থবোধ জাগে, শুধু তাই নয়, সমগ্রভাবে প্রতিষ্ঠানের স্বার্থ সম্বন্ধে তাদের গরজও বাড়ে, কর্মস্থানের প্রতি তাদের টান বাড়ে।

সামাজিক শ্রমের সমাজতান্ত্রিক সংগঠন

১। সমাজতান্ত্রিক শ্রম-সংগঠনের প্রধান-প্রধান দিক

সর্বোচ্চ রূপের সামাজিক শ্রম-সংগঠন — সমাজতন্ত্র

প্রত্যেকটা উৎপাদনপ্রণালীর থাকে নিজস্ব সামাজিক শ্রম-সংগঠন।

সামন্ততান্ত্রিক শ্রম-সংগঠনটাকে বজায় রাখত চাবুকের শৃঙ্খলা এবং মুষ্টিমেয় ভূস্বামীদের দ্বারা শোষিত মেহনতী মানুষের চূড়ান্ত গরিবি আর উৎপীড়ন। ভুখার শৃঙ্খলার উপর ভর করে রয়েছে পুঁজিতান্ত্রিক শ্রম-সংগঠন — তাতে মেহনতী জনসাধারণ হল মজুরি-খাটানো দাস, তাদের উপর চলে ছোট এক দঙ্গল পুঁজিপতির শোষণ। আর, লেনিন বলেছিলেন, সামাজিক শ্রমের কমিউনিস্ট সংগঠন, যার প্রথম পর্ব হল সমাজতন্ত্র, সেটা ভূস্বামী আর পুঁজিপতিদের শাসন উচ্ছেদ করা শ্রমজীবী জনগণের স্বাধীন এবং সচেতন শৃঙ্খলার উপর নির্ভর করে — সমাজতান্ত্রিক সমাজ কমিউনিজমের দিকে এগোতে থাকার মধ্যে এই শ্রম-সংগঠন ক্রমাগত অধিকতর মাত্রায় নির্ভর করবে ঐ শৃঙ্খলার উপর।

ক্ষমতায় আসার পরে শ্রমিক শ্রেণী একটা উচ্চতর ধরনের সামাজিক শ্রম-সংগঠনের প্রতীক হয় এবং সেটাকে বাস্তবে রূপায়িত করে। এটাই কমিউনিজমের ক্ষমতার উৎস এবং

অবশ্যম্ভাবী পূর্ণাঙ্গ চূড়ান্ত জয়ের একটা নিশ্চায়ক। পুঁজিতন্ত্রের আমলে শ্রমের উৎপাদিকাশক্তি যা হয়, তার চেয়ে বেশি সম্ভব হয় সামাজিক শ্রমের উচ্চতর ধরনের সংগঠনের ফলে। নতুন, উচ্চতর সমাজব্যবস্থার বিজয়ের জন্যে শ্রমের উৎপাদিকাশক্তি সবচেয়ে প্রধান, সবচেয়ে গুরুত্বসম্পন্ন।

উৎপাদনের উপকরণে ব্যক্তিগত মালিকানা খতম হবার পরে তার জায়গায় সামাজিক মালিকানা এলে উৎপাদনের উপকরণ আর শ্রমজীবী জনগণের বিপরীতে থাকে না — সেটা হয় তাদের সম্পত্তি, সেটাকে তারা ব্যবহার করে সমগ্র সমাজের স্বার্থে উৎপাদনের উপকরণের সঙ্গে শ্রমশক্তির একীভবন ঘটে নতুন, উচ্চতর বনিয়াদে। এই বনিয়াদটা বৃহদায়তনের উৎপাদন, তার অবলম্বন হল উৎপাদনের উপকরণে সামাজিক মালিকানা এবং আধুনিক বিজ্ঞান আর উঁচু মাত্রায় উন্নীত প্রযুক্তিবিদ্যার প্রয়োগ।

সমাজতন্ত্র সমাজজীবনে যে-রূপান্তরণ ঘটিয়েছে, তার ফলে সমাজে শ্রমের স্থান এবং শ্রমের প্রতি লোকের মনোভাব, এই দুইয়েতেই মূলগত পরিবর্তন ঘটে গেছে। সমাজতান্ত্রিক সমাজে শ্রম তো আর পীড়নকর জোয়াল নয়। সমাজতান্ত্রিক সমাজে শ্রম মুক্ত, তার সবটা ফলই লাগে সমাজের উপকারে, সমস্ত শ্রমজীবী মানুষের উপকারে।

এর ফলে শ্রম সম্বন্ধে লোকের বিবেচনার ধারা মূলগতভাবে বদলে যায়। সমাজতান্ত্রিক সমাজে শ্রমকে লোকে মুখ্য কতর্ব্যকর্ম বলে মনে করে।

সামাজিক শ্রমের সমাজতান্ত্রিক সংগঠন সর্বাগ্রে শ্রমকে মুক্ত করে শোষণের শৃঙ্খল থেকে। যুগযুগান্তরের শাসক শোষকদের জন্যে জবরদস্তির চাপে করা দাস-শ্রম থেকে নিজের জন্যে শ্রম, সমগ্র সমাজের ভালর জন্যে শ্রম — এই বিরাট

পরিবর্তনটা হল সমাজতন্ত্র। তার উপর, এ শ্রমের বনিয়াদ হল আধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যা আর সংস্কৃতির যাবতীয় সাধনসাফল্য।

সমগ্র জনগণের সম্পত্তি যেসব প্রতিষ্ঠান, সেগুলিতে সমস্ত শ্রমিককে মজুরি দিয়ে কাজে লাগায় রাষ্ট্র। এইভাবে, মজুরি দিয়ে কাজে লাগানোর মধ্যে প্রকাশ পায় পৃথক-পৃথক শ্রমজীবী এবং সমগ্র সমাজের মধ্যেকার সম্পর্ক — সেটা বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যেকার সম্পর্ক নয়।

একটা শ্রেণী তার শ্রমশক্তি বিক্রি করে অন্য একটা শ্রেণীর কাছে, এমন দুটো শ্রেণী সমাজতান্ত্রিক সমাজে থাকতে পারে না, নেই। শ্রমশক্তি আর পণ্য নয় — এটাকে বেচা কিংবা কেনা চলে না। শ্রমিক শ্রেণী যেসব প্রতিষ্ঠানে শ্রম খাটায়, সেগুলি সবার সঙ্গে মিলে তাদের যৌথ সম্পত্তি।

এর সঙ্গে সঙ্গে, পুঁজিতন্ত্রের আমলে যেসব অবস্থায় মেহনতীদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা অনিবার্য, সেগুলো ঝেঁটিয়ে বিদেয় হয়ে যায় শোষণ আর বেকারি খতম হবার ফলে। সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন-সম্পর্ক হল বন্ধুত্বপূর্ণ মেজাজে পরস্পরের সমকক্ষ হবার জন্যে প্রতিযোগিতার সম্পর্ক এবং শ্রমে সহযোগিতা আর পারস্পরিক সহায়-সমর্থনের সম্পর্ক।

আবশ্যক এবং উদ্বৃত্ত শ্রম

সমাজতান্ত্রিক সমাজে লোকের শ্রমের মধ্যে থাকে দুটো অংশ — এক, আবশ্যক শ্রম, তার ফল দিয়ে মেটে লোকের খাদ্য, পোশাক-পরিচ্ছদ, বাসস্থান, সাংস্কৃতিক সুযোগ-সুবিধা, ইত্যাদি প্রত্যক্ষ প্রয়োজনগুলো এবং, দুই, উদ্বৃত্ত শ্রম, তার ফল দিয়ে মেটে বিভিন্ন সামাজিক চাহিদা আর প্রয়োজনগুলো।

জনগণের প্রত্যক্ষ প্রয়োজনগুলো মেটাবার জন্যে আবশ্যক

পরিমাণের উপরি শ্রম — উদ্বৃত্ত শ্রম — থাকেই যেকোন রূপের সমাজে। উদ্বৃত্ত শ্রম এবং উদ্বৃত্ত শ্রম-ফল ছাড়া উৎপাদন-বলগুলোর আর উন্নয়ন সম্ভব হয় না, কাজেই সামাজিক প্রগতিও না।

সমাজতান্ত্রিক সমাজে উদ্বৃত্ত শ্রম অবশ্যপ্রয়োজনীয় প্রথমত সঞ্চয়নের জন্যে। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি বিভিন্ন ঢালাও নির্মাণ কর্মসূচি সংসাধন করেছে এবং করে চলেছে উদ্বৃত্ত শ্রম-ফলের একটা নির্দিষ্ট অংশ সঞ্চয়নের ভিতর দিয়েই। দ্বিতীয়ত, উদ্বৃত্ত শ্রম-ফলের একাংশ দিয়ে মেটে পরিচালন-কর্মিবাহিনীর ভরণপোষণের ব্যয় এবং শিক্ষা আর জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থা বজায় রাখার খরচ-খরচা, তাছাড়া, সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের প্রতিরক্ষাক্ষমতাও গড়া হয়। তৃতীয়ত, সমাজে যারা কর্মক্ষমতাহীন হয়ে পড়ে — বৃদ্ধ আর অসুস্থ — তাদের এবং শিশুদেরও ভরণপোষণের জন্যে যায় উদ্বৃত্ত শ্রম-ফলের একটা অংশ। চতুর্থত, উদ্বৃত্ত শ্রম-ফলের আর-একটা অংশ নিয়ে গড়া হয় রিজার্ভ, আপতিক খরচ-খরচার জন্যে তহবিল, — এটা প্রাকৃতিক দুর্যোগের পরিণতির সঙ্গে মোকাবিলা করা এবং পরিকল্পনে কোন ভুল হিসেব হলে সেটার সামঞ্জস্যবিধানের জন্যে।

কাজ করার অধিকার

সামাজিক শ্রমের সমাজতান্ত্রিক সংগঠন কাজ করার অধিকার নিশ্চিত করে। যে-সমাজব্যবস্থায় বেকারি থাকবে না, থাকবে না আর্থনীতিক সংকট, যার ফলে পুঁজিতান্ত্রিক সমাজে কিছুকাল অন্তর-অন্তর রাশি-রাশি শ্রম-ফল আর প্রচুর পরিমাণে বৈষয়িক সম্পদ নষ্ট করে ফেলা হয়, সেজন্যে শ্রমজীবী মানুষ পুরুষের

পরে পুরুষ ধরে যে প্রবল কামনা করে এসেছে, সেটা বাস্তবে কায়েম হয়েছে ইতিহাসে এই প্রথম।

কাজ করার অধিকারটাকে পুঁজিতন্ত্রের আমলে খাটানো যায় না। পুঁজিতন্ত্র মানে অন্য একটা 'অধিকার' — 'অপরের শ্রমের উপর অধিকার', সে-অধিকার খাটাতে পারে কেবল শোষকেরাই। আর সমাজতন্ত্র 'অপরের শ্রমের উপর' শোষকদের অধিকার বাতিল করে, প্রতিষ্ঠা করে সমস্ত মানুষের কাজ করার অধিকার, অর্থাৎ, নিশ্চিত কাজ আর তার পরিমাণ আর গুণ অনুসারে পারিশ্রমিক পাবার অধিকার। অর্থনীতির পরিকল্পিত সমাজতান্ত্রিক সংগঠন, উৎপাদন-বলগুলির সমানে বৃদ্ধি, সংকটের সম্ভাবনা দূর করা এবং বেকারি খতম হবার কল্যাণে কাজ করার অধিকার নিশ্চিত হয়।

সর্বজনীন এবং আবশ্যিক শ্রম

সামাজিক শ্রমের সমাজতান্ত্রিক সংগঠন শ্রমকে করে তোলে সর্বজনীন এবং আবশ্যিক।

কাজ করার অধিকার বলতে সঙ্গে সঙ্গে বুঝায়, সমাজকল্যাণের জন্যে সবাইকে কাজ করতে হবে সততার সঙ্গে এবং বিবেকবুদ্ধি অনুসারে। সামাজিক শ্রমে শামিল হয় না পরজীবী শ্রেণীগুলো — সেগুলোর অবসান ঘটায় সমাজতন্ত্র। বেকারি আর সংকট বাতিল ক'রে সমাজতন্ত্র মানুষকে বাধ্যতামূলক কর্মহীনতা থেকে উদ্ধার করে।

সমাজতন্ত্রের আমলে শ্রমের সর্বজনীন আর আবশ্যিক প্রকৃতিটা প্রকাশ পায় এই নীতিতে — 'যে কাজ করে না, সে খেতেও পাবে না'। লেনিন বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে বলে গেছেন, এই নীতিটা সমাজতন্ত্রের বনিয়াদ, তার শক্তির অব্যর্থ উৎস, তার চূড়ান্ত বিজয়ের নিশ্চয়তা।

শ্রমজীবীদের অনগ্রসর অংশগুলির মনে পুঁজিতন্ত্রের অবশেষগুলোর বিরুদ্ধে সুদৃঢ় আক্রমণ ছাড়া, সামাজিকভাবে কেজো শ্রম যারা এড়িয়ে চলে তাদের বিরুদ্ধে, অবশিষ্ট পরজীবীদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ছাড়া, জবরদস্তির চাপে শোষকের জন্যে করা শ্রমের জায়গায় নিজের তরফে, গোটা সমাজের জন্যে শ্রম বলবৎ করা যায় না।

সর্বজনীন এবং আবশ্যিক শ্রম সমাজতন্ত্র আর কমিউনিজম দুইয়েরই একটা অন্তর্নিহিত উপাদান।

শ্রমে প্রবর্তনা যোগাবার সমাজতান্ত্রিক পদ্ধতি

কাজের জন্যে নতুন-নতুন প্রবর্তনা যোগানোটা সামাজিক শ্রমের সমাজতান্ত্রিক সংগঠনের সবচেয়ে গুরুত্বসম্পন্ন একটা উপাদান।

শত-শত বছর ধরে গড়ে তোলা পদ্ধতিতে পুঁজিতন্ত্র লোককে কাজে প্রবৃত্ত করায়। পুঁজির মজুরি খাটানো দাসদের নিঙড়ে যতখানি সম্ভব কাজ আদায় করে নেবার জন্যে পুঁজিপতিরা আজও অবধি নতুন-নতুন কায়দা বের করে চলেছে। স্বভাবতই, লোককে কাজে প্রবৃত্ত করাবার নতুন, সমাজতান্ত্রিক পদ্ধতি গড়ে তোলাটা কিছু সহজ-সরল ব্যাপার নয় — সেজন্যে দরকার বিস্তর সযত্ন আর ধৈর্যশীল কাজ।

মানুষের উপর মানুষের শোষণ খতম হয়ে গেলে যাবতীয় শ্রম-ফল আসে সমাজের জন্যে, সেগুলিকে ব্যবহার করা হয় শ্রমজীবীদের নিজেদেরই ভালর জন্যে। সমাজতন্ত্রের আমলে উৎপাদনের ফলাফলে জনগণের প্রগাঢ় আগ্রহের মূলটা এখানেই — এই আগ্রহ থাকে না পুঁজিতন্ত্রের আমলে। সমাজতান্ত্রিক সমাজে ব্যয় করা শ্রম এবং তার বাবত পারিশ্রমিকের

মধ্যেকার সম্পর্কটা প্রত্যেকটি শ্রমিকের বোধ করা চাই। 'প্রত্যেকে দেবে সামর্থ্য অনুসারে, পাবে কাজ অনুসারে', — এই সমাজতান্ত্রিক নীতিটাকে বাস্তবে রূপায়িত ক'রে সেটা সংসাধন করা হয়। এই সূত্রটির মর্মবস্তু খুবই মূল্যবান। এর অর্থ হল, এক, সমাজের প্রত্যেকেই যথাসাধ্য কাজ করবে, এবং, দুই, যারা কাজ করে তারা প্রত্যেকেই সমাজ থেকে তার কাজের পরিমাণ আর গুণ অনুসারে পারিতোষিক পাবার অধিকারী।

পুঁজিতন্ত্র এবং অন্যান্য শোষণকর ব্যবস্থায় অধিকার আর কর্তব্যকর্মের মধ্যে যে ফারাক থাকে, সেটাকে সমাজতন্ত্র দূর করে দেয়। সমাজতান্ত্রিক সমাজে উৎপাদনের উপকরণ সমস্ত কর্মক্ষম মানুষের নাগালের মধ্যে, — উৎপাদনের উপকরণ তো সাধারণের সমাজতান্ত্রিক সম্পত্তি। এমন অবস্থায় প্রত্যেকে কাজ করে নিজের এবং সমাজের কল্যাণের জন্যে।

সমাজতান্ত্রিক শ্রম-শৃঙ্খলা

পুঁজিতন্ত্রের পতনের ফলে অনিবার্যভাবেই ভেঙে পড়ে পুঁজিতান্ত্রিক শ্রম-শৃঙ্খলা, সেটার অবলম্বন হল ভুখার আশঙ্কা, মেহনতী মানুষের আর্থনীতিক দাসত্ব। কিন্তু, কড়াকড়ি শ্রম-শৃঙ্খলা ছাড়া বৃহদায়তনের সামাজিক উৎপাদনের কথা কল্পনাই করা যায় না। তাই, বিশেষ জোর দিয়ে লেনিন বলেছিলেন, সমাজতন্ত্রের আমলে শ্রম-শৃঙ্খলা আর্থনীতিক উন্নয়নের গতিকেন্দ্র।

মর্মের দিক থেকে এবং যেভাবে এটাকে গড়ে তোলা আর বজায় রাখা হয় সেদিক থেকেও সমাজতান্ত্রিক শ্রম-শৃঙ্খলা আগেকার সমস্ত রকমের শ্রম-শৃঙ্খলা থেকে একেবারেই পৃথক। পুঁজিতন্ত্রের আমলে যা, এই শ্রম-শৃঙ্খলা তার চেয়ে উচ্চতর

ধরনের। যে-শ্রমিকেরা শোষকদের জোয়াল ছ্ড়ে ফেলে দিয়েছে, এটা তাদের সচেতন শৃঙ্খলা। সমাজতান্ত্রিক শ্রম-শৃঙ্খলা গড়ে তোলা আর বজায় রাখা শ্রমজীবী জনগণের বিপ্ল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের সমর্থিত আদর্শ।

প্রলেতারিয়েত ক্ষমতা হাতে নেবার পরে সামাজিক শ্রম-শৃঙ্খলা গড়ে-বাড়িয়ে তোলাটা তাদের শ্রেণী-সংগ্রামের মূল রূপগ্লোর একটা। লেনিন বলেছিলেন, নতুন শ্রম-শৃঙ্খলা, মান্ষে-মান্ষে নতুন-নতুন ধরনের সামাজিক যোগসূত্র এবং লোককে কাজে প্রবৃত্ত করাবার নতুন-নতুন ধরন আর পদ্ধতি গড়ে তোলার কাজটায় লেগে যাবে বহ্ দশক। এটাকে তিনি খ্বই কল্যাণপ্রদ এবং উঁচুদরের একটা কাজ বলে মনে করতেন।

এটা বৃহদায়তনের সমাজতান্ত্রিক উৎপাদনের বনিয়াদে সমস্ত শ্রমজীবী মান্ষের মনোবৃত্তি বদলে দেয়, তাদের মধ্যে গড়ে-বাড়িয়ে তোলে যৌথ সাথী-সহযোগীর শ্রম-শৃঙ্খলা, আর তার সঙ্গে সঙ্গে, শ্রমিক শ্রেণী নিজে নেয় নতুন শিক্ষা-দীক্ষা। শ্রম-শৃঙ্খলা মজব্ত করে তোলার চেষ্টার মধ্যে সমাজতান্ত্রিক সমাজ রাষ্ট্ররূপে সমঝানো আর জবরদস্তির প্রণালীতে নিষ্কর্মা আর পরজীবীদের সম্বন্ধে ব্যবস্থা নেয় — এরা সমাজকে যথাসম্ভব কম দিয়ে যতখানি পারা যায় পাবার চেষ্টা করে।

২। সামাজিক শ্রমের উৎপাদিকাশক্তি

শ্রমের উৎপাদিকাশক্তির সমানে বৃদ্ধি

সমাজতান্ত্রিক সমাজের এবং তার সমস্ত মান্ষের বেড়ে-চলা প্রয়োজনগ্লো মেটাবার উদ্দেশ্যে শ্রমের উৎপাদিকাশক্তি

পংজিতন্ত্রের আমলে যা হয়, তার চেয়ে উঁচু মাত্রায় তোলার জন্যেই সামাজিক শ্রমের সমাজতান্ত্রিক সংগঠন।

শ্রমের উৎপাদিকাশক্তির উচ্চতর মাত্রার কল্যাণেই সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা শেষপর্যন্ত সাবেকী পংজিতান্ত্রিক ব্যবস্থার উপর জয়যুক্ত হয়। শ্রমের উৎপাদিকাশক্তি সামন্ততন্ত্রের আমলে যা ছিল তার চেয়ে ঢের বেশি পংজিতন্ত্রের আমলে। আর সমাজতন্ত্রের আমলে সেটা পংজিতান্ত্রিক সমাজের চেয়ে বেশি।

উৎপাদের ইউনিটপিছু প্রত্যক্ষ আর মূর্ত শ্রম হ্রাসের মধ্যে শ্রমের উৎপাদিকাশক্তির বৃদ্ধি প্রকাশ পায়। অতীতে, মূর্ত শ্রমের হিস্সাটা কমে প্রত্যক্ষ শ্রমের চেয়ে বেশি দ্রুত। কায়িক শ্রমের জায়গায় যন্ত্রসজ্জিত শ্রম দিয়ে, আর পুরন কিংবা সেকেলে ধরনের যন্ত্রের জায়গায় নতুন-নতুন এবং আরও সূক্ষ্ম-জটিল যন্ত্রপাতি বসিয়ে শ্রমের উৎপাদিকাশক্তি বাড়ানো হয়।

শ্রম আর উৎপাদনের সংগঠন সমানে উন্নততর করাটা শ্রমের উৎপাদিকাশক্তি বাড়াবার আর-একটা অপরিহার্য উপযোগী অবস্থা। প্রযুক্তিগত অগ্রগতি ছাড়াও, শ্রমের উৎপাদিকাশক্তিবৃদ্ধির অনুকূল অন্যান্য অবস্থা হল, লেনিনের মতে, শ্রমজীবীদের আরও কড়াকড়ি শ্রম-শৃঙ্খলা, তাদের দক্ষতা বাড়ানো, শ্রমের নিবিড়তাবৃদ্ধি, উন্নততর শ্রম-সংগঠন।

সামাজিক শ্রমের উৎপাদিকাশক্তিবৃদ্ধিতে আনুকূল্য করার বিভিন্ন উপায়

সমাজতন্ত্রের আমলে শ্রমের উৎপাদিকাশক্তি নিয়মিতভাবে বাড়াবার সহায়ক পদ্ধতিগুলো পংজিতন্ত্রের আমলে ব্যবহৃত পদ্ধতিগুলো থেকে একেবারেই পৃথক। পংজিতান্ত্রিক সমাজে

শ্রমের উৎপাদিকাশক্তির বৃদ্ধি ঘটানো হয় প্রধানত শ্রমের তীব্রতা বাড়িয়ে, অর্থাৎ, শ্রমিকদের অতিরিক্ত তাড়না ক'রে। সমাজতান্ত্রিক সমাজে শ্রমের উৎপাদিকাশক্তি বাড়াবার উপায় হল — দ্রুত প্রযুক্তিগত অগ্রগতি, সরঞ্জাম আর প্রযুক্তির আধুনিকীকরণ এবং উন্নততর উৎপাদন-সংগঠন। আধুনিক সরঞ্জামে আর প্রযুক্তিতে বিশেষ গুরুত্বসম্পন্ন হল শ্রম আর উৎপাদনের বিজ্ঞানসম্মত সংগঠন, শ্রম-কালের ষোল-আনা সদ্ব্যবহার: বিরতি ঘটতে না দেওয়া এবং শ্রম-কালের অনুৎপাদী ব্যয় (সময়-নষ্ট) ঠেকাবার ব্যবস্থা চালু করা।

শ্রমের উৎপাদিকাশক্তিবৃদ্ধির অনুকূল একটা মূল উপাদান হল মেহনতীদের দক্ষতা উন্নততর করা। আধুনিক বৈজ্ঞানিক আর প্রযুক্তিগত অগ্রগতির জন্যে অর্থনীতিক্ষেত্রে নিযুক্ত সবার সাংস্কৃতিক আর প্রযুক্তিগত মান সমানে বেড়ে চলা আবশ্যক হয়ে পড়ে। জাতীয় অর্থনীতির সমস্ত ক্ষেত্রে দক্ষ শ্রমিক থাকলে, একমাত্র তবেই আরও সূক্ষ্ম-জটিল নতুন সরঞ্জাম চালু ক'রে বাঞ্ছিত ফল পাওয়া যায়।

সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিতে শ্রমের উৎপাদিকাশক্তি বাড়ার ফলে উৎপাদন-পরিব্যয়ে মজুরি হিস্‌সাটা সমানে কমে যায়। কিন্তু, সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিতে উৎপাদন-পরিব্যয়ে মজুরি বাবত খরচার অংশটা কমার সঙ্গে সঙ্গে মজুরি কমে না, — সমগ্রভাবে মজুরি তহবিলটা সমানে বেড়েই চলে, এইভাবে পৃথক-পৃথক শ্রমিকের মজুরির পরিমাণটাও বাড়ে। তাজা শ্রমের ব্যয়সংকোচের সঙ্গে সঙ্গে, সমানে বেড়ে চলে শ্রমজীবীদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য — এতে দেখা যায় সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিপুল শ্রেষ্ঠত্ব।

কমিউনিজম গড়ার কাজের মধ্যে সামাজিক শ্রমের উৎপাদিকাশক্তিবৃদ্ধি বৈষয়িক সম্পদের অঢেল প্রাচুর্য সৃষ্টি

করার একটা বড়রকমের পূর্বশর্ত, — প্রয়োজন অনুসারে বণ্টনের কমিউনিস্ট নীতি বলবৎ করার জন্যে সেটা অবশ্যপ্রয়োজনীয়। নতুন-নতুন সরঞ্জাম আর প্রযুক্তি গড়ে তুলে সেগুলিকে চালু করা, বহুযোজী যন্ত্রসজ্জা আর স্বয়ংক্রিয়তার ব্যাপক প্রয়োগ এবং উৎপাদনে আরও বিশেষীকরণ আর সহযোগের ভিত্তিতে উৎপাদনের প্রযুক্তিগত মাত্রার উন্নতিবিধানই শ্রমের উৎপাদিকাশক্তি বাড়াবার প্রধান উপায়।

উৎপাদনে বিশেষীকরণ এবং সহযোগ

বিভিন্ন শিল্পপ্রতিষ্ঠানের বিশেষীকরণ আর সহযোগ, বিপুল হারে উৎপাদন এবং উৎপাদনের সংযুক্তি — এগুলি হল বৃহদায়তনের উৎপাদনের বিশেষক সর্বাগ্রসর পদ্ধতিগুলোর কয়েকটা এবং বৈজ্ঞানিক আর প্রযুক্তিগত অগ্রগতি বৃদ্ধির সহায়ক।

একই জিনিসের উৎপাদন কোন-কোন শিল্পপ্রতিষ্ঠানে কেন্দ্রীভূত করাই বিশেষীকরণ। এটা সামাজিক শ্রমবিভাগের একটা রূপ। বিশেষীকরণের কল্যাণে আরও ব্যাপক আকারে শ্রমবিভাগ ঘটে বিভিন্ন শিল্পপ্রতিষ্ঠানের মধ্যে এবং সেগুলির ভিতরেও, বিভিন্ন কর্মশালা আর বিভাগের মধ্যে — এইভাবে, উঁচু মাত্রায় উৎপাদনকর সরঞ্জাম ব্যবহার করা, যন্ত্রপাতি আর যন্ত্র-বন্দোবস্তের আধুনিকীকরণ এবং প্রযুক্তিবিদ্যার উন্নতিবিধান সম্ভব হয়। শ্রমিক আর ইঞ্জিনিয়রদের উৎপাদনে-অভিজ্ঞতা আয়ত্ত করতেও সহায়ক হয় বিশেষীকরণ।

বিশেষীকরণ হয় মূল তিন ধরনের: এক, নানাধর্মী জিনিসের উৎপাদন ভাগ-ভাগ করে দেওয়া, তাতে এক-একটা কারখানা কোন বিশেষ-নির্দিষ্ট জিনিসের উৎপাদনে বিশেষত্ব

লাভ করে (যেমন, মোটরযান নির্মাণের কারখানা); দুই, উৎপাদন এমনভাবে ভাগ-ভাগ করে দেওয়া, যাতে প্রত্যেকটা কারখানা তৈরি-উৎপাদের বিভিন্ন উপাংশ উৎপন্ন করে — অঙ্গ-উপাদানে বিশেষীকরণ (বিশেষ-বিশেষ কারখানা, যেগুলিতে উৎপন্ন হয় মোটরযানের বিভিন্ন উপাংশ — ইঞ্জিন, বডি, পিস্টন রিং); তিন, প্রযুক্তিগত প্রক্রিয়ার পৃথক-পৃথক ক্রিয়াপ্রণালীতে বা পর্বে বিশেষীকরণ — প্রযুক্তিগত বা পর্ব-অনুযায়ী বিশেষীকরণ (ফাউন্ড্রি, ফর্জিং-প্রেসিংয়ের কাজ, ইত্যাদি)।

উৎপাদনের সংযুক্তি

সামাজিক শ্রমের উৎপাদিকাশক্তিবৃদ্ধির সহায়ক আর-একটা উপায় হল উৎপাদনের সংযুক্তি। পরস্পরসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন উৎপাদনপ্রক্রিয়াকে একই শিল্পপ্রতিষ্ঠানে একত্রিত করাকে বলে এই সংযুক্তি।

আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে, সংযুক্তি বুঝি বিশেষীকরণের উলটো, কিন্তু আসলে এটা তার সঙ্গে সরাসরি সংশ্লিষ্ট। এই দুটোই উৎপাদন কেন্দ্রীভূত করার বিভিন্ন পদ্ধতি, তাতে নির্দিষ্ট অবস্থায় আর্থনীতিক ফলপ্রদতা বাড়ে।

সংযুক্তি আছে মূল তিন রকমের।

এক, বিভিন্ন ধারাবাহিক আকারণ পর্ব একত্রিত করার ভিত্তিতে সংযুক্তি। তার একটা দৃষ্টান্ত হল লোহা-ইস্পাত শিল্পজোট, যাতে লোহা-আকরিক নিষ্কাশন করা থেকে রোল-করা ধাতু উৎপাদন অবধি ধাতুবিদ্যাগত উৎপাদনের সমস্ত পর্বই সংযুক্ত হয়, — লোহা-ইস্পাত শিল্পের জন্যে প্রয়োজনীয় কোক উৎপাদনের ব্যবস্থাও তাতে থাকে। টেক্সটাইল শিল্প এর আর-একটা দৃষ্টান্ত।

দুই, কাঁচামালের বহুযোজী সদ্ব্যবহারের ভিত্তিতে হয় আর-একরকমের সংযুক্তি। বিভিন্ন জৈব কাঁচামাল (কয়লা, তৈল) এবং বিভিন্ন লৌহেতর ধাতুর যৌগ আকরিক আকারণের রাসায়নিক শিল্পে এবং খাদ্য-শিল্পায়তনে কৃষিজাত দ্রব্যসামগ্রীর আকারণে এই রকমের সংযুক্তি ব্যাপক।

তিন, বর্জ্য পদার্থ কাজে লাগাবার ভিত্তিতেও সংযুক্তি হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ, কাষ্ঠ আকারণ শিল্পপ্রতিষ্ঠানে এটা চলে থাকে, তাতে করাতে-কাটা কাঠের গুঁড়ো এবং চাঁছনিরও আকারণ হয়।

এইভাবে, কয়েকটা পর্ব নিয়ে একই উৎপাদন-পর্যায়ের ভিতর দিয়ে কাঁচামাল আকারণের শিল্পে এবং কাঁচামাল আর জালানির বহুযোজী সদ্ব্যবহারের ভিত্তিতে উৎপাদনের শিল্পেও সংযুক্তি ব্যাপকভাবে প্রচলিত।

সমাজতান্ত্রিক প্রতিযোগিতা

সামাজিক শ্রমের উৎপাদিকাশক্তি বাড়াতে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় থাকে সমাজতান্ত্রিক প্রতিযোগিতার প্রচেষ্টা। বুর্জোয়ারা আর তাদের সাফাইদারেরা বলে, লোকে কী করতে পারে সেটা দেখাবার একমাত্র উপায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা — কিন্তু, বাস্তবিকপক্ষে, শ্রমজীবীদের সামর্থ্যগুলোকে নির্মমভাবে দমনই করে প্রতিদ্বন্দ্বিতা। জনগণের উপর ভাঁওতাবাজি, প্রবঞ্চনা আর দৈন্যদশা এবং মুষ্টিমেয় শোষকদের শ্রীবৃদ্ধি প্রতিদ্বন্দ্বিতার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ।

অসংখ্য সামর্থ্য আর কর্মক্ষমতাকে দলিত, বিনষ্ট করেছিল বুর্জোয়া ব্যবস্থা, — এই প্রথম সেগুলোর বিকাশের পূর্ণাঙ্গ সুযোগ দিয়েছে সমাজতান্ত্রিক প্রতিযোগিতার প্রচেষ্টা। প্রতিদ্বন্দ্বিতা হল সবার বিরুদ্ধে সবার সংগ্রাম, সমাজতান্ত্রিক

প্রতিযোগিতা হল শ্রমজীবীদের বন্ধুত্বসুলভ প্রতিযোগিতা, সর্বাত্মক জোয়ারের জন্যে তাদের যৌথ প্রচেষ্টা। উৎপাদকদের বৈরকার অনৈক্য ফুটে ওঠে প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্যে, আর সমাজতান্ত্রিক প্রতিযোগিতায় প্রকাশ পায় বন্ধুত্বপূর্ণ কর্মিসমষ্টির ভিতরে সর্বজনীন সহযোগ।

দৃষ্টান্তের বিপুল শিক্ষামূলক আর সংগঠনী বলই সমাজতান্ত্রিক প্রতিযোগিতার ভিত্তি। এই প্রথম সমাজতন্ত্রের আমলে দৃষ্টান্ত-বল গণ-পরিসরে সক্রিয়তায় উৎসাহ যোগায় এবং উৎপাদন উন্নততর করার উপায় আর সামাজিক প্রগতির একটা চালিকাশক্তির কাজ করে।

লেনিন মনে করতেন, ব্যাপক প্রচার, ফলাফলের মধ্যে তুলনা, উন্নতিশীল অভিজ্ঞতার প্রসার এবং কাজে বৈষয়িক আর নৈতিক প্রবর্তনা হওয়া উচিত সমাজতান্ত্রিক প্রতিযোগিতার প্রধান-প্রধান নীতি। বুর্জোয়া সমাজে একটা কারখানায় উৎপাদনের উন্নতি হলে সেটা তার প্রতিদ্বন্দ্বী কারখানাগুলোর বিপদ সৃষ্টি করে। প্রত্যেকটা নবপ্রবর্তন হল যে-কারখানা, সেটাকে প্রয়োগ করে তার 'কারবারী গুপ্ত তথ্য'। সমাজতান্ত্রিক সমাজে ব্যাপারটা তার উলটো, এখানে শ্রমজীবীরা উৎপাদন উন্নততর করে চূড়ান্ত মাত্রায় আগ্রহী, আগুয়ান শ্রমিকদের উদ্যমে সাগ্রহ সাড়া জাগে। এটা জনগণের সৃজনশীল উদ্যমকে উদ্দীপিত করে, জাগিয়ে তোলে বন্ধুত্বসুলভ প্রতিযোগিতার মেজাজ, এটা জনগণের সমবেত অগ্রগতির একটা শক্তিশালী হাতিয়ার।

মেহনতীদের সাংস্কৃতিক এবং প্রযুক্তিগত মানের উন্নতি

শ্রমজীবীদের সাংস্কৃতিক মান আর প্রযুক্তিগত জ্ঞান সমানে বেড়ে চলাটা শ্রমের উৎপাদিকাশক্তিবৃদ্ধির আর-একটা

সহায়ক উপাদান। বৈজ্ঞানিক আর প্রযুক্তিগত অগ্রগতি শ্রমিক, ইঞ্জিনিয়র আর টেকনিশিয়নদের দক্ষতার উন্নতির সঙ্গে সরাসরি সংশ্লিষ্ট। সমস্ত শ্রমজীবীর সাধারণ এবং প্রযুক্তিগত জ্ঞান উন্নততর করার উপযোগী নিখুঁত অবস্থা সৃষ্টি করে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা।

যন্ত্রগুলোর উন্নতি এবং শ্রমজীবী জনগণের সাংস্কৃতিক মান এবং প্রযুক্তির জ্ঞান বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কায়িক আর মানসিক শ্রমের মধ্যেকার পার্থক্যগুলো ক্রমে দূর হয়ে যেতে থাকে। সমানে বেড়ে চলে শ্রমিক শ্রেণী এবং যৌথখামারীদের শিক্ষার মান। সোভিয়েত ইউনিয়নে ১৯৭০ সালের আদমশুমারে দেখা যায়, শহরে আর গ্রামাঞ্চলে কর্মে-নিযুক্ত মানুষের মধ্যে মাধ্যমিক আর উচ্চতর শিক্ষা ছিল যথাক্রমে তিন-চতুর্থাংশ এবং অর্ধেকের বেশি জনের।

সাধারণ মধ্যশিক্ষা এবং বিশেষিত প্রযুক্তিগত শিক্ষার প্রসারের ফলে স্বাধীন জীবন যারা শুরু করে এমন নওজোয়ানদের প্রধান অংশটার আট-বছরের শিক্ষা থাকে, তাদের একটা মোটারকম অংশ কাজে ঢোকে মধ্যবিদ্যালয়ের নবম এবং দশম শ্রেণী শেষ করার পরে। যাদের বিভিন্ন সূক্ষ্ম-জটিল সরঞ্জাম আছে এমন বহু শিল্পপ্রতিষ্ঠানে তৃতীয়াংশ অবধি শ্রমিকদের আছে পূর্ণাঙ্গ মধ্যশিক্ষা (১০ম বা ১১শ শ্রেণী)। যাদের কোন বিশেষ বৃত্তি নেই, এমন যৌথখামারীদের সংখ্যা কমে যাচ্ছে, আর সাধারণ শিক্ষা এবং বিশেষ তালিম পাওয়া যন্ত্রচালক, বিশেষিত খামারের কর্মী এবং অন্যান্য দক্ষ কর্মীর সংখ্যা বেড়ে চলেছে দ্রুত।

সঙ্গে সঙ্গে, ইঞ্জিনিয়র আর টেকনিশিয়নদের সংখ্যা সমানে বাড়ছে, তাদের দক্ষতার মান হচ্ছে উচ্চতর।

শ্রম এবং উৎপাদনের বিজ্ঞানসম্মত সংগঠন

সমাজতান্ত্রিক গঠনকাজের গোড়ার বছরগুলোতেই লেনিন শ্রম এবং উৎপাদনের বিজ্ঞানসম্মত নীতিগুলি প্রয়োগের প্রয়োজনের উপর জোর দিয়েছিলেন। তিনি বলতেন, সমাজতান্ত্রিক পরিবেশে বিজ্ঞানসম্মত শ্রম-সংগঠন একটা প্রবল উপাদান শ্রমের উৎপাদিকাশক্তি বাড়াবার জন্যেই শুধু নয়, সর্বতোভাবে শ্রম লাঘব করার জন্যেও বটে।

আজকের অবস্থায় উৎপাদন এবং শ্রমের বিজ্ঞানসম্মত সংগঠন আরও বিশেষভাবে গুরুত্বসম্পন্ন, সেটাকে আরও নিখুঁত করে তোলা উৎপাদনের ফলপ্রদতা বাড়াবার একটা প্রধান পূর্বশর্ত। প্রযুক্তিগত অগ্রগতি, শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলির পুনঃসজ্জা এবং বিভিন্ন উন্নততর প্রযুক্তি-প্রক্রিয়া চালু করার ফলে যথার্থ বিজ্ঞানসম্মত নীতি অনুসারে শ্রম-সংগঠনের মূলগত উন্নতিবিধানের কাজটা খুবই অগ্রাধিকার পেয়ে গেছে।

উৎপাদনের প্রযুক্তিগত মান এবং শ্রমিক আর বিশেষজ্ঞদের যোগ্যতার দিক থেকে সোভিয়েত শিল্প রয়েছে পৃথিবীতে একটা সর্বপ্রধান স্থানে। তবু, সরঞ্জাম এবং সেগুলো চালাবার লোকেদের একই উৎপাদন-প্রক্রিয়ায় মিলিয়ে-মিশিয়ে দেবার উপযোগী শ্রম-সংগঠনের ব্যাপারে বহু শিল্পপ্রতিষ্ঠান এখনও পিছিয়ে আছে। সেজন্যেই, আধুনিক বৈজ্ঞানিক এবং প্রযুক্তিগত অগ্রগতির প্রয়োজনের অনুযায়ী বিজ্ঞানসম্মত শ্রম-সংগঠন আর উৎপাদন-সংগঠন সমস্ত শিল্পপ্রতিষ্ঠানেই চালু করাটা হয়ে উঠেছে অর্থনীতির একটা সবচেয়ে জরুরী কাজ।

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

বণ্টনের সমাজতান্ত্রিক নীতি

১। শ্রম অনুসারে বণ্টন — সমাজতন্ত্রের একটা আর্থনীতিক নিয়ম

শ্রম এবং ভোগ-ব্যবহারের পরিমাপের উপর সামাজিক নিয়ন্ত্রণ

‘প্রত্যেকে দেবে সামর্থ্য অনুসারে, পাবে কাজ অনুসারে’, — এই নীতিটাকে বাস্তবে বলবৎ করার অর্থ হল সমাজকে প্রত্যেকটি কর্মীর শ্রমের পরিমাপের এবং ভোগ-ব্যবহারের পরিমাপের হিসাব রাখতে হবে, ঐসব পরিমাপ নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। লেনিন এটাকে সমাজতান্ত্রিক নির্মাণকাজে সাফল্যের চূড়ান্ত গুরুত্বসম্পন্ন একটা শর্ত বলে বিবেচনা করতেন। এমন হিসাবরক্ষণ আর নিয়ন্ত্রণ কেন অপরিহার্য, তার কয়েকটা বিষয়গত কারণ আছে।

এক, সমাজে সবার দ্রুত বেড়ে-চলা প্রয়োজনগুলো সবই মেটাতে পারার মতো দ্রব্যসামগ্রীর অঢেল প্রাচুর্য এখনও সমাজের নেই।

দুই, শ্রম এখনও মানুষের জীবনের মুখ্য প্রয়োজন হয়ে ওঠে নি — এই কারণে, সর্বসাধারণের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্যে সর্বোচ্চ মাত্রায় উৎপাদনশীল কাজ করতে প্রত্যেকটি শ্রমিককে উৎসাহিত করার জন্যে বৈষয়িক প্রবর্তনা আবশ্যক।

তিন, শহর আর গ্রামাঞ্চলের মধ্যে, মানসিক আর কায়িক

শ্রমের মধ্যে এখনও বিস্তর পার্থক্য রয়েছে। কাজেই, পৃথক-পৃথক কর্মীর শ্রম কেবল পরিমাণে নয়, গুণেও পৃথক-পৃথক।

শ্রমের পরিমাপ এবং ভোগ-ব্যবহারের পরিমাপের উপর সামাজিক নিয়ন্ত্রণ শ্রমের প্রতি নতুন সমাজতান্ত্রিক মনোভাবের জন্যে সংগ্রামে অত্যন্ত গুরুত্বসম্পন্ন একটা উপাদান। পুঁজিতন্ত্রের আমলে মানুষকে কাজ করতে বাধ্য করার জন্যে প্রয়োগ-করা শোষণকর পদ্ধতির সঙ্গে এই রকমের সামাজিক উৎসাহনের কোন মিল নেই। পুঁজিতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় শোষিত শ্রেণীগুলিকে কাজ করাবার জন্যে শোষক শ্রেণী ব্যবহার করে উপোসী থাকার আশঙ্কাটাকে। সমাজতন্ত্রের আমলে প্রত্যেকটি কর্মী সামাজিক উৎপন্নের কতটা অংশ পাবে, সেটাকে সামাজিক-নিরিখে কেজো শ্রমে তার অংশগ্রহণের মাত্রার উপর নির্ভর করিয়ে সমগ্রভাবে সমাজ তার উপর প্রভাববিস্তার করে।

শ্রম অনুসারে বণ্টনের বিষয়গত প্রয়োজন

যেকোন সমাজব্যবস্থায় বৈষয়িক সম্পদের বণ্টন নির্ভর করে বিদ্যমান উৎপাদনপ্রণালীর উপর। সমাজতন্ত্রের আমলে বণ্টন হয় শ্রম অনুসারে।

শ্রম অনুসারে বণ্টন সমাজতন্ত্রের একটা বিষয়গত আর্থনীতিক নিয়ম। ক্রমাগত বেশি সাফল্যের সঙ্গে এই নিয়ম খাটিয়ে সমাজতান্ত্রিক সমাজ উদ্যমের সমস্ত ক্ষেত্রে এটাকে করে শ্রম বাবত পারিশ্রমিক দেবার ভিত্তি। সোভিয়েত ইউনিয়নে এবং অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশেও শ্রম অনুসারে বণ্টনের ব্যাপারটা সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনের সমগ্র ব্যবস্থার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট।

সমাজতান্ত্রিক সমাজে শ্রমের ফলাফল এবং লোকের বৈষয়িক কল্যাণের মধ্যেকার প্রত্যক্ষ সম্পর্কটাকে শ্রমজীবীরা দেখতে পায় শ্রম অনুসারে বণ্টনের ভিতর দিয়ে। এইভাবে, শ্রমের পরিমাণ আর গুণ অনুসারে বণ্টন হল নতুন, সচেতন, সমাজতান্ত্রিক শ্রম-শৃঙ্খলায় মানুষকে অভ্যস্ত করাবার এবং তাদের সমষ্টিগতভাবে চলবার মনোবৃত্তি সৃষ্টি করার একটা জোরদার উপায়, এটা আবার মজবুত করে তোলে সহযোগিতা এবং বন্ধুত্বসুলভ পারস্পরিক সহায়তার সম্পর্ক, সেটা সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন-সম্পর্কের একটা বিশেষক উপাদান।

শ্রম অনুসারে বণ্টনের ব্যবস্থাটা শ্রমের ফলাফলে শ্রমজীবীদের প্রত্যক্ষ বৈষয়িক স্বার্থ সৃষ্টি করে। এটা শ্রমজীবীদের দেখিয়ে দেয়, ভালভাবে থাকতে হলে কাজ করতে হয় ভালভাবে। বৈষয়িক প্রবর্তনা আগুয়ান কর্মীদের উৎসাহ যোগায় এবং কর্মিসাধারণকে আগুয়ান কর্মীর পর্যায়ে তুলতে সহায়ক হয়।

কমিউনিজমের উচ্চতর পর্বের উপযোগী বৈষয়িক আর আত্মিক জমিন সৃষ্টি করতে শ্রম অনুসারে বণ্টনের ভূমিকা বিরাট। সমাজতান্ত্রিক সমাজের উৎপাদন-বলগুলোর যথাসম্ভব দ্রুত বৃদ্ধি ঘটাবার জন্যে এই বণ্টনপ্রণালীটা অপরিহার্য।

কাজে বৈষয়িক আর নৈতিক প্রবর্তনার সংযুক্তি

সোভিয়েত রাজের গোড়ার বছরগুলিতে লেনিন লিখেছিলেন, সমাজতন্ত্রে আর কমিউনিজমে পৌঁছবার মজবুত পার-পথ তৈরি করতে হবে সরাসরি উৎসাহের উপর নয়, সেটা করতে হবে মহাবিপ্লব থেকে উদ্ভূত উদ্যম-উৎসাহের সাহায্যে এবং ব্যক্তিগত স্বার্থ, ব্যক্তিগত প্রণোদনা আর ব্যবসায়ী নীতির ভিত্তিতে।

লেনিনের এই উপদেশ থেকে দেখা যায়, কাজে বৈষয়িক আর নৈতিক প্রবর্তনার সঠিক সংযুক্তি ঘটানো দরকার।

সমাজতান্ত্রিক গঠনকাজের অভিজ্ঞতায় আরও জোরালোভাবে প্রতিপন্ন হয়েছে যে, শ্রমের ফলে শ্রমিকদের বৈষয়িক স্বার্থ ছাড়া দেশের উৎপাদন-বলগুলোকে বাড়ানো, সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি গড়া এবং কোটি-কোটি মানুষকে কমিউনিজমের দিকে নিয়ে যাওয়া অসম্ভব। সঙ্গে সঙ্গে, কাজে ক্রমাগত বেশি প্রবল আর কার্যকর প্রবর্তনা সৃষ্টি করে সমাজতন্ত্র। সমাজে শ্রমজীবীদের মূলগতভাবে পরিবর্তিত অবস্থান বিভিন্ন নৈতিক প্রবর্তনার উৎস। এটা তাদের সমাজকল্যাণের জন্যে আরও ভালভাবে, আরও বেশি উৎপাদনকর কাজ করতে প্রবৃত্ত করায়। বৈষয়িক স্বার্থ ছাড়াও, লোকে সমাজের জন্যে যে-কাজ করে তার প্রতি সামাজিক অনুমোদনও সামাজিক প্রগতির একটা বিরাট চালিকাশক্তি হয়ে উঠছে।

প্রতিষ্ঠানগুলির জন্যে বর্ধিত আর্থনীতিক প্রণোদনা এবং বৈষয়িক প্রণোদনার নীতির আরও বিকাশ থেকে কাজে বৈষয়িক আর নৈতিক প্রবর্তনার সঠিক সংযুক্তি নিশ্চিত হওয়া চাই। যেমন অর্থনীতির জন্যে, তেমনি শ্রমের প্রতি যথার্থ কমিউনিস্ট মনোভাব গড়ে তোলা এবং কমিউনিস্ট সমাজনির্মাতাদের শিক্ষাদীক্ষার জন্যেও বৈষয়িক স্বার্থ এবং নৈতিক প্রবর্তনার মিলন বিপুল গুরুত্বসম্পন্ন।

২। সমাজতন্ত্রের আমলে মজুরি

রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানে মজুরি

সমাজতন্ত্রের আমলে শ্রম বাবত পারিশ্রমিক দেওয়া হয় কৃতকর্মের পরিমাণ আর গুণ অনুসারে বণ্টনের নিয়মের সঙ্গে

সংগতি রেখে। এই নিয়মের ভিত্তিতে সমাজতান্ত্রিক সমাজ পারিশ্রমিক দেবার ধরন আর পদ্ধতি উন্নততর করে তোলে।

রাষ্ট্রীয়-মালিকানাধীন সমাজতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলিতে শ্রমিক আর কর্মচারীদের মজুরি দেওয়া হয়। সমাজতন্ত্রের আমলে মজুরিতে প্রকাশ পায় এই দুইয়ের মধ্যে সম্পর্ক: সমগ্র সমাজ, তার তরফে রাষ্ট্র, এবং পৃথক-পৃথক শ্রমিক আর কর্মচারী, যাদের শ্রমের মূল্যায়ন হয় তার পরিমাণ আর গুণ অনুসারে।

জাতীয় আয়ের যে-অংশটা যায় শ্রমিকদের ব্যাক্তিগত ভোগ-ব্যবহার মেটাতে, বাটোয়ারা হয় শ্রম অনুসারে, সেটাই গোটা শ্রমিক শ্রেণীর মজুরি। নিজ রাষ্ট্রীয় সংস্থাগুলির মারফত শ্রমিক শ্রেণী মজুরি ধার্য করে পরিকল্পিতভাবে সমগ্র সমাজের স্বার্থে। মজুরির মাত্রা এমনভাবে স্থির করা হয়, যাতে জনকল্যাণ সমানে বেড়ে চলার সঙ্গে সঙ্গে, উদ্বৃত্ত উৎপাদের যে-অংশটা সমাজের প্রাপ্তিসাধ্য সেটার পরিমাণ সমাজের যাবতীয় প্রয়োজন মেটাবার পক্ষে যথেষ্ট হয়।

শ্রমের ফলে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলির শ্রমিক আর কর্মচারী, বিশেষজ্ঞ আর ম্যানেজারদের বৈষয়িক স্বার্থ জাগিয়ে তোলার উপযোগী করে রচিত হয় মজুরি-সংক্রান্ত কর্মনীতি। উৎপাদনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ করণীয় কাজগুলো সমাধা করার ব্যাপারে নিজ উদ্দীপক ভূমিটাকে সমানে বাড়িয়ে চলাই মজুরি-সংক্রান্ত কর্মনীতির প্রধান উদ্দেশ্য। মজুরি নিয়মিতভাবে বাড়ে, আর তার সঙ্গে সঙ্গে, উৎপাদনের বিকাশে এবং উন্নতিবিধানে যাদের অবদান অপেক্ষাকৃত বেশি, সেইসব শ্রমিকের জন্যে অপেক্ষাকৃত বেশি প্রবর্তনার ব্যবস্থা থাকে। শ্রম বাবত পারিশ্রমিকের ব্যবস্থা এমনভাবে করতে হয়, যাতে প্রত্যেকটি শ্রমিক, ইঞ্জিনিয়র এবং

টেকনিশিয়নের জানা থাকে যে, সে তার উৎপাদন-সূচক বাড়ালে তার মজুরি কতটা বাড়বে এবং প্রতিষ্ঠানের বাড়তি আয় থেকে তার ভাগে পড়বে কতটা।

সমাজতান্ত্রিক সমাজে মজুরির পরিমাণ নির্ভর করে প্রধানত সামাজিক শ্রমের উৎপাদিকাশক্তির মাত্রার উপর। শ্রমের উৎপাদিকাশক্তি বাড়া চাই মজুরির চেয়ে বেশি দ্রুত। এই শর্তটা পূরণ হলে সমাজের বেড়ে-চলা প্রয়োজনগুলো মেটানো এবং সঞ্চয়ন আর উৎপাদন সম্প্রসারণের পক্ষে যথেষ্ট উপায়-উপকরণ পাওয়া নিশ্চিত হয়।

কাজের হার নির্ধারণ

শ্রম অনুযায়ী বণ্টনের আর্থনীতিক নিয়ম অনুসারে মজুরির বন্দোবস্ত করার অর্থ হল কাজের সঠিক হার বাঁধা এবং যুক্তিসম্মত গ্রেডের ব্যবস্থা।

কোন শ্রমিককে তার শ্রমের পরিমাণ আর গুণ অনুসারে পারিশ্রমিক দিতে হলে স্থির করা দরকার এক-একটা কাজ সমাধা করতে কাজ লাগে কতটা। টেকনিকাল হার বেঁধে — কাল-মান বা উৎপাদ-মান ধার্য ক'রে এটা নির্ধারণ করা হয়। টেকনিকাল হার-বাঁধা সবসময়ে উন্নততর করে চলাটা আর্থনীতিক উন্নয়নের একটা গুরুত্বসম্পন্ন করণীয় কাজ।

কোন একটা নির্দিষ্ট কাজ সমাধা করতে যে-পরিমাণ সময় লাগে, সেটা হল কাল-মান। এক-ঘণ্টা, একটা কর্ম-দিন কিংবা এক-মাস — এই রকমের একটা সময়ে যে-পরিমাণ উৎপাদ কিংবা যন্ত্রাংশ তৈরি করতে হয় কিংবা যতগুলি ক্রিয়া সম্পাদন করতে হয়, সেটা উৎপাদ-মান। কর্ম-ঘণ্টাকে (কিংবা কর্ম-দিন, কিংবা মাসে মোট কর্ম-ঘণ্টাকে) উৎপাদের এক ইউনিট

উৎপাদনের কাল-মান দিয়ে ভাগ করে উৎপাদ-মান নির্ণয় করা হয়।

কাল-মান ব্যবহার করা হয় প্রধানত পৃথক-পৃথক কিংবা ছোট-ছোট কেতায় উৎপাদনের বেলায়, আর বিপুল পরিমাণে উৎপাদনের বেলায় ব্যবহৃত হয় উৎপাদ-মান। উৎপাদনে সাংগঠনিক ভূমিকা পালনের জন্যে মানের সবসময়ে সাজসরঞ্জাম, প্রযুক্তি এবং উৎপাদন সংগঠনের মাত্রার অনুযায়ী হওয়া চাই।

মজুরি দেবার বিভিন্ন ধরন আর প্রণালী

রাষ্ট্রীয়-মালিকানাধীন সমাজতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলিতে মজুরি দেবার ধরন আছে মূল দুটো: ফুরন-হার এবং কাল-হার। এর প্রত্যেকটা এককও হতে পারে, দলেরও (সমষ্টিগত) হতে পারে।

ফুরনের হারই সবচেয়ে ব্যাপকভাবে প্রচলিত, — কোন শ্রমিক কতটা উৎপাদ কিংবা উপাংশ তৈরি করে, কিংবা কতগুলো ক্রিয়া সম্পাদন করে — তদনুসারে নির্ণয় করা হয় তার রোজগার। সোভিয়েত শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকদের দুই-তৃতীয়াংশের বেশি ফুরনের হারের প্রণালীতে মজুরি পায়। ফুরনের হার দক্ষতা বাড়াবার এবং সরঞ্জামের আরও সুষ্ঠু সদ্ব্যবহারের সহায়ক এবং উৎপাদনে কর্ম-কালহানি, বিরতি আর সাংগঠনিক আটকানি কমায়।

কোন কোন ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয় বৃদ্ধিশীল ফুরনের হারের প্রণালী, তাতে মূল কোটার উপরি উৎপন্ন ইউনিটপিছু মজুরির হার অপেক্ষাকৃত বেশি, এই হার ক্রমাগত বৃদ্ধিশীল। এই প্রণালীটা ব্যাপক পরিসরে কিংবা স্থায়িভাবে ব্যবহৃত হতে পারে না — কেননা, তাতে কোন শ্রমিকের মজুরি বেড়ে চলতে পারে তার শ্রমের উৎপাদিকাশক্তির চেয়ে বেশি দ্রুত। কিন্তু, কোন-

কোন ক্ষেত্রে, কোন আটকে-যাওয়া অবস্থা কাটানো জরুরী হয়ে পড়লে বৃদ্ধিশীল ফুরন-হার সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের পক্ষে সুবিধাজনক হতে পারে।

যেসব ক্ষেত্রে শ্রমিকের উৎপাদনের পরিমাণ যথাযথভাবে নির্ণয় করা অসম্ভব, তখন চলে কাল-হার — যেমন, মেরামতী শ্রমিক-অ্যাডজাস্টার, ক্রেনচালক, তাড়িতী, ইত্যাদির পারিশ্রমিকের বেলায়। স্বয়ংক্রিয় উৎপাদনের কোন-কোন ভাগে, যেখানে শ্রমিকদের কাজ হল প্রধানত অ্যাডজাস্ট করা, মেরামত করা আর যন্ত্রপাতির তত্ত্বাবধান, তাতেও চলে কাল-হার।

বৈষয়িক প্রবর্তনা তহবিল

ব্যবস্থাপনের নতুন প্রণালীতে এমন পরিবেশ সৃষ্টি হয়, যাতে প্রতিষ্ঠানগুলি মজুরি তহবিল ছাড়াও, পৃথক-পৃথক সাধনসাফল্য এবং গোটা প্রতিষ্ঠানের কর্মসম্পাদনসাফল্য বাবত শ্রমিকদের পারিতোষিক দেবার জন্যে বৈষয়িক প্রবর্তনা তহবিল গড়তে পারে।

প্রাপ্ত লাভের কল্যাণে সামাজিক-সাংস্কৃতিক ব্যবস্থাবলি এবং গৃহনির্মাণের তহবিল গড়ার ফলে শ্রমিকদের বৈষয়িক প্রবর্তনা দেবার জন্যে প্রতিষ্ঠানের সুযোগ-সম্ভাবনা আরও বেড়ে যায়। শ্রমিক আর কর্মচারীদের বৈষয়িক প্রণোদনা যোগাবার জন্যে একটা গুরুত্বপূর্ণ আভ্যন্তরিক উৎস হয়ে ওঠে প্রতিষ্ঠানের লাভ। প্রতিষ্ঠানের ক্রিয়াকর্মের সমগ্র ফলাফলে, উৎপাদনবৃদ্ধিতে সমস্ত শ্রমজীবীর আগ্রহ প্রবলতর করা, শ্রম-সংগঠন উন্নততর করা এবং প্রতিষ্ঠানের পরিমাণগত আর গুণগত সূচকগুলো বাড়াবার উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করার কাজে শ্রমিকদের বৈষয়িক স্বার্থ বাড়ানো হয়।

শ্রমিক-কর্মচারীদের মজুরিতে বোনাস আর থোক-টাকার পারিতোষিকের হিস্সাটা বাড়লে গোটা কর্মিসমষ্টি আর সমগ্রভাবে সমাজের স্বার্থের সঙ্গে প্রত্যেকটি কর্মীর স্বার্থের আরও সুষ্ঠু সমন্বয়ে সেটা সহায়ক হয়।

যৌথখামারে কাজের পারিশ্রমিক

যৌথখামারীদের পারিশ্রমিক দেওয়া হয় যৌথ অর্থনীতির আয় থেকে। জাতদ্রব্যের পরিমাণবৃদ্ধি এবং উৎপাদন-পরিব্যয় কমার ফলে যৌথখামারের আয়বৃদ্ধি থেকে খামারীদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বাড়ে।

ফুরন-হারই যৌথখামারে পারিশ্রমিক দেবার প্রধান ধরন। সংশ্লিষ্ট খামারের নির্দিষ্ট পরিবেশ, কোন বিশেষ-নির্দিষ্ট কাজে আবশ্যক দক্ষতা এবং কাজটার জটিলতা আর কষ্টসাধ্যতা অনুসারে প্রত্যেকটা কাজের উৎপাদ-হার আর মজুরির হার স্থির করে যৌথখামারের বোর্ড, সেটা যৌথখামারীদের সাধারণসভার অনুমোদনসাপেক্ষ।

কৃষি উৎপাদনের ক্রমবর্ধমান যন্ত্রসজ্জা, যৌথখামারীদের বেড়ে-চলা দক্ষতা এবং উন্নততর শ্রম-সংগঠনের ফলে যৌথখামারে উৎপাদ-কোটা আর মজুরির হার বদলে অপেক্ষাকৃত বেশি উপযোগী কোটা আর হার ধার্য করা আবশ্যক হয় — ঠিক যেমনটা করা হয় শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলিতে। এর ফলে, শ্রমের উৎপাদিকাশক্তির সমানে বেড়ে চলা নিশ্চিত হয়, যৌথখামারের অর্থনীতির প্রসারিত পুনরুৎপাদনের জন্যে প্রয়োজনীয় সঞ্চয়ন বাড়ে, যৌথখামারীদের বৈষয়িক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের উন্নতি হয়। যৌথখামারের ভিতরকার সম্পর্কের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে খামারগুলিতে শ্রমের হার-বাঁধা, সংগঠন আর পারিশ্রমিকের

ব্যবস্থাটাকে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলিতে প্রচলিত মাত্রা আর ধরনধারণের আরও কাছাকাছি নিয়ে আসা আবশ্যক হচ্ছে।

যৌথখামারীদের আর্থনীতিক অবস্থা মজবুত করা এবং গ্রামাঞ্চলে জীবনযাত্রার পরিবেশ উন্নততর করার ব্যাপারে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় রয়েছে যৌথখামারে গ্যারান্টি-করা পারিশ্রমিকের প্রচলন।

যৌথখামারীদের গ্যারান্টি-করা পারিশ্রমিকের প্রচলন এবং সেটার পরিমাণ আরও বাড়াবার ভিত্তি হল — যৌথখামারে উৎপাদনবৃদ্ধি এবং শ্রমের উৎপাদিকাশক্তিবৃদ্ধি, কড়াকড়ি মিতব্যয়িতার কর্মনীতি অনুসারে চলা এবং যৌথখামারের অর্থনীতির অগ্রগতির জন্যে সর্বক্ষণের গরজ আর আগ্রহ। শহর আর গ্রামাঞ্চলের জীবনযাত্রার মান কাছিয়ে আনার দিকে এটা একটা বড়রকমের পদক্ষেপ।

৩। সাধারণের ভোগ্য তহবিল

সাধারণের ভোগ্য তহবিলের সামাজিক ভূমিকা

শ্রম অনুসারে পারিশ্রমিক দিয়ে শ্রমজীবী জনগণের আয় বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে, জনকল্যাণের প্রসারে একটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় রয়েছে সাধারণের ভোগ্য তহবিলের বৃদ্ধি। নিম্নলিখিত খাতগুলিতে রাষ্ট্রীয় ব্যয় চালানো হয় এই তহবিল থেকে: শিক্ষা, স্বাস্থ্যরক্ষা, পেনশন, বিভিন্ন শিশু প্রতিষ্ঠানে শিশুপালন; পরে হবে বিভিন্ন নিখরচ জনসেবাব্যবস্থা, ইত্যাদি। সমাজতান্ত্রিক সমাজে জনগণের সামাজিক আর সাংস্কৃতিক প্রয়োজনগুলো মেটাতে বিস্তর কাজ দিচ্ছে সাধারণের ভোগ্য তহবিল। বহু-

সন্তানের পরিবারগুলির পক্ষে সেটা আরও বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

শিক্ষা আর চিকিৎসা নিখরচ, বেকারি নেই, তাছাড়া, সমাজতন্ত্রের আরও বহু সুযোগ-সুবিধা দীর্ঘকাল যাবত সোভিয়েত জনজীবনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। এমনই সোভিয়েত জনগণের অর্জিত বস্তুগুলি, যা কিছুতেই খোয়া যেতে পারে না, — এ ব্যাপারে সোভিয়েত জনগণ পুঁজিতান্ত্রিক দেশগুলিকে বহু পিছনে ফেলে দিয়েছে। এইসব সুবিধা দেওয়া হয় সাধারণের ভোগ্য তহবিল থেকে, এই তহবিলের বৃদ্ধি আরও বিশেষভাবে দ্রুত হয়েছে যুদ্ধোত্তর বছরগুলিতে। এই তহবিল থেকে জনগণকে দেওয়া বিভিন্ন অনুদান আর বিশেষ সুবিধার পরিমাণ ১৯৪০ সালের ৪৬০ কোটি রুবল থেকে বেড়ে ১৯৭২ সালে দাঁড়িয়েছিল ৭৩০০ কোটি রুবল। সাধারণের ভোগ্য তহবিলের বৃদ্ধি দেশে জীবনযাত্রার মান অনেকটা বাড়িয়ে তোলে।

বিভিন্ন ধরনের সাধারণের ভোগ্য তহবিল

কমিউনিজম গড়ার কাজের সমগ্র কালপর্যায়ে জনগণের প্রয়োজন মেটাবার মূল উৎস হয়ে থাকবে শ্রম অনুসারে দেওয়া পারিশ্রমিক। আর তার সঙ্গে সঙ্গে, সমানে বেড়ে চলবে সাধারণের ভোগ্য তহবিল। কিন্তু, শ্রমের ফলাফলে শ্রমজীবীদের বৈষয়িক আগ্রহ তার দরুন ক্ষুণ্ণ হয় না। বরং তার উলটো, তাতে কতকগুলো সামাজিক-আর্থনীতিক সমস্যার সমাধান করা সম্ভব হয় কমিউনিস্ট কায়দায়:

এক, উঠতি পুরুষ-পর্যায়ের প্রতিপালন। এই করণীয় কাজটার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সমস্ত খরচ-খরচার দায়িত্ব সমাজ নিজের হাতে নিচ্ছে ক্রমে এবং ক্রমাগত বেশি মাত্রায়;

দুই, জনসমষ্টির শিক্ষার মান উন্নয়ন এবং সংস্কৃতি আর বিজ্ঞানের বিকাশ। এর মধ্যে পড়ে বিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয়, গবেষণা ইনস্টিটিউট, থিয়েটার, সিনেমা, ইত্যাদি নির্মাণে সরকারী ব্যয়;

তিন, জনগণের স্বাস্থ্যরক্ষা। বিশাল এই ক্ষেত্রটার মধ্যে পড়ে মেডিক্যাল সেবাকার্য এবং বিশ্রাম আর চিকিৎসার বন্দোবস্ত;

চার, গৃহসমস্যার সমাধান। জনসমষ্টির জন্যে আধুনিক বাসগৃহ, পাণ্ডজনিক সেবাকার্য, ইত্যাদির ব্যবস্থা ক'রে জীবনযাত্রার পরিবেশের উন্নতিবিধান;

পাঁচ, যারা কর্মক্ষমতাবিহীন হয়ে পড়ে তাদের জন্যে সমাজের যত্ন-তত্ত্বাবধান। এর মধ্যে পড়ে বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের এবং অশক্তদের পেনশন।

সমাজতান্ত্রিক সমাজে কাজ অনুসারে পারিশ্রমিক বিষয়গতভাবে অনিবার্য, তাতে বৈষয়িক অসমতা অবশ্যম্ভাবী — সেটা অনেকটা লাঘব হয় সাধারণের ভোগ্য তহবিল বাড়ার ফলে।

৪। জীবনযাত্রার মান বাড়াবার উপায়

জীবনযাত্রা-মানের সূচক

কোন একটামাত্র সূচক দিয়ে জীবনযাত্রার মান প্রকাশ করা যায় না, সেটা করা যায় শুধু এক-প্রস্থ সূচক দিয়ে, তাতে লক্ষ্য করা যায় মানুষের কাজ আর জীবনযাত্রার পরিবেশের বিভিন্ন দিক।

জীবনযাত্রার মানের প্রধান সূচক হল লোকের আসল আয়, সেটা নির্ভর করে তিনটে জিনিসের উপর: এক, অর্থ-আয়ের পরিমাণ; দুই, ভোগ্য পণ্য এবং সেবাকার্যের দাম; তিন,

সাধারণের ভোগ্য তহবিলের পরিমাণ। আসল আয় যত বেশি, ততই বেশি হয় মাথাপিছু ভোগ-ব্যবহার।

তার সঙ্গে সঙ্গে, জীবনযাত্রার মান বহুলাংশে নির্ভর করে শিল্প আর কৃষি উভয় ক্ষেত্রে কাজের পরিবেশের উপর — যেমন, কর্ম-দিন আর মাইনেসমেত ছুটির দৈর্ঘ্য, যন্ত্রসজ্জার মাত্রা এবং শ্রমের তীব্রতা, শ্রম কতখানি কঠিন এবং হানিকর, শ্রমে নিরাপত্তা এবং আরও বহু উপাদান। বিভিন্ন সমাজব্যবস্থাসম্পন্ন দেশগুলোর জীবনযাত্রার মানের মধ্যে তুলনা করতে গেলে শ্রমিক শ্রেণীর কর্মে-নিযুক্তি সংক্রান্ত সূচকটা বিবেচনায় থাকা দরকার, সেটা নির্ভর করে বেকারি আছে কিনা এবং তার পরিধির উপর, আর গ্রামাঞ্চলের বেলায় সেটা নির্ভর করে কৃষিক্ষেত্রে জনসংখ্যাধিক্য থাকা এবং তার পরিধির উপর। বিবিধ প্রয়োজন মেটাতে গিয়ে শ্রমজীবী জনগণের খরচ-খরচার ধাঁচটা তাদের জীবনযাত্রার মানের একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক।

জীবনযাত্রার মান নির্ণয় করার আর-একটা নিরিখ হল — বাসস্থান, স্বাস্থ্যরক্ষণ, গড় আয়ু, সাংস্কৃতিক সুযোগ-সুবিধা যা মেলে।

জীবনযাত্রার মানবৃদ্ধি — সমাজতন্ত্রের একটা নিয়ম

সমাজতান্ত্রিক সমাজে সামাজিক উৎপাদনের প্রসার, উৎপাদন-বলগুলোর বিকাশ, শ্রমের উৎপাদিকাশক্তিবৃদ্ধি এবং সামাজিক উৎপাদনের বর্ধিত ফলপ্রদতার সঙ্গে সঙ্গে জনগণের বৈষয়িক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বাড়ে। সমাজতান্ত্রিক উৎপাদনের প্রধান লক্ষ্যটি ঐ স্বাভাবিক ধারাটাকে বলবৎ করে — এই লক্ষ্যটা হল শ্রমজীবী জনগণের ক্রমবর্ধমান প্রয়োজনগুলোকে ক্রমাগত আরও পুরোপুরি মেটানো।

সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির বৃদ্ধি অনেকটা শ্রমলাঘবের সঙ্গে সরাসরি সংশ্লিষ্ট। সোভিয়েত শিল্পে প্রযুক্তিগত অগ্রগতির ফলে, যাতে অতিরিক্ত কায়িক শ্রম লাগে এমন বহু বৃত্তি আর নেই, তেমনি, বিজ্ঞান আর প্রযুক্তিবিদ্যার দ্রুত অগ্রগতির ফলে আরও শ্রমলাঘব হচ্ছে। পৃথক-পৃথক কৃষক চাষআবাদ করতে আদিম ধরনের সরঞ্জাম নিয়ে যে হাড়ভাঙা খাটুনি খাটত, সেটা এখন অতীতের বস্তু।

সোভিয়েত রাজ কায়েম হবার পরে শিল্পক্ষেত্রে গড় কর্ম-সপ্তাহ ১৯১৩ সালের ৫৮·৫ ঘণ্টা থেকে কমে ১৯৭২ সালে দাঁড়িয়েছিল ৪০·৭ ঘণ্টা। এখন সব শ্রমিক-কর্মচারী কাজ করে দিনে সাত বা ছয় ঘণ্টা। যৌথখামারীর কর্ম-দিন একক কৃষকের কর্ম-দিনের চেয়ে প্রায় ৩০ শতাংশ খাটো। যৌথ আর রাষ্ট্রীয় খামারে সমস্ত খেতের কাজ হয় ট্র্যাক্টরে-টানা সরঞ্জাম কিংবা স্বয়ংপ্রচালিত কৃষি যন্ত্রপাতি দিয়ে।

জনগণের আসল আয় বাড়ার ফলে সাধারণের ভোগ-ব্যবহার বেড়ে চলছে। ১৯৪০ থেকে ১৯৭২ সালের কালপর্যায়ে সাধারণের জন্যে ভোজনালয়সমেত রাষ্ট্রীয় এবং সমবায় বাণিজ্য সংগঠনগুলোর খুচরো বিক্রির পরিমাণ বেড়েছিল ১০·৪ গুণ।

বিপ্লবের আগে রাশিয়ায় মেহনতী মানুষের বাসস্থানের অবস্থা ছিল, খুব নরম করে বললেও, শোচনীয়। সোভিয়েত ইউনিয়নে গৃহনির্মাণ চলেছে হিমালয়প্রমাণ। ১৯১৮ থেকে ১৯৭২ সালে শহরে আর গ্রামাঞ্চলে বসতস্থল নির্মিত হয়েছিল ২৬৪ কোটি ৯৯ লক্ষ বর্গমিটার। সঙ্গে সঙ্গে, পারিবারিক বাজেটে বাড়ি-ভাড়ার অংশটা কমে গিয়েছিল অনেকটা। বিপ্লবের আগে রাশিয়ায় মেহনতী পরিবারের বাজেট থেকে ভাড়ার বাবত চলে যেত গড়ে ২০ শতাংশ, কখনও-কখনও ৩০ শতাংশ অবধি।

এখন শ্রমজীবী পরিবারের বাজেটে ভাড়া এবং পাঞ্চজনিক সেবাকার্য বাবত খরচ গড়ে চার থেকে পাঁচ শতাংশ।

সোভিয়েত ইউনিয়নে জীবনযাত্রার ক্রমবর্ধমান মানের একটা লক্ষণীয় দৃষ্টান্ত: বিপ্লবের আগেকার সময়ের সঙ্গে তুলনায় এখন গড় আয়ু হয়েছে দ্বিগুণের বেশি।

জীবনযাত্রার মান বাড়াতে শ্রম বাবত আরও বেশি পারিশ্রমিকই নিষ্পত্তিকর। এটাই উৎপাদন বিকাশের প্রধান প্রণোদনা এবং শ্রমজীবীদের আরও বেশি আয়ের মুখ্য উৎস। কাজেই, জীবনযাত্রার মান উন্নীত করার মুখ্য উপায় হয়ে থাকবে শ্রমের পারিশ্রমিকবৃদ্ধি। ১৯৭১ থেকে ১৯৭৫ সালে এই বৃদ্ধি হবে ৩০ শতাংশ।

বিভিন্ন আয়-মাত্রা কাছিয়ে আসছে

কমিউনিজমের দিকে এগিয়ে চলেছে যে সমাজতান্ত্রিক সমাজ, সেখানে বৈষয়িক শ্রীবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে উঁচু এবং অপেক্ষাকৃত কম মাত্রার আয়ের মধ্যেকার ফারাকটা ক্রমে কমে আসছে।

সমাজের উৎপাদন-বলগুলোর বিকাশ এবং প্রযুক্তিগত অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে, শ্রমজীবী জনগণের সাংস্কৃতিক এবং প্রযুক্তিগত মান বেড়ে চলেছে। ক্রমাগত আরও বেশি বেশি অদক্ষ শ্রমিক আর কর্মচারী দক্ষতা আয়ত্ত করছে। দক্ষতার উন্নতি এবং শ্রমের উৎপাদিকাশক্তিবৃদ্ধি মজুরির বিভিন্ন মাত্রার মধ্যেকার ফারাকটাকে সমানে কমিয়ে আনছে। জনসমষ্টির সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বাড়ছে, আর তার সঙ্গে সঙ্গে, অপেক্ষাকৃত কম-রোজগেরেদের মজুরি বাড়ছে, তেমনি, শ্রমিক আর কৃষকদের এবং দেশের বিভিন্ন অংশে বাসিন্দা শ্রমজীবীদেরও আয়ের মধ্যেকার ফারাক ক্রমে কমে যাচ্ছে।

এটা ঢালাও সম-বণ্টনের ব্যাপার নয়। দক্ষতা এবং শ্রমের উৎপাদিকাশক্তির বিভিন্ন মান কাছিয়ে আসা এর ভিত্তি। কাজেই, বিভিন্ন আয়-মাত্রা কাছিয়ে আসাটা শ্রমে শ্রমজীবীদের বৈষয়িক স্বার্থের নীতির সঙ্গে বিসদৃশ নয় — এতে সেই নীতি বরং আরও বেশি কার্যকর হচ্ছে।

নবম পাঁচসালা (১৯৭১—১৯৭৫) কালপর্যায়ে জনসমষ্টির সমস্ত অংশের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য আরও বাড়াবার জন্যে বিভিন্ন সামাজিক-আর্থনীতিক ব্যবস্থাবলির বিস্তৃত নতুন কর্মসূচি রচিত হয় সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ২৪ম কংগ্রেসে। চড়া হারে সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন উন্নয়নের ভিত্তিতে জনগণের বৈষয়িক এবং সাংস্কৃতিক মান আরও বেশকিছুটা বাড়ানোই এই নতুন পাঁচসালা পরিকল্পনার প্রধান করণীয় কাজ।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

সমাজতান্ত্রিক পুনরুৎপাদন। সমাজতন্ত্র থেকে কমিউনিজমে

১। সমাজতান্ত্রিক পুনরুৎপাদন

সমাজতান্ত্রিক পুনরুৎপাদনের বিশেষক উপাদান

সবচেয়ে প্রগতিশীল সমাজব্যবস্থা সমাজতন্ত্রের প্রকৃতি-বৈশিষ্ট্য হল প্রসারিত পুনরুৎপাদন।

পরস্পরসংশ্লিষ্ট তিনটে প্রক্রিয়া নিয়ে এই পুনরুৎপাদন:

এক, সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন-সম্পর্কের পুনরুৎপাদন। সেটা সমানে উন্নততর হয়ে ওঠে;

দুই, সামাজিক উৎপাদের পুনরুৎপাদন। তার পরিমাণ বেড়ে চলে বছর-পর-বছর;

তিন, শ্রমশক্তির পুনরুৎপাদন। এই প্রক্রিয়ার মধ্যে শ্রমজীবীদের দক্ষতা উন্নততর হয় এবং শ্রমের উৎপাদিকাশক্তি বাড়ে।

সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির বিকাশের যা বেগ, তেমনটা পুঁজিতান্ত্রিক অর্থনীতিতে হতে পারে না। সমাজতন্ত্রে নেই অত্যুৎপাদনের সংকট আর বিকাশের অসমতা, সেটা পুঁজিতন্ত্রের প্রকৃতিতেই অন্তর্নিহিত। এইসব সুবিধার ফলেই অর্থনীতির সমস্ত শাখায়ই উৎপাদন সমানে দ্রুত বেড়ে চলাটা প্রসারিত সমাজতান্ত্রিক পুনরুৎপাদনের একটা নিয়মিত উপাদান।

সমাজতন্ত্রের আমলে উৎপাদন-বলগুলোর বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে বেড়ে-চলা সম্পদ সাধারণের সম্পত্তি। সমাজতান্ত্রিক সমাজে সামাজিক সম্পদ নিয়মিতভাবে বেড়ে চলার সঙ্গে সঙ্গে শ্রমজীবী জনগণের বৈষয়িক এবং সাংস্কৃতিক মান সমানে উন্নীত হতে থাকে। প্রসারিত সমাজতান্ত্রিক পুনরুৎপাদন বলতে বুঝায় একদিকে সাধারণের সম্পদের বৃদ্ধি, আর জনগণের বৈষয়িক আর সাংস্কৃতিক মানের উন্নতি অন্যদিকে।

সামাজিক সম্পর্কের পুনরুৎপাদন

সমাজতন্ত্রের চূড়ান্ত বিজয়ের পরে অর্থনীতির সমস্ত ক্ষেত্রে উৎপাদন-বলগুলোর বিকাশ ঘটে সমাজতান্ত্রিক আর্থনীতিক ব্যবস্থার অখণ্ড কর্তৃত্বের পরিবেশে। সমাজতান্ত্রিক সম্পর্কের পুনরুৎপাদনের ফলে দ্বন্দ্বগুলো নিয়মিতভাবে দূর হয়ে যেতে থাকে, অর্থনীতিতে আর মানুষের চেতনায় পুঁজিতন্ত্রের অবশেষগুলো নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে থাকে।

প্রসারিত পুনরুৎপাদনের প্রক্রিয়ার মধ্যে সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন-সম্পর্ক সমানে উন্নততর হয়ে উঠছে। কমিউনিজম গড়ার কাজে ব্যাপৃত বিকশিত সমাজতান্ত্রিক সমাজে এই প্রক্রিয়া খুবই সক্রিয়ভাবে চলে থাকে।

কমিউনিজমের উচ্চতর পর্ব কায়েম করার জন্যে প্রয়োজনীয় বৈষয়িক এবং আত্মিক পূর্বাবস্থা কমিউনিস্ট সমাজ গড়ার সমগ্র কালপর্যায়ে সুপরিণত হয়ে উঠতে থাকবে। সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন-সম্পর্কের সমস্ত ক্ষেত্রে অগ্রগতির স্বাভাবিক পরিণতি হিসেবে শহর আর গ্রামাঞ্চলের মধ্যেকার এবং সমাজতান্ত্রিক সমাজের বিভিন্ন শ্রেণী আর সামাজিক দলের মধ্যেকার পার্থক্যগুলো ক্রমে ঘুচে যায়; শ্রমিক, কৃষক আর বুদ্ধিজীবীদের

মধ্যে সম্পর্কের ক্ষেত্রে কমিউনিস্ট মূলনীতিগুলো উন্নততর এবং সংহত হয় — ফলে দেখা দেয় শ্রেণীহীন কমিউনিস্ট সমাজ।

মোট সামাজিক উৎপাদ

সমাজতন্ত্রের আমলে মোট সামাজিক উৎপাদের প্রধান অংশটা সমগ্র জনগণের সম্পত্তি, আর কতকটা পৃথক-পৃথক শ্রমজীবিসমষ্টির সম্পত্তি। বৈষয়িক সম্পদ উৎপাদন, পরিবহণ এবং গুদামজাত করায় নিযুক্ত সমস্ত আর্থনীতিক শাখাই মোট সামাজিক উৎপাদ সৃষ্টিতে অংশগ্রহণ করে। সমাজতন্ত্রের আমলে আর্থনীতিক উন্নয়নের চড়া হার দেখা যায় সামাজিক উৎপাদের পরিমাণের দ্রুত বৃদ্ধির মধ্যে। ১৯৭২ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের মোট সামাজিক উৎপাদ ছিল ১৯১৩ সালের পরিমাণের চেয়ে ৪৭ গুণ বেশি, সেটা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মোট সামাজিক উৎপাদের ৬২ শতাংশ।

সমাজতান্ত্রিক সমাজের বার্ষিক সামাজিক উৎপাদ দেখা যায় বৈষয়িক (ভৌত) এবং মূল্য রূপে। বৈষয়িক রূপের সামাজিক উৎপাদ দুই ভাগে বিভক্ত: উৎপাদনের উপকরণ, যা উৎপাদনের প্রক্রিয়ায় ফিরে আসার উপযোগী, আর ভোগ্য জিনিসপত্র — এগুলি সমাজের সদস্যদের প্রয়োজনগুলো এককভাবে এবং যৌথভাবে মেটাবার জন্যে।

উৎপাদনের উপকরণ আবার দুই ভাগে বিভক্ত। তার এক ভাগে — ইমারত, সরঞ্জাম, রেলগাড়ি আর ইঞ্জিন, কৃষি যন্ত্রপাতি এবং অন্যান্য স্থির পরিসম্পৎ। অন্য ভাগটা চল পরিসম্পৎগুলো নিয়ে: কাঁচামাল আর আধা-তৈরি উৎপাদ, জালানি, বিদ্যুৎশক্তি।

স্থির এবং চল পরিসম্পৎ বাড়লে সমাজতান্ত্রিক শ্রমের ক্ষেত্র প্রসারিত হয়, সমাজের সম্পদ বাড়ে, শ্রম লাঘব হয়, শ্রমের উৎপাদিকাশক্তি বাড়ে, শ্রমজীবী জনগণের বৈষয়িক আর সাংস্কৃতিক মান উন্নীত হয়। সমাজতান্ত্রিক সমাজের বৈষয়িক সম্পদের প্রধান অংশটা হল উৎপাদনের উপকরণ বা উৎপাদনকর স্থির এবং চল পরিসম্পৎ। অন্য অংশটা উৎপাদনে সরাসরি শামিল হয় না — সেগুলি হল বাসস্থানের ব্যবস্থাদি, বিভিন্ন সামাজিক আর সাংস্কৃতিক প্রয়োজনের ইমারত: থিয়েটার, মিউজিয়ম, ক্লাব, বিদ্যালয়, পার্ক, ইত্যাদি; এই সবই অর্থনীতির অনুৎপাদী পরিসম্পৎ।

মূল্য রূপে মোট সামাজিক উৎপাদ হল অর্থনীতির সমস্ত ক্ষেত্রে উৎপন্ন উৎপাদের মূল্যগুলোর সর্বমোট পরিমাণটা। এর মধ্যে পড়ে: এক, ব্যবহারের দরুন নিঃশেষিত উৎপাদনের উপকরণের মূল্য, দুই, বৈষয়িক উৎপাদনের সমস্ত ক্ষেত্রে শ্রমিক, যৌথখামারী এবং বুদ্ধিজীবীদের শ্রমের ফলে সৃষ্টি-করা নতুন মূল্য। এই দু'ভাগের প্রথমটা ব্যবহৃত হয় নিঃশেষিত উৎপাদনের উপকরণের স্থানপূরণের জন্যে (মূল্য হিসেবে), আর অন্য ভাগটা যায় সমাজের হাতে তার যাবতীয় প্রয়োজন মেটাবার জন্যে, এটাই সমাজতান্ত্রিক সমাজের জাতীয় আয়, তা নিয়ে পরে বলা হবে।

পরিকল্পিত অর্থনীতিতে অর্থনীতির পৃথক-পৃথক অংশগুলোকে এমন অনুপাতে নিয়ন্ত্রিত করতে হয়, যাতে পুনরুৎপাদন-প্রক্রিয়ার মধ্যে সামাজিক উৎপাদের গঠন (তার বৈষয়িক রূপের দিক থেকে) ঐ উৎপাদের অঙ্গ-উপাদানগুলোর সামাজিক তালিকার অনুযায়ী হয়। সমাজতান্ত্রিক প্রসারিত পুনরুৎপাদন-প্রক্রিয়ায় সমানুপাত ঘটানোর জন্যে সেটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

অর্থনীতির সমস্ত শাখার উৎপাদ অব্যাহতভাবে বিক্রি করার উপর নির্ভর করে সমাজতান্ত্রিক পুনরুৎপাদনের সাধারণ-স্বাভাবিক ধারাটা। সমাজতান্ত্রিক সমাজে বাজারের, অর্থাৎ, পণ্যসমূহ বিক্রি করার সমগ্র পরিবেশের ভূমিকার গুরুত্বটা এর থেকে দেখা যায়। সমাজতান্ত্রিক শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলোর পণ্য — সমাজতান্ত্রিক উৎপাদনের জাতদ্রব্যসামগ্রী বিক্রি করার বাজার সংগঠিত হয় পরিকল্পনা অনুসারে। বাজারের হালচাল, সেখানে এবং ক্রেতাদের চাহিদায় বিভিন্ন পরিবর্তনের বিষয়টা মনে রাখা সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির পরিকল্পিত ব্যবস্থাপনের একটা মূল করণীয় কাজ।

উৎপাদনের উপকরণের স্থানপূরণ

যন্ত্রপাতি, কাঁচামাল এবং জালানি — এইসব উৎপাদনের উপকরণের একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ সামাজিক উৎপাদ তৈরি করার মধ্যে নিঃশেষিত হয়ে যায়। বার্ষিক সামাজিক উৎপাদ থেকে উৎপাদনের উপকরণের এই পরিমাণটার স্থানপূরণ করার উপর অপরিবর্তিত পরিমাণে উৎপাদনের অব্যাহত এবং নিরবচ্ছিন্ন পুনর্নবীকরণ নির্ভর করে।

ধরা যাক, এক বছরে নিঃশেষিত হয়ে গেছে ১,২৫,০০০ ধাতু আকারণের লেদ এবং ৪৫ কোটি টন কয়লা। তার মানে, নিঃশেষিত উৎপাদনের উপকরণের বাবত ক্ষতিপূরণের জন্যে সমাজের বার্ষিক উৎপাদ থেকে অতগুলো লেদ এবং ঐ পরিমাণ কয়লা বাদ দিয়ে সেটাকে অর্থনীতির স্থির এবং চল পরিসম্পতের মধ্যে ফেরত দিতে হবে।

নিঃশেষিত উৎপাদনের উপকরণ বাবত ক্ষতিপূরণ হওয়া চাই মূল্য (অর্থ) রূপেও। ধরা যাক, এক বছরে নিঃশেষিত

হয়েছে ১০,০০০ কোটি রুবল দামের উৎপাদনের উপকরণ। অর্থাৎ কিনা, ঐ দামের উৎপাদনের উপকরণ দিয়ে নিঃশেষিত উপকরণের স্থানপূরণ করার সামর্থ্য সমাজের থাকা চাই। সমাজতান্ত্রিক সমাজে বৈষয়িক উৎপাদনকর পরিসম্পৎ পুনর্নবায়ন করা হয় পরিকল্পিত এবং সংগঠিত উপায়ে।

সামাজিক উৎপাদনের দুটো বিভাগের মধ্যেকার অনুপাত

সমাজতান্ত্রিক প্রসারিত পুনরুৎপাদন বলতে বুঝায় বিভিন্ন আর্থনীতিক শাখার মধ্যে, বিশেষত উৎপাদনের উপকরণ (১ নং বিভাগ) উৎপাদন এবং ভোগ্য পণ্য (২নং বিভাগ) উৎপাদনের মধ্যে মূর্ত-নির্দিষ্ট পরিমাণগত অনুপাত।

আগেই দেখা গেছে, পুঁজিতান্ত্রিক প্রসারিত পুনরুৎপাদনে ১ নং বিভাগের আবশ্যক এবং উদ্বৃত্ত উৎপাদের মোট পরিমাণের মূল্য ২ নং বিভাগের স্থির পুঁজির চেয়ে বেশি হওয়া চাই। এই পরিমাণগত অনুপাত স্থাপিত হওয়া চাই সমাজতান্ত্রিক সমাজেও — তবে, পার্থক্য এই যে, সমাজতান্ত্রিক সমাজে এটা স্থির পুঁজির ব্যাপার নয়, এটা হল স্থির আর চল পরিসম্পতের ব্যাপার।

অর্থাৎ কিনা, ভোগ্য পণ্য উৎপাদনের চেয়ে উৎপাদনের উপকরণ উৎপাদন বাড়াবার অগ্রাধিকার সমাজতান্ত্রিক প্রসারিত পুনরুৎপাদনের একটা আর্থনীতিক নিয়ম। কিন্তু, তাই ব'লে, ঐ দুই বিভাগে বৃদ্ধির হারের মধ্যেকার অনুপাত সমাজতন্ত্র আর কমিউনিজম গড়ার কাজের সমস্ত পর্বেই অপরিবর্তিত থেকে যায়, তা নয়।

সোভিয়েত ইউনিয়নে শিল্পযোজনের প্রারম্ভিক পর্বগুলিতে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ভারি শিল্পের শক্তিশালী ভিত্তিস্থাপন করা দরকার ছিল, তখন শিল্পের দুটো বিভাগে উন্নয়নের হারের মধ্যে বিস্তর পার্থক্য থাকাটা ছিল অনিবার্য। ১৯২৯ থেকে ১৯৪০ সালে উৎপাদনের উপকরণ উৎপাদনের বৃদ্ধির গড় বার্ষিক হার ছিল ভোগ্য পণ্য উৎপাদনের ঐ হারের চেয়ে প্রায় ৭০ শতাংশ বেশি। পরাক্রমশালী আর্থনীতিক ক্ষমতা সৃষ্টি হবার পরে এবং উৎপাদন-বলগুলো উন্নয়নের উঁচু মানে উঠে গেলে সরাসরি জনসাধারণের প্রয়োজনগুলো মেটানোর সামাজিক উৎপাদনের শাখাগুলোর বৃদ্ধি অনেকটা ত্বরিত করা সম্ভব হয়েছিল। ভারি শিল্প উন্নয়নে অগ্রগতি ঘটলে ভোগ্য পণ্য শিল্প উন্নয়নে ঢের বেশি সম্বল-সংস্থান চালান করা সম্ভব হয়। ভোগ্য পণ্য উৎপাদনের ত্বরায়িত বৃদ্ধি সমগ্র অর্থনীতির আরও উন্নয়নের উপযোগী একটা অত্যাবশ্যক শর্ত — কেননা, উৎপাদন ঠেলে বাড়িয়ে তোলার বৈষয়িক প্রবর্তনা সক্রিয় করে তোলে শুধু এই বৃদ্ধিটাই।

শ্রমশক্তির পুনরুৎপাদন

শ্রমজীবীদের সংখ্যা ক্রমাগত বেড়ে না চললে এবং তাদের সাংস্কৃতিক আর প্রযুক্তিগত মান সমানে উন্নীত না হলে সমাজতান্ত্রিক প্রসারিত পুনরুৎপাদনের কথা কল্পনাও করা যেত না।

সমাজতন্ত্রের আমলে শ্রমিক শ্রেণীকে জনপূর্ণ করে তোলার প্রধান উৎস হল জনসংখ্যার স্বাভাবিক বৃদ্ধি। তার উপর, কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদন যন্ত্রসজ্জিত হবার ফলে সেখানে

যে-শ্রমশক্তি উদ্বৃত্ত হচ্ছে সেটাকে টেনে নিচ্ছে শিল্প। আর শেষে, মেয়েরা গৃহস্থালির ঝামেলার বোঝার বেশির ভাগটা থেকে রেহাই পাবার ফলে তাদের উৎপাদন-প্রক্রিয়ার মধ্যে টেনে নেওয়া সম্ভব হচ্ছে। সমাজতান্ত্রিক সমাজে বহুসংখ্যক শিক্ষায়তনে এবং কাজের ভিতর দিয়ে দক্ষ কর্মিদল গড়ে তোলা হয় পরিকল্পনা অনুসারে।

কমিউনিজম গড়ার কাজে উৎপাদনের দ্রুত বৃদ্ধি এবং উন্নতির ফলে শ্রমশক্তি ব্যবহারের পদ্ধতিতে অনেকটা পরিবর্তন ঘটে। নতুন সরঞ্জাম নিয়োগ করার ফলে সর্বপ্রথমেই আনুষঙ্গিক কাজে নিযুক্ত শ্রমিকদের অন্য কাজের জন্যে পাওয়া যায়। পরিচালন আর ব্যবস্থাপন যন্ত্রটাকে ছোট করা, কৃষির আরও যন্ত্রসজ্জা, গৃহস্থালির বোঝা থেকে মেয়েদের রেহাই দেওয়ার ফলে শিল্পে এবং অর্থনীতির অন্যান্য শাখায় নিযুক্ত লোকের সংখ্যা বাড়ানোর যথেষ্ট সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়। তার সঙ্গে সঙ্গে, স্বাস্থ্যরক্ষাব্যবস্থা, শিক্ষা আর সংস্কৃতির বিস্তৃত উন্নয়নের ফলে এইসব ক্ষেত্রে নিযুক্ত লোকের সংখ্যা দ্রুত বাড়াবার দরকার হয়। সাধারণের ভোগ্য তহবিল বাড়ানো, শিক্ষার প্রসার এবং সেবাকার্য শিল্প সম্প্রসারিত করার আবশ্যকতা থেকে ঐ বৃদ্ধির প্রয়োজন দেখা দেয়। সমাজতান্ত্রিক সমাজে অর্থনীতির অনুৎপাদী ক্ষেত্রগুলোর প্রসার শ্রমজীবী জনগণের প্রয়োজনগুলো আরও পুরোপুরি মেটাবার সহায়ক হয়, শ্রমিকদের জীবনযাত্রার পরিবেশ উন্নততর করে।

সমাজের শ্রমবাহিনী কাজে লাগাবার ব্যাপারে বিভিন্ন পরিবর্তনের ফলে শ্রমিকদের গণশিক্ষা আর দক্ষতা উন্নত করা এবং শ্রমশক্তির পরিকল্পিত পুনর্বণ্টনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন গুরুতর করণীয় কাজ এসে পড়ে।

২। জাতীয় আয়

সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিতে জাতীয় আয়বৃদ্ধি

মোট সামাজিক উৎপাদ থেকে যে-অংশটা যায় নিঃশেষিত উৎপাদনের উপকরণের স্থানপূরণের জন্যে সেটা বাদ দিলে থাকে জাতীয় আয়। অন্য কথায়, কোন এক বছরে সমাজ যে নতুন মূল্য সৃষ্টি করে, সেটাই জাতীয় আয়। সমাজতন্ত্রের আমলে জাতীয় আয়ের সবটাই আসে সমাজের হাতে; জাতীয় আয় বাড়লে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির সাফল্য এবং জীবনযাত্রার মানের উন্নতি ঘটে। সমাজতান্ত্রিক সমাজে মোট সামাজিক উৎপাদের মতো জাতীয় আয়ও দেখানো হয় বৈষয়িক (ভৌত) এবং মূল্য (অর্থ) রূপে।

সমাজতান্ত্রিক সমাজে জাতীয় আয়ের ভৌত রূপের দুটো উপাদান আছে — এক, সংশ্লিষ্ট বছরে উৎপন্ন ভোগ্য পণ্যরাশি এবং, দুই, সংশ্লিষ্ট বছরে নিঃশেষিত উৎপাদনের উপকরণের স্থানপূরণের অংশ বাদ দিলে উৎপন্ন উৎপাদনের উপকরণরাশি, যেগুলো উৎপাদন আরও সম্প্রসারিত করার জন্যে ব্যবহৃত হয়।

সমাজতান্ত্রিক সমাজে অর্থ রূপে জাতীয় আয় হল — বৈষয়িক উৎপাদনের ক্ষেত্রে শ্রমিক, যৌথখামারী এবং বুদ্ধিজীবীদের আবশ্যক শ্রম আর উদ্বৃত্ত শ্রম এই দুইই দিয়ে উৎপন্ন যাবতীয় মূল্যের সমষ্টি। সমাজের ব্যক্তিগত আর সামাজিক প্রয়োজনগুলো মেটাবার জন্যে নিযুক্ত হয় এইসব মূল্য, এগুলি রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনসমূহ এবং উৎপাদন সম্প্রসারণের খরচ মেটায়।

জাতীয় আয়বৃদ্ধির আনুকূল্য করে দুটো জিনিস:

বৈষয়িক উৎপাদনের বিভিন্ন শাখায় নিযুক্ত শ্রমিকদের সংখ্যাবৃদ্ধি এবং সামাজিক শ্রমের উৎপাদিকাশক্তিবৃদ্ধি।

শ্রমিকসংখ্যার বৃদ্ধি কিছুটা সীমাবদ্ধই। তার উপর, কর্মে-নিযুক্ত কর্মীদের সংখ্যা যা বাড়ে তার বেশ-একটা অংশ লেগে যায় অনুৎপাদী ক্ষেত্রে — প্রধানত শিক্ষাক্ষেত্রে আর স্বাস্থ্যরক্ষাব্যবস্থায়। কাজেই, শ্রমের উৎপাদিকাশক্তিবৃদ্ধিই জাতীয় আয় বাড়াবার প্রধান উপাদান।

সমাজতন্ত্রের আমলে শিল্প, কৃষি এবং জাতীয় অর্থনীতির অন্যান্য শাখার দ্রুত সম্প্রসারণের ফলে জাতীয় আয়বৃদ্ধির যে-হার নিশ্চিত হয়, তেমনটা পুঁজিতন্ত্রের আমলে ঘটানো সম্ভব নয়। সোভিয়েত ইউনিয়নে জাতীয় আয়ের অনপেক্ষ পরিমাণ বাড়ার ধরনটা দেখা যাচ্ছে নিম্নলিখিত তথ্যগুলিতে: ১৯৪০ সালের জাতীয় আয়কে ১০০ ধরা হলে সেটা ১৯৪৫ সালে ছিল ৮৩, ১৯৫০ সালে দাঁড়িয়েছিল ১৬৪, আর ১৯৬৫ সালে ৫৯৭। অষ্টম পাঁচসালা পরিকল্পনা কালপর্যায়ে (১৯৬৬—১৯৭০) জাতীয় আয় বেড়েছিল ৪১ শতাংশ। জাতীয় আয় নবম পাঁচসালা পরিকল্পনা কালপর্যায়ে বাড়বে ৩৭—৪০ শতাংশ; এই বৃদ্ধির মোট পরিমাণের ৮০ থেকে ৮৫ শতাংশ আসবে শ্রমের উচ্চতর উৎপাদিকাশক্তি থেকে।

সমাজতান্ত্রিক সঞ্চয়ন

সমাজতান্ত্রিক প্রসারিত পুনরুৎপাদনের সমাজতান্ত্রিক সঞ্চয়ন অপরিহার্য। সমাজের উৎপাদনকর পরিসম্পৎগুলির সম্প্রসারণ, নতুন-নতুন প্রতিষ্ঠান নির্মাণ এবং যেসব প্রতিষ্ঠান রয়েছে সেগুলির সম্প্রসারণ আধুনিকীকরণ আর পুনর্নির্মাণের কাজে জাতীয় আয়ের একটা নির্দিষ্ট অংশকে

নিয়মিতভাবে চালান করাই সঞ্চয়ন।

সঞ্চয়নের উৎপত্তিস্থল, সেটা ঘটাবার প্রণালী এবং সামাজিক ফলাফলের দিক থেকে সমাজতান্ত্রিক এবং পুঁজিতান্ত্রিক সঞ্চয়নের মধ্যে মূলগত পার্থক্য আছে।

এক, সমাজতান্ত্রিক সঞ্চয়নের উৎস হল শ্রমজীবী জনগণের উদ্বৃত্ত শ্রম, এই জনগণ শোষণমুক্ত, তারা কাজ করে নিজেদের জন্যে এবং নিজেদের সমাজের জন্যে, আর পুঁজিতান্ত্রিক সঞ্চয়নে পুঁজি রাশীকৃত হয় পুঁজিপতিদের শোষিত শ্রমিকদের থেকে নিঙড়ে নেওয়া উদ্বৃত্ত শ্রম দিয়ে।

দুই, সমাজতান্ত্রিক সঞ্চয়ন ঘটানো হয় পরিকল্পিত উপায়ে; সামাজিক সম্পদ বাড়ানো এবং জীবনযাত্রার মান উন্নীত করা তার উদ্দেশ্য; কিন্তু পুঁজিতান্ত্রিক সঞ্চয়নে পুঁজি রাশীকৃত করা হয় এলোমেলোভাবে, প্রতিদ্বন্দ্বিতার ভিতর দিয়ে, — পুঁজিতান্ত্রিক লাভ বাড়ানোই তার উদ্দেশ্য।

তিন, সমাজতান্ত্রিক সঞ্চয়নে বাড়ে সাধারণের সম্পত্তি, আর পুঁজিতান্ত্রিক সঞ্চয়নে বাড়ে পুঁজিতান্ত্রিক ব্যক্তিগত সম্পত্তি।

সমাজতান্ত্রিক সঞ্চয়ন জীবনযাত্রার মান বাড়াবার জন্যে অপরিহার্য, আর পুঁজিতান্ত্রিক সঞ্চয়নে মেহনতী জনগণের জীবনযাত্রা আরও বেশি বিপন্ন হয়ে পড়ে। সমাজতান্ত্রিক সঞ্চয়ন সমাজতান্ত্রিক আর্থনীতিক ব্যবস্থাকে আরও মজবুত করে, সমস্ত নাগরিকের কাজের অধিকার নিশ্চিত করে, সংকটমুক্ত আর্থনীতিক উন্নয়ন ঘটায়, আর পুঁজিতান্ত্রিক সঞ্চয়ন পুঁজিতন্ত্রের বৈরকার দ্বন্দ্বগুলোকে প্রকোপিত করে তোলে, বেকারি আর সংকটের উদ্ভব ঘটায়।

দেশের উৎপাদনকর পরিসম্পৎ দ্রুত এবং সমানে বেড়ে চলা সমাজতান্ত্রিক সঞ্চয়ন নিশ্চিত করে সর্বপ্রথমে। ১৯৭১ সালের মধ্যে সোভিয়েত ইউনিয়নের উৎপাদনকর স্থির

পরিসম্পতের পরিমাণ দাঁড়িয়েছিল ১৯৪০ সালের অংকটার চেয়ে ৮·১ গুণ বেশি। এই সময়ে শিল্পের স্থির পরিসম্পৎ বেড়েছিল ১১ গুণের বেশি।

জাতীয় আয়ের বণ্টন।
ভোগ-ব্যবহার এবং সঞ্চয়নের তহবিল

সমাজের বিভিন্ন প্রয়োজন মেটাবার জন্যে তার হাতে ভৌত আর অর্থ রূপে যত উপায়-সংস্থান থাকে, তার সর্বসমষ্টিটাই জাতীয় আয়।

সমাজতান্ত্রিক সমাজের প্রয়োজনগুলোকে চারটে মূল খাতে ভাগ করা যায়। এক, শ্রম অনুসারে বণ্টনের আর্থনীতিক নিয়মের সঙ্গে সংগতি রেখে শ্রমিক, যৌথখামারী এবং বুদ্ধিজীবীদের পারিশ্রমিক। দুই, সাধারণের ভোগ্য তহবিলের পয়সায় জনসমষ্টির যেসব প্রয়োজন মেটানো হয়, সেগুলো হল — শিক্ষা, বিজ্ঞান, সংস্কৃতি, স্বাস্থ্যরক্ষাব্যবস্থার উন্নয়ন, শ্রমজীবী জনগণের জীবনযাত্রার পরিবেশের উন্নতিবিধান, বার্ধক্য এবং কর্মক্ষমতাহানির অবস্থায় পেনশন, বহু-সন্তানের মায়েদের জন্যে সরকারী সাহায্য, ইত্যাদির খরচা। তিন, রাষ্ট্রযন্ত্রের কেন্দ্রীয় আর স্থানীয় সংস্থাগুলো এবং প্রতিরক্ষাব্যবস্থা বাবত খরচ-খরচা। চার, উৎপাদনবৃদ্ধির প্রয়োজন এবং অর্থনীতির অনুৎপাদী তহবিলগুলো আর রিজার্ভ তহবিল গড়ার বাবত ব্যয়।

সমাজতান্ত্রিক সমাজের এই প্রধান প্রয়োজনগুলো অনুসারে জাতীয় আয়কে দুটো মূল তহবিলে ভাগ করা হয়: সঞ্চয়ন তহবিল এবং ভোগ-ব্যবহারের তহবিল। প্রয়োজনগুলোর প্রথম তিনটি ভাগ ভোগ-ব্যবহারের তহবিল থেকে আর চতুর্থ ভাগ সঞ্চয়ন তহবিল থেকে মেটান হয়।

বহু বছর যাবত সোভিয়েত ইউনিয়নে জাতীয় আয়ের প্রায় ৭৫ শতাংশ যাচ্ছে ভোগ-ব্যবহারের তহবিলে, আর সঞ্চয়ন তহবিলে ২৫ শতাংশ। সামাজিক উৎপাদনের ফলপ্রদতা বাড়ার ফলে, একদিকে, সমাজতান্ত্রিক সঞ্চয়ন বাড়ে, আর জীবনযাত্রার মান উন্নীত হয় অন্যদিকে।

সমাজতান্ত্রিক সমাজে জীবনযাত্রার মান বাড়াবার ভিত্তি হল জাতীয় আয়বৃদ্ধি। সমাজতন্ত্রের আমলে জাতীয় আয়বৃদ্ধি এবং জীবনযাত্রার মানের উন্নতির মধ্যে একটা সরাসরি সম্পর্ক আছে: জাতীয় আয় যত বেশি হয়, জনগণের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যও হয় ততই বেশি।

প্রসারিত পুনরুৎপাদন এবং বুনিয়াদী নির্মাণকাজ

আর্থনীতিক পরিকল্পনার নির্মাণ-কর্মসূচির বাবত ব্যয়ের জন্যে বিনিয়োগ-করা পুঁজি দিয়ে সৃষ্টি হয় প্রসারিত পুনরুৎপাদনের বৈষয়িক ভিত্তি। সোভিয়েত ইউনিয়নে এবং অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশে বছর-পর-বছর কেন্দ্রীকৃত পুঁজি বিনিয়োগ করে বিশাল নির্মাণ-কর্মসূচির খরচ যোগানো হয়, নির্মিত হয় শত-শত কল-কারখানা, খনি আর বিদ্যুৎকেন্দ্র, নতুন-নতুন শহর আর উপনগরী, রাষ্ট্রীয় খামার আর যৌথখামারের পশুশালা, জলসেচব্যবস্থা আর বিদ্যুৎপ্রেরণের লাইন, লক্ষ-লক্ষ ফ্ল্যাট আর বসতবাড়ি, হাজার-হাজার বিদ্যালয়, কিণ্ডারগার্টেন, শিশুশালা আর হাসপাতাল।

আর্থনীতিক ব্যবস্থাপনের নতুন প্রণালীতে সমাজতান্ত্রিক প্রসারিত পুনরুৎপাদন ঘটে কেন্দ্রীকৃত পুঁজি বিনিয়োগের ভিত্তিতেই শুধু নয়, — শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলোতে অবচয়-বাদ এবং লাভ নিয়ে গড়া উৎপাদন উন্নয়ন তহবিল থেকে অর্থ দিয়ে উৎপাদনের সম্প্রসারণ, উন্নতিবিধান এবং

আধুনিকীকরণের ভিতর দিয়েও সেটা হয়। এর ফলে, অর্থনীতির মূল কোষগুলি — শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলি — সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির পরিকল্পিত, আনুপাতিক বিকাশের ক্ষেত্রে বড়রকমের অবদান রাখতে পারে এবং আরও বেশি উন্নতিশীল এবং সম্ভাবনাময় উৎপাদনপ্রণালী চালু ক'রে অর্থনীতির গঠনের উন্নতিবিধান করতে পারে।

উৎপাদন-সামর্থ্যগুলিকে দ্রুত চালু করা এবং তার সঙ্গে সঙ্গে নির্মাণের উঁচু মাত্রায় গুণই নির্মাণ-সংগঠনগুলির কর্মসাধনসাফল্য মূল্যায়নের প্রধান সূচক। নির্মাণকাজ বিকাশের মূল ধারাটা হল তার শিল্পায়ন, — নির্মাণের প্রক্রিয়াটাকে ত্বরিত করতে এবং পরিব্যয় কমাবার জন্যে সেটা অবশ্যপ্রয়োজনীয়। নির্মাণের বেগ বাড়ানো এবং গুণ উন্নততর করা এবং বিনিয়োজিত পুঁজির ফলপ্রদতা বাড়ানো খুবই গুরুত্বসম্পন্ন একটা করণীয় কাজ।

৩। সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিতে বিভিন্ন প্রচলন-প্রক্রিয়া

সমাজতন্ত্রের আমলে বিভিন্ন প্রচলন-প্রক্রিয়ার বিশেষক উপাদানগুলি

প্রচলন-প্রক্রিয়াগুলো সমাজতান্ত্রিক পুনরুৎপাদনের একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক। এই প্রক্রিয়াগুলো হল — এক, জিনিসের প্রচলন, অর্থাৎ, বাণিজ্যের পরিমাণ এবং অর্থনীতির সমস্ত শাখার বৈষয়িক আর টেকনিকাল যোগান; দুই, ফিনান্স আর ক্রেডিট সম্পর্কের সমগ্র ক্ষেত্রটা, এবং তিন, অর্থের প্রচলন।

সমাজতান্ত্রিক আর্থনীতিক ব্যবস্থায় প্রচলন-প্রক্রিয়াগুলো পরিকল্পিত। সেগুলির ভিত্তি হল সাধারণের সম্পত্তি, —

সেগুলোর উদ্দেশ্য ব্যক্তিগত পুঁজিতান্ত্রিক লাভ তোলা নয় — জনগণের প্রয়োজনগুলো মেটানো এবং অব্যাহত সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন আর পুনরুৎপাদন এগিয়ে নেওয়া।

সামাজিক উৎপাদের একটা মোটা অংশ হল উৎপাদনের উপকরণ, তার বেশির ভাগটাকে মেটায় বৈষয়িক আর টেকনিকাল যোগানের ব্যবস্থা। সরঞ্জাম, কাঁচামাল, জালানি, বিদ্যুৎশক্তি এবং উৎপাদনের অন্যান্য উপকরণের অব্যাহত যোগান সমাজতান্ত্রিক উৎপাদনের সাধারণ-স্বাভাবিক ধারার জন্যে চূড়ান্ত গুরুত্বসম্পন্ন। আর্থনীতিক ব্যবস্থাপনের নতুন প্রণালীতে বৈষয়িক আর টেকনিকাল যোগান উন্নততর করার সুযোগ-সম্ভাবনা বেড়ে গেছে। যোগানদার এবং ব্যবহারক প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে সরাসরি যোগসূত্রগুলো বিস্তৃত পরিসরে গড়ে-বাড়িয়ে তোলা হচ্ছে। বৈষয়িক এবং টেকনিকাল যোগানের ব্যবস্থাটাকে নিশ্চিতভাবে উন্নততর করা এবং পাইকারী বাণিজ্যের মারফত সরঞ্জাম, কাঁচামাল আর আধা-তৈরি মালের পরিকল্পিত বণ্টন চালু করার প্রস্তুতির জন্যে বিভিন্ন ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

বিভিন্ন রকমের বাণিজ্য এবং সেটার কাজ

সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিতে কেবল উৎপাদন নয়, বাণিজ্যেরও প্রসার ঘটে পরিকল্পনা অনুসারে। বাণিজ্যের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশটা — গোটা রাষ্ট্রীয় এবং সমবায় বাণিজ্য চালানো হয় পরিকল্পনার ভিত্তিতে।

সোভিয়েত ইউনিয়নে বাণিজ্য আছে মূল তিন রকমের: রাষ্ট্রীয়, সমবায় এবং যৌথখামারের বাণিজ্য।

সোভিয়েত ইউনিয়নে বাণিজ্যের মোট পরিমাণে রাষ্ট্রীয় এবং সমবায়ের বাণিজ্যের প্রাধান্য রয়েছে। শিল্পে এবং

কৃষিতে সমাজতান্ত্রিক উৎপাদনের উপরই নির্ভর করে এই দুই রকমের বাণিজ্য। রাষ্ট্রীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলির সমস্ত বিক্রয়যোগ্য উৎপাদ এবং যৌথখামারগুলিতে উৎপন্ন খাদ্যসামগ্রীর একটা মোটা অংশ বিক্রি হয় রাষ্ট্রীয় এবং সমবায়ের বাণিজ্য ব্যবস্থার মারফত। ভোগ্য পণ্যের বেশির ভাগটা পড়ে এই বাণিজ্যের মধ্যে। রাষ্ট্রীয় এবং সমবায়ের বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানগুলি যেসব জিনিস নিয়ে কারবার করে সেগুলির দাম বাঁধা হয় পরিকল্পিতভাবে।

রাষ্ট্রীয় আর সমবায়ের বাণিজ্যের পাশাপাশি আছে যৌথখামারের বাণিজ্য। যৌথখামারের এবং সমবায়ের সম্পত্তির প্রকৃতি থেকেই এই রকমের বাণিজ্যের উদ্ভব। যৌথখামারের বাজারে-বাজারে জিনিস বিক্রি করে যৌথখামারগুলি, তাদের উৎপাদের একাংশের দাম ওঠে এইভাবে; এইসব বাজারে জিনিস বিক্রি করে পৃথক-পৃথক যৌথখামারীরাও — তারা খামার থেকে পাওয়া জাতদ্রব্যসামগ্রীর একাংশ এবং নিজেদের অতিরিক্ত জমিখণ্ডের জাতদ্রব্যসামগ্রীর একাংশের দাম তোলে এইভাবে। যৌথখামারের বাজারে দাম নিয়ন্ত্রিত হয় যোগান এবং চাহিদা অনুসারে। রাষ্ট্রীয় এবং সমবায়ের বাণিজ্য উন্নততর হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে, এই দুই রকমের বাণিজ্যের পরিকল্পিত দামের প্রভাবে যৌথখামারের বাজারে দাম নামে।

বহির্বাণিজ্যে একচেটিয়া

পুঁজিতান্ত্রিক দেশগুলির আর্থনীতিক আগ্রাসনের অপচেষ্টার বিরুদ্ধে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির দেশী বাজারকে সুরক্ষিত করে বহির্বাণিজ্যে রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া। বিদেশের

সঙ্গে সমস্ত বাণিজ্যিক লেনদেন করার একমাত্র অধিকারী সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র এবং তার বিভিন্ন সংস্থা।

সোভিয়েত ইউনিয়নের বহির্বাণিজ্য হল সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং অন্যান্য দেশের মধ্যে আর্থনীতিক সম্পর্কের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটা রূপ — এটা রাষ্ট্রের একচেটে কারবার। একেবারে সোভিয়েত রাজের শুরু থেকেই দেশের পুঁজিতন্ত্রীদের সঙ্গে বিশ্ব পুঁজিতন্ত্রের যোগাযোগ করার সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ করে এসেছে এই একচেটিয়া। এর ফলে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি বহির্বাণিজ্যকে সমাজতান্ত্রিক নির্মাণকাজের স্বার্থানুযায়ী করতে পেরেছে।

সমস্ত সমাজতান্ত্রিক দেশেরই অর্থনীতিতে বহির্বাণিজ্যের একটা বড়রকমের ভূমিকা আছে। এটা প্রধানত বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক আর্থনীতিক ব্যবস্থার দেশগুলির মধ্যে বাণিজ্যের বিকাশ এবং সম্প্রসারণের উপায়, আবার সঙ্গে সঙ্গে, সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি এবং শিল্পোন্নত পুঁজিতান্ত্রিক দেশগুলি আর নবীন উন্নয়নশীল দেশগুলির মধ্যে আর্থনীতিক যোগাযোগ বাড়াবারও সহায়ক।

সমাজতন্ত্রের আমলে ফিনান্স এবং ক্রেডিট ব্যবস্থা

সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের প্রয়োজনগুলো মেটাবার জন্যে স্পষ্ট-নির্দিষ্ট সম্বল-সংস্থান থাকা চাই। রাষ্ট্রীয়-মালিকানাধীন শিল্পপ্রতিষ্ঠান এবং আর্থনীতিক সংগঠনগুলোর আয়ই এই রাষ্ট্রের আয়ের প্রধান উৎস।

মোট আগম থেকে উৎপাদন-পরিব্যয় বাদ দিলে যা থাকে সেটা প্রতিষ্ঠানের আয় (লাভ), — বিক্রি করা উৎপাদের পরিমাণ আর গুণ, উৎপাদন-পরিব্যয় এবং উৎপাদ-পরিব্যয়

আর বেচা-দামের মধ্যেকার অনুপাতের উপর ঐ আয়ের পরিমাণ নির্ভর করে।

শিল্পপ্রতিষ্ঠানের পক্ষে অপরিহার্য আর্থিক সংস্থান আসে তার নগদ আয় থেকে। প্রতিষ্ঠানের নগদ আয়ের একটা অংশ যায় আর্থিক সংস্থানের সাধারণ রাষ্ট্রীয় তহবিলে, সেটা লাগে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের ব্যবহারের জন্যে কিংবা অন্যান্য রাষ্ট্রীয় খরচ-খরচা মেটাবার জন্যে। অংশত সরাসরি এবং অংশত আর্থিক সংস্থানের সাধারণ রাষ্ট্রীয় তহবিল মারফত এই অর্থ যায় রাষ্ট্রের সাধারণ প্রয়োজনগুলো মেটাবার জন্যে। যৌথখামার এবং সমবায় প্রতিষ্ঠানগুলির আয়ের একটা নির্দিষ্ট অংশও আর্থিক সংস্থানের সাধারণ রাষ্ট্রীয় তহবিলে যায়। তার উপর, যৌথখামার আর সমবায় প্রতিষ্ঠানগুলি, বিভিন্ন সংগঠন এবং সাধারণভাবে সমগ্র জনসমষ্টির অব্যবহৃত আর্থিক সংস্থানকেও কিছুকালের জন্যে নির্দিষ্ট সুদে ঐ তহবিলে নিয়ে সেটাকে রাষ্ট্রের সাধারণ প্রয়োজনগুলো মেটাবার জন্যে ব্যবহার করা হয়।

এইভাবে, আর্থিক সংস্থানের পুনর্বণ্টনের ভিতর দিয়ে, একদিকে, বিভিন্ন কল-কারখানা, প্রতিষ্ঠান, সংগঠন আর জনসমষ্টির আয়, সঞ্চয়ন আর বাঁচানো টাকার একটা অংশকে জড়ো করা হয়, আর, অন্যদিকে, এইভাবে সংগ্রহ করা অর্থ চালান করা হয় অন্যান্য কারখানা, প্রতিষ্ঠান আর সংগঠনে। এই পুনর্বণ্টনের ব্যাপারটা আর্থিক নিয়ন্ত্রণের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট। এই সমস্ত ক্রিয়াই আর্থ ব্যবস্থার কাজ, এই ব্যবস্থাটার মধ্যে পড়ে — রাষ্ট্রীয় বাজেট, ব্যাঙ্কগুলি, রাষ্ট্রীয় বিমা সংস্থাগুলি এবং সেভিংস ব্যাঙ্কগুলি।

রাষ্ট্রীয় বাজেটই সমাজতান্ত্রিক আর্থ ব্যবস্থার মধ্যে মূল যোগসূত্র।

সমাজতান্ত্রিক দেশে রাষ্ট্রীয় বাজেট সমগ্র অর্থনীতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে গ্রন্থিবদ্ধ — কেননা, দেশের আর্থিক সংগতির বেশির ভাগটাই এতে কেন্দ্রীভূত হয়, আর রাষ্ট্রের প্রয়োজনের বেশির ভাগটা মেটাবার জন্যে এতে প্রয়োজনীয় পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ করা হয়।

সমাজতান্ত্রিক সমাজে সাময়িকভাবে অকেজো টাকাটাকে আর্থনীতিক ক্রিয়াকলাপের মধ্যে টেনে নেয় ক্রেডিট, সেটা নগদ টাকার সাময়িক প্রয়োজন মেটায়। প্রধানত বিভিন্ন আয় আর সঞ্চয়নের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আর্থ আর বাজেট সংক্রান্ত প্রণালীর সঙ্গে তুলনায় আর্থিক সংস্থান পুনর্বণ্টনের ক্রেডিট-প্রণালীর বিশেষক উপাদানগুলো আসে তারই থেকে।

পণ্যের উৎপাদন এবং প্রচলনের সমস্ত পর্যায়ে শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলির আর্থনীতিক ক্রিয়াকলাপ মেটায় ক্রেডিট। সোভিয়েত ইউনিয়নের রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্ক হল অর্থনীতিতে স্বল্পমেয়াদী ক্রেডিট দেওয়া এবং হিসাবনিকাশের প্রধান সংস্থা, দেশের মুদ্রা তহবিল এবং মুদ্রা প্রচলনের কেন্দ্র, তেমনি, বিদেশের সঙ্গে হিসাবনিকাশের সংস্থাও। চল পরিসম্পৎ এবং প্রচলনের পরিসম্পতের চলাচলের জন্যে যোগানদার আর্থিক সংস্থান কেন্দ্রীভূত থাকে রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্কে, — বিভিন্ন কল-কারখানা, প্রতিষ্ঠান এবং সংগঠনের মধ্যে সমস্ত দেনা-পাওনার হিসাবনিকাশও হয় রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্কেরই মারফত। জাতীয় অর্থনীতির সঙ্গে রাষ্ট্রীয় বাজেটের হিসাবাদি করে এবং বাজেটে অর্থ দেয়ও রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্ক।

সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিতে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা ভূমিকায় থাকে ফিনান্স আর ক্রেডিটের ব্যবস্থাটা, —

সমাজতান্ত্রিক পুনরুৎপাদনের অব্যাহত বৃদ্ধির জন্যে সেটার সাধারণ-স্বাভাবিক ক্রিয়া চূড়ান্ত গুরুত্বসম্পন্ন।

রাষ্ট্রীয় আর্থ শৃঙ্খলা অনুসারে প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠানকে রাষ্ট্রের প্রতি বাধ্যবাধকতা পালন করতে হয় এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠান আর সংগঠনের সঙ্গে চুক্তির বাধ্যবাধকতা মেনে চলতে হয় যথাযথভাবে এবং যথাসময়ে, তেমনি, পাওনা মেটানো, মাল সরবরাহ এবং ডেলিভারি বাবত টাকা দেওয়া, এইসব কাজ করতে হয় সময়মতো, — ফিনান্স আর ক্রেডিট ব্যবস্থার সাধারণ-স্বাভাবিক ক্রিয়ার জন্যে এই রাষ্ট্রীয় আর্থ শৃঙ্খলা যথাযথভাবে মেনে চলাটা অবশ্যপ্রয়োজনীয়। আর্থিক সংস্থান আর বৈষয়িক মূল্যবস্তুগুলির আটক হয়ে পড়া রোধ করা এবং চল পরিসম্পতের প্রচলন ত্বরান্বিত করাও চূড়ান্ত গুরুত্বসম্পন্ন।

মিতব্যয়ী এবং সুদক্ষ ব্যবস্থাপন নিশ্চিত করার সমস্ত ব্যবস্থাই সমগ্রভাবে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিকে এবং বিশেষভাবে এই অর্থনীতির আর্থ ব্যবস্থাটাকে আরও মজবুত করে তোলে।

৪। সমাজতন্ত্র থেকে কমিউনিজমে

কমিউনিজমের দুটো পর্ব

মার্কসবাদের প্রতিষ্ঠাতারা সমাজতন্ত্র আর কমিউনিজমের মধ্যে বিজ্ঞানসম্মত পার্থক্যগুলোকে খুলে দেখিয়ে দিয়ে গেছেন। তাঁরা দেখিয়েছেন, এটা হল কমিউনিস্ট সমাজের আর্থনীতিক পরিপক্কতার ক্ষেত্রে দুটো পর্ব, পরপর দুটো পর্যায়, দুটো ধাপ: সমাজতন্ত্র নিম্নতর পর্ব, আর উচ্চতর পর্ব হল কমিউনিজম। সমাজতন্ত্র আর

কমিউনিজমের মাঝখানে কোন বিচ্ছিন্নতার পাঁচিল নেই। সমাজতন্ত্র তার বিকাশের ধারায় স্বাভাবিকভাবেই কমিউনিজমে পরিণত হয়।

কমিউনিজমের প্রথম পর্ব সমাজতান্ত্রিক সমাজের বিশেষক দিক হল সর্বোপরি দুটো: এক, উৎপাদনের উপকরণ আর ব্যক্তিগত-মালিকানাধীন নয়, সাধারণের এজমালী সম্পত্তি, আর দুই, প্রত্যেকটি কর্মী সামাজিক উৎপাদনে যে-শ্রম দেয়, তার পরিমাণ আর গুণ অনুসারে সমাজ তাকে পারিশ্রমিক দেয়।

কিন্তু, লোকের যোগ্যতা-সামর্থ্য তো পৃথক-পৃথক — কাজেই, শ্রম অনুসারে বণ্টনের সমাজতান্ত্রিক নিয়ম যতকাল চালু থাকে, ততকাল সমাজের সদস্যদের মধ্যে কিছুটা অসমতা অবশ্যম্ভাবী।

কমিউনিজম গড়ার ফলে সমাজের সবারই ষোল-আনা সামাজিক সমতা প্রতিষ্ঠিত হবে। দ্রুত বৈজ্ঞানিক আর প্রযুক্তিগত অগ্রগতির ভিত্তিতে উঁচু মাত্রার শ্রমের উৎপাদিকাশক্তি বৈষয়িক আর মানসিক সম্পদের অঢেল প্রাচুর্য সৃষ্টি করবে, তার ফলে, 'প্রত্যেকে দেবে সামর্থ্য অনুসারে, পাবে প্রয়োজন অনুসারে' — কমিউনিজমের এই নীতি খাটানো সম্ভব হবে।

কমিউনিস্ট সমাজ গড়া শ্রমিক শ্রেণীর বৈপ্লবিক সংগ্রামের চূড়ান্ত লক্ষ্য, মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পার্টির আখেরী গন্তব্যস্থল।

সমাজতন্ত্র গড়ার কাজ শেষ করে সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রবেশ করেছে ঐতিহাসিক বিকাশের এক নতুন পর্যায়ে — সেটা হল কমিউনিজমের উচ্চতর পর্ব গড়ার পর্যায়। কমিউনিজম গড়াটা হয়ে উঠেছে সোভিয়েত জনগণের আশু করণীয় কাজ।

কমিউনিজম — শ্রেণীহীন সমাজব্যবস্থা, তাতে উৎপাদনের উপকরণের উপর একই রকমের সাধারণের মালিকানা, সমাজের সবারই পূর্ণাঙ্গ সামাজিক সমতা। কমিউনিজমের আমলে মানুষের সর্বতোমুখী বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে, নিরবচ্ছিন্ন বৈজ্ঞানিক আর প্রযুক্তিগত অগ্রগতির ভিতর দিয়ে উৎপাদন-বলগুলির বৃদ্ধি ঘটবে; সমষ্টিগত সম্পত্তির সমস্ত উৎসমুখ দিয়ে প্রবাহ হবে আরও অঢেল প্রচুর, সমাজ তখন কাজ অনুসারে বণ্টন থেকে চলে যাবে প্রয়োজন অনুসারে বণ্টনে। কমিউনিজম হল স্বাধীন, সামাজিকভাবে সচেতন শ্রমজীবী মানুষের উঁচু মাত্রায় সংগঠিত সমাজ, সেখানে কায়েম হবে সাধারণের স্বশাসন, তাতে সমাজকল্যাণের জন্যে শ্রম হবে প্রত্যেকের জীবনের পক্ষে অত্যাবশ্যক, এই প্রয়োজন উপলব্ধি করবে একেবারে প্রত্যেকেই, প্রত্যেকের যোগ্যতা সামর্থ্য নিযুক্ত হবে জনগণের সবচেয়ে বেশি সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্যে।

সমাজতন্ত্র বিকশিত হয়ে কমিউনিজমে পরিণত হওয়াটা — বিষয়গত-নিয়মানুগ প্রক্রিয়া। সমাজতন্ত্র বেশ মজবুত হয়ে কায়েম হলে, একমাত্র তখনই কমিউনিজম গড়ে-বেড়ে উঠতে পারে। সমাজতান্ত্রিক সমাজের ভিত্তিগুলো বেড়ে, বিকশিত হয়ে আরও মজবুত হয়ে ওঠার ভিতর দিয়ে কমিউনিজমে উত্তরণ ঘটে। সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার ফলাও বাড়বাড়ন্তর ফলে সৃষ্টি হয় কমিউনিজমের উচ্চতর পর্বে ক্রম-উত্তরণের যাবতীয় আবশ্যক পূর্বাবস্থা। এইসব পূর্বশর্ত কোনটার-পরে-কোনটা এবং কী হারে সঞ্চিত এবং বিকশিত হয়, তদনুসারেই ঘটে এই উত্তরণ।

নিম্নলিখিত আবশ্যক অবস্থাগুলো থাকলে, তবেই কমিউনিজম গড়া যেতে পারে: সমাজতান্ত্রিক সমাজে উঁচু মাত্রায় বিকশিত উৎপাদন-বলসমূহ, জীবনযাত্রার মানবৃদ্ধি,

উৎপাদন-সম্পর্কের উন্নতি, সমাজে সবার চেতনা এবং মতাদর্শগত আর রাজনীতিক মানবৃদ্ধি। কমিউনিজমের বৈষয়িক আর টেকনিকাল বনিয়াদ গড়া, কমিউনিস্ট সামাজিক সম্পর্ক গড়ে ওঠা এবং শিক্ষাদীক্ষা দিয়ে নতুন মানুষ গড়ে তোলার উপর ঐসব অবস্থার পরিপক্বতা নির্ভর করে। এই সমস্ত অবস্থাই অবিচ্ছেদ্যভাবে পরস্পরসংযুক্ত।

কমিউনিজমের বৈষয়িক এবং টেকনিকাল বনিয়াদ গড়া

সমাজতন্ত্রের বৈষয়িক এবং টেকনিকাল বনিয়াদের দ্রুত বিকাশ, সংহতি এবং সর্বতোমুখী উন্নতির ভিতর দিয়ে উদ্ভূত হয় কমিউনিজমের বৈষয়িক ভিত্তি। তবে, এটা কেবল পরিমাণগত বৃদ্ধির ব্যাপার নয়, সামাজিক উৎপাদন-বলগুলোর বিকাশের ধারায় লাফিয়ে-অগ্রগতিও বটে — নতুন গুণগত পর্যায়ে উত্তরণ।

সমাজতন্ত্র থেকে কমিউনিজমে উত্তরণ একটা অবিচ্ছিন্ন প্রক্রিয়া — কাজেই, কমিউনিজমের বৈষয়িক এবং টেকনিকাল বনিয়াদ গড়ার কাজটাও তাই।

সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির কর্মসূচিতে বলা হয়েছে, কমিউনিজমের বৈষয়িক এবং টেকনিকাল বনিয়াদ গড়া বলতে বুঝায়, দেশের পূর্ণাঙ্গ বিদ্যুৎসজ্জা এবং তার ভিত্তিতে জাতীয় অর্থনীতির সমস্ত ক্ষেত্রে সাজসরঞ্জাম, প্রযুক্তি এবং সামাজিক উৎপাদনের সংগঠন নিখুঁত করে তোলা; উৎপাদনপ্রণালীগুলোর বিস্তৃত যন্ত্রসজ্জা এবং ক্রমাগত বেশি মাত্রায় স্বয়ংক্রিয়তা; জাতীয় অর্থনীতিতে রসায়নের ব্যাপক প্রয়োগ; উৎপাদনের নতুন-নতুন অর্থনীতিগতভাবে ফলপ্রদ শাখা, নতুন-নতুন ধরনের শক্তি

এবং নতুন-নতুন মালমশলা প্রবলভাবে গড়ে-বাড়িয়ে তোলা; প্রাকৃতিক, বৈষয়িক এবং শ্রম-সম্পদের সর্বতোমুখী এবং যুক্তিসম্মত সদ্ব্যবহার; বিজ্ঞান আর উৎপাদনের অঙ্গাঙ্গিমিলন এবং দ্রুত বৈজ্ঞানিক আর প্রযুক্তিগত অগ্রগতি; শ্রমজীবী জনগণের উঁচু সাংস্কৃতিক এবং টেকনিকাল মান; শ্রমের উৎপাদিকাশক্তির ক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত অগ্রসর পুঁজিতান্ত্রিক দেশগুলির উপর বেশকিছুটা প্রাধান্য — এটা কমিউনিস্ট ব্যবস্থার চূড়ান্ত বিজয়ের জন্যে সবচেয়ে গুরুত্বসম্পন্ন আবশ্যক পূর্বাবস্থা।

এই প্রধান করণীয় কাজগুলি মিলিয়ে হল সমাজতান্ত্রিক সমাজের উৎপাদন-বলগুলোর বিস্তৃত বিকাশের বিজ্ঞানসম্মতভাবে রচিত পরিকল্পনার বৈশিষ্ট্য।

কমিউনিজমের বৈষয়িক এবং টেকনিকাল বনিয়াদ গড়াই কমিউনিস্ট নির্মাণকাজের সমগ্র কালপর্যায়ে পার্টি এবং সোভিয়েত জনগণের সর্বপ্রধান আর্থনীতিক কাজ। উৎপাদন-সম্পর্কের উন্নতি ঘটে সমাজতন্ত্রের উৎপাদন-বলগুলোর বিকাশের সঙ্গে তাল রেখে।

মানবজাতি এখন পৃথিবীতে অভূতপূর্ব বৈজ্ঞানিক এবং প্রযুক্তিগত বিপ্লবের কালপর্যায়ে — এমনই সময়ে সোভিয়েত ইউনিয়নে কমিউনিজমের বৈষয়িক এবং প্রযুক্তিগত বনিয়াদ গড়ার কাজ চলছে। বিজ্ঞান আর প্রযুক্তিবিদ্যার পূর্ববর্তী সমগ্র বিকাশেরই স্বাভাবিক পরিণতি এই বিপ্লব। নিউক্লীয় শক্তিকে বশমানানো, মহাকাশজয়, রসায়নের বিকাশ, উৎপাদনে স্বয়ংক্রিয়তা এবং বিজ্ঞান আর প্রযুক্তিবিদ্যার ক্ষেত্রে অন্যান্য বিপুল সাধনসাফল্যের সঙ্গে এই বিপ্লব সংশ্লিষ্ট।

বৈজ্ঞানিক এবং প্রযুক্তিগত বিপ্লবের ফলগুলিকে সমাজের স্বার্থে ব্যবহার করতে পারে একমাত্র সমাজতন্ত্রই। প্রকৃতির উপর মানুষের আরও বেশি আয়ত্তির সুযোগ-

সম্ভাবনা খুলে ধরেছে এই বিপ্লব, সমাজের উৎপাদন-বলগুলির বিকাশের ক্ষেত্রে এই বিপ্লব গুণগতভাবে নতুন একটা পর্ব।

একই কমিউনিস্ট সম্পত্তিতে পৌঁছবার পথ

কমিউনিজম গড়ার কাজের প্রক্রিয়ার মধ্যে দুই রকমের সমাজতান্ত্রিক সম্পত্তি ক্রমে পরস্পরের আরও কাছাকাছি এসে, শেষে মিলে-মিশে হয়ে ওঠে একই কমিউনিস্ট সম্পত্তি। রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি (সমগ্র জনগণের সম্পত্তি) এবং যৌথখামার আর সমবায়ের সম্পত্তি — এই দুইয়েরই বৃদ্ধি, মজবুতি এবং উন্নতির ভিতর দিয়ে গড়ে ওঠে একই কমিউনিস্ট সম্পত্তি।

সমাজতান্ত্রিক সমাজে যৌথখামারীরা সমেত সমগ্র জনসমষ্টির জীবিকার ভিত্তি হল সমগ্র জনগণের সম্পত্তি। তেমনি, তার সঙ্গে সঙ্গে, যৌথখামার ব্যবস্থার বিকাশ আর শক্তিবৃদ্ধির ফলে যৌথখামারের সম্পত্তিতে সমগ্র জনগণের সম্পত্তির বিশেষক উপাদানগুলো গড়ে ওঠে আর উন্নত হয়। সমগ্র জনগণের সম্পত্তির সঙ্গে যৌথখামার আর সমবায়ের সম্পত্তির মিলন-মিশ্রণ ঘটবে এই পরে উল্লেখ করা সম্পত্তির বিলুপ্তির ভিতর দিয়ে নয় — সেটা ঘটবে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সহায়তায়, এই সম্পত্তির সামাজিকীকরণের মাত্রা বাড়ার ভিতর দিয়ে।

এই দুই রকমের সম্পত্তির পরস্পরের কাছে এসে পড়ার পথটাই কোটি-কোটি কৃষকের কমিউনিজমের দিকে এগোবার পথ। দুই রকমের সমাজতান্ত্রিক সম্পত্তি পরস্পরের নিকটবর্তী হয়ে এক হয়ে যাওয়া এবং কৃষিক্ষেত্রের শ্রম একরকমের শিল্পক্ষেত্রের শ্রমে রূপান্তরিত হওয়ার মর্ম হবে এই যে, শহর এবং গ্রামাঞ্চলের মধ্যেকার সামাজিক-আর্থনীতিক এবং সাংস্কৃতিক তফাতগুলো আর থাকবে না।

তার ফলে, শ্রমিক এবং কৃষকদের মধ্যেকার পার্থক্যগুলো দূর হয়ে যাবে। কায়িক আর মানসিক শ্রম ক্রমে পরস্পরের নিকটবর্তী হলে, একদিকে, শ্রমিক আর যৌথখামারী এবং, অন্যদিকে, বুদ্ধিজীবীদের মধ্যেকার পার্থক্যগুলো ক্রমে দূর হয়ে যাবে।

বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যেকার সমস্ত পার্থক্য দূর হওয়া — একটা ক্রমান্বয়িক এবং দীর্ঘ প্রক্রিয়া, এই প্রক্রিয়ার মধ্যে সামাজিক সমপ্রকৃতি আসবে ক্রমে অধিকতর মাত্রায়। পূর্ণাঙ্গ কমিউনিস্ট সমাজ গড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে, শ্রেণীতে-শ্রেণীতে সমস্ত পার্থক্য দূর হয়ে যাবে।

শ্রম হয়ে উঠবে মানুষের জীবনের পক্ষে অবশ্যপ্রয়োজনীয়

কমিউনিস্ট সমাজের দুটো পর্বের মধ্যেকার পার্থক্য দেখিয়ে লেনিন বলেছিলেন, সমাজতন্ত্রে থাকা চাই শ্রমজীবী জনগণের আগুয়ান অংশ সংগঠিত অগ্রগামী বাহিনীর তরফে কড়াকড়ি হিসাবরক্ষণ, নিয়ন্ত্রণ এবং তত্ত্বাবধানের সঙ্গে সামাজিক শ্রমের সংযুক্তি, এবং শ্রম আর পারিশ্রমিকের পরিমাপ ধার্য করা। আর কমিউনিজম এমন ব্যবস্থা, যাতে বাধ্যকরণের কোন বিশেষ যন্ত্র ছাড়াই লোকে তাদের সামাজিক কর্তব্যপালনে অভ্যস্ত হয়ে যাবে, সে-ব্যবস্থায় সাধারণের ভালর জন্যে বিনা পারিশ্রমিকে কাজ করা হবে সর্বজনীন ব্যাপার।

কমিউনিজমের বৈষয়িক এবং টেকনিকাল বনিয়াদ সৃষ্টি করার কল্যাণে শ্রমের পরিবেশে মূলগত পরিবর্তন ঘটবে, ঐ বনিয়াদটা হবে সমাজতান্ত্রিক শ্রমের ক্রমে কমিউনিস্ট শ্রমে রূপান্তরিত হবার ভিত্তি। নতুন-নতুন সরঞ্জাম এবং প্রযুক্তি সৃষ্টি করে সেগুলির সাহায্যে শ্রমের পরিবেশের মূলগত

উন্নতি ঘটানো হবে, শ্রমকে করা হবে অনায়াসসাধ্য, কর্ম-দিন খাটো করা হবে, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের উপকরণাদি হবে উন্নততর, কষ্টসাধ্য শ্রম দূর করে দেওয়া হবে এবং পরে সমস্ত অদক্ষ শ্রম বিলুপ্ত করা হবে। দ্রুত বৈজ্ঞানিক এবং প্রযুক্তিগত অগ্রগতি জনগণের সাংস্কৃতিক আর টেকনিকাল মাত্রা এবং সাধারণশিক্ষার মান উন্নততর করবে।

কমিউনিজম গড়ার কাজের কালপর্যায়ে শ্রম সবারই পক্ষে অত্যাবশ্যকীয় হয়ে উঠছে। কমিউনিজম গড়ার সময়ে যেসব মূলগত পরিবর্তন ঘটছে, এই রূপান্তরণ তার স্বাভাবিক পরিণতি। এই রূপান্তরণ চলছে সমাজের বৈষয়িক ক্ষেত্র এবং মনোজগৎ, এই দুইই জুড়ে, সেটার জমিন প্রস্তুত করে সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন-সম্পর্ক বিকাশের সমগ্র ধারাটাই। সেটা হল সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন-সম্পর্কের কমিউনিস্ট উৎপাদন-সম্পর্কে রূপান্তরিত হবার প্রক্রিয়া। শ্রম আর জীবনধারণের উপায় থাকবে না — হয়ে উঠবে যথার্থই সৃজনশীল ক্রিয়াকলাপ, আনন্দের একটা উৎস।

শ্রমজীবী জনগণের কমিউনিস্ট শিক্ষাদীক্ষা

উৎপাদন-বলগুলিকে বিকশিত করা এবং উৎপাদন-সম্পর্ক উন্নততর করা ছাড়াও, কমিউনিস্ট সমাজ গড়ার মধ্যে পড়ে নতুন মানুষ গড়ে তোলার কাজ, যে মানুষ কমিউনিজমের নির্মাতা। কমিউনিজমের প্রতি নিষ্ঠার মনোভাবে সমস্ত শ্রমজীবী মানুষকে দীক্ষিত করা, শ্রম আর সামাজিক অর্থনীতির প্রতি তাদের মধ্যে কমিউনিস্ট মনোভাব সঞ্চারিত করা, বুর্জোয়া মতামত আর নীতিজ্ঞানের অবশেষগুলোকে চূড়ান্তভাবে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া — এটা হল কমিউনিজমের দিকে সাফল্যমণ্ডিত অগ্রগতি

নিশ্চিত করার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটা শর্ত। কমিউনিস্ট সমাজের ভবিষ্যৎ গঠনকর্তা — নওজোয়ানের কমিউনিস্ট শিক্ষাদীক্ষা বিশেষ তাৎপর্যসম্পন্ন।

কমিউনিস্ট নির্মাণকাজে জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং সামাজিক ক্রিয়াকলাপের সমস্ত ক্ষেত্রে কমিউনিস্ট নীতিসমূহের বিকাশের ভিতর দিয়ে পার্টি, রাষ্ট্র এবং বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনের পরিচালিত শিক্ষামূলক কাজের প্রভাবে গড়ে ওঠে নতুন মানুষ। একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় থাকে পত্র-পত্রিকা আর রেডিও, সিনেমা আর টেলিভিশন — মতাদর্শগত কাজের সমস্ত উপায়-উপকরণ। কমিউনিস্ট বিশ্ববীক্ষা গড়ে তুলতে খুবই তাৎপর্যসম্পন্ন একটা ভূমিকায় থাকে বিজ্ঞান এবং বিভিন্ন শিল্পবিদ্যা। দার্শনিক, আর্থনীতিক এবং সামাজিক-রাজনীতিক মতের একটা সমন্বিত অখন্ড সংগতিসম্পন্ন ব্যবস্থা হিসেবে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ সমাজতান্ত্রিক সমাজে সমস্ত শ্রমজীবী মানুষের বিজ্ঞানসম্মত বিশ্ববীক্ষা গড়ে তোলার ভিত্তি।

কমিউনিজম গড়ার কাজের কালপর্যায়ে কমিউনিস্ট পার্টির বর্ধিত ভূমিকা

সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির কর্মসূচিতে বলা হয়েছে, কমিউনিস্ট নির্মাণকাজের কালপর্যায়ের একটা বিশেষত্ব এই যে, সোভিয়েত সমাজে সর্বপ্রধান এবং পরিচালক শক্তি হিসেবে কমিউনিস্ট পার্টির ভূমিকা এবং গুরুত্ব এই সময়ে আরও বেড়ে যাচ্ছে।

কমিউনিজম গড়ার করণীয় কাজের ক্রমাগত বেড়ে চলা পরিধি এবং জটিলতা, রাষ্ট্রীয় বিষয়াবলি এবং

উৎপাদনের পরিচালনায় কোটি-কোটি শ্রমজীবী মানুষের ক্রমবর্ধমান সৃজনশীল ক্রিয়াকলাপ, সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের আরও প্রসার, বিজ্ঞানসম্মত কমিউনিজম তত্ত্বের ক্রমবর্ধমান ভূমিকা এবং শ্রমজীবী জনগণের কমিউনিস্ট শিক্ষাদীক্ষার গুরুত্ব থেকে আসছে কমিউনিস্ট পার্টির বর্ধিত ভূমিকা।

আগেকার সমস্ত সামাজিক-আর্থনীতিক ব্যবস্থা থেকে এটা পৃথক। কমিউনিস্ট সমাজ গড়ে-বেড়ে ওঠে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পার্টির পরিচালিত জনগণের সচেতন ক্রিয়াকলাপের মধ্য দিয়ে। কমিউনিজম-নির্মাতাদের সমগ্র বহুমুখী ক্রিয়াকলাপ পরিচালিত ক'রে কমিউনিস্ট পার্টি সেটাকে সংগঠিত, পরিকল্পিত এবং বিজ্ঞানসম্মত করে তোলে। সমগ্র জনগণের অগ্রগামী বাহিনী, শ্রমজীবী জনগণের বিস্তৃততম অংশের সঙ্গে অটুট ঐক্যের বলে মহাবলীয়ান, সবচেয়ে অগ্রসর বিজ্ঞানসম্মত তত্ত্ব মার্কসবাদ-লেনিনবাদ দিয়ে সুসজ্জিত এবং সামাজিক বিকাশের নিয়মাবলি সম্বন্ধে উপলব্ধিসম্পন্ন কমিউনিস্ট পার্টি ঐ ভূমিকা পালন করে।

সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ২৪ম কংগ্রেসে পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির বিবরণে সংগতভাবেই বলা হয়েছে, নতুন সমাজ গড়ার কাজে কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বের প্রশ্নটা মার্কসবাদী-লেনিনবাদী এবং সমস্ত রকমের সংশোধনবাদীদের মধ্যে সংগ্রামে একটা চূড়ান্ত গুরুত্বসম্পন্ন বিষয় হয়ে উঠেছে। সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির নীতিনিষ্ঠ মতাবস্থান, মার্কসবাদী-লেনিনবাদী মতবাদের বিশুদ্ধতার জন্যে এই পার্টির আপসহীন সংগ্রাম আন্তর্জাতিক তাৎপর্যসম্পন্ন, সেটা কমিউনিস্টদের এবং কোটি-কোটি শ্রমজীবী মানুষের নির্ভুল পথনির্দেশ করে, এটা বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে বলেছে ভ্রাতৃপ্রতিম পার্টিগুলি।

সমাজতান্ত্রিক আর্থনীতিক বিশ্বব্যবস্থা

১। সমাজতান্ত্রিক বিশ্বব্যবস্থা কীভাবে গড়ে উঠল

সমাজতান্ত্রিক বিশ্বব্যবস্থার উদ্ভব এবং বিকাশ

সোভিয়েত ইউনিয়নে সমাজতন্ত্রের বিজয়ের ফলে পুঁজিতান্ত্রিক আর্থনীতিক ব্যবস্থার পাশাপাশি দেখা দিল সমাজতান্ত্রিক আর্থনীতিক ব্যবস্থা। আর, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে আরও অনেকগুলি দেশে সমাজতন্ত্রের বিজয়ের ফলে সমাজতন্ত্র হয়ে উঠল একটা বিশ্বব্যবস্থা।

সমাজতান্ত্রিক বিশ্বব্যবস্থার উদ্ভব এবং সংহতির ফলে সারা পৃথিবীতে সমাজতন্ত্র এবং পুঁজিতন্ত্রের মধ্যেকার পারস্পরিক শক্তি-সম্পর্ক অনেকটা বদলে গেল। সমাজতন্ত্র একটা বিশ্বব্যবস্থা হয়ে দাঁড়াল — এতে পুঁজিতন্ত্রের ইতিহাসনির্দিষ্ট বিনাশ প্রদর্শিত হল লক্ষণীয়ভাবে। এলো দুই সমাজব্যবস্থার মধ্যে সংগ্রামের একটা নতুন পর্ব, — এই সংগ্রাম হয়ে উঠেছে পুঁজিতন্ত্রের সাধারণ সংকটের প্রধান উপাদান। আমাদের একালের প্রধান দ্বন্দ্ব — বিকাশমান সমাজতন্ত্র এবং মৃতকল্প পুঁজিতন্ত্রের মধ্যেকার দ্বন্দ্ব — প্রবেশ করেছে নতুন, উচ্চতর পর্বে। সমাজতান্ত্রিক বিশ্বব্যবস্থা মানবসমাজের বিকাশে নিষ্পত্তিকর উপাদান হয়ে উঠছে — এটাই আজকের পৃথিবীর প্রধান বিশেষক উপাদান। এটা হল সামাজিক বিকাশের চলতি পর্বে ইতিহাসের স্বাভাবিক গতির ফল।

সমাজতান্ত্রিক বিশ্বব্যবস্থা হল সমাজতন্ত্র এবং কমিউনিজমের দিকে এগিয়ে চলা স্বাধীন সার্বভৌম দেশগুলির একটা সামাজিক, আর্থনীতিক এবং রাজনীতিক গোষ্ঠী, — স্বার্থ আর লক্ষ্যের অভিন্নতা এবং সমাজতান্ত্রিক আন্তর্জাতিকতার সম্পর্ক দিয়ে তারা ঐক্যবদ্ধ। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির আর্থনীতিক বনিয়াদ একই রকমের — উৎপাদনের উপকরণে সাধারণের মালিকানা, একই রকমের রাষ্ট্রব্যবস্থা — শ্রমিক শ্রেণীর পরিচালিত জনগণের শাসন, একই মতাদর্শ — মার্কসবাদ-লেনিনবাদ, সাম্রাজ্যবাদী হস্তক্ষেপ থেকে বৈপ্লবিক সাধনসাফল্যগুলি এবং জাতীয় স্বাধীনতা রক্ষা করার অভিন্ন স্বার্থ, চূড়ান্ত লক্ষ্য একই — কমিউনিজম।

সমাজতান্ত্রিক বিশ্বব্যবস্থাই সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রামে নিষ্পত্তিকর শক্তি। মুক্তির জন্যে সংগ্রামরত সমস্ত শক্তিকে অপরিহার্য সহায়তা দেয় এই বিশ্বব্যবস্থা। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে এবং তাদের মধ্যে সম্পর্কের ক্ষেত্রে বিভিন্ন সুদূরপ্রসারী গুণগত পরিবর্তনের ফলে সমাজতান্ত্রিক বিশ্বব্যবস্থা ক্রমাগত আরও শক্তিশালী হয়ে উঠছে, তার আন্তর্জাতিক ভূমিকা বৃহত্তর হয়ে উঠছে।

সোভিয়েত ইউনিয়ন কমিউনিজম গড়ার কাজের কালপর্যায়ে প্রবেশ করেছে। বেশির ভাগ সমাজতান্ত্রিক দেশে অর্থনীতিতে একাধিক ক্ষেত্র আর নেই, সমাজতন্ত্রের বনিয়াদ সৃষ্টি করা হয়েছে। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির মধ্যে ভ্রাত্রোচিত সহযোগিতা এবং পারস্পরিক সহায়তার সর্বাঙ্গীণ বিকাশ ঘটেছে। সমাজতান্ত্রিক বিশ্বব্যবস্থার ক্রমবর্ধমান পরাক্রম এর দেশগুলির রাজনীতিক এবং সামাজিক-আর্থনীতিক সাধনসাফল্যগুলির অলঙ্ঘনীয়তার নিশ্চায়ক।

সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে বিভিন্ন বৈপ্লবিক রূপান্তরের

ফলে, সমাজের শ্রেণীগত গঠনের মূলগত পরিবর্তন ঘটে গেছে। আরও শক্তিশালী হয়ে উঠেছে শ্রমিক শ্রেণী আর কৃষককুলের মৈত্রী। মানুষের উপর মানুষের শোষণের আর্থনীতিক বনিয়াদ খতম হয়ে গেছে।

সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে জীবনযাত্রার মান সমানে উন্নীত হয়ে চলেছে — এটা পুঁজিতন্ত্রের উপর সমাজতন্ত্রের শ্রেষ্ঠত্বের একটা প্রত্যয়জনক প্রমাণ।

মানবজাতির আরও বিকাশের উপায়াদি নির্ধারণের জন্যে চূড়ান্ত তাৎপর্যসম্পন্ন বিপুল অভিজ্ঞতা জমিয়ে তুলেছে সমাজতান্ত্রিক বিশ্বব্যবস্থা। এখন, একটিমাত্র দেশের নয়, অনেকগুলি দেশের অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে প্রমাণিত হয়েছে যে, বৈপ্লবিক উপায়ে পুঁজিতান্ত্রিক ব্যবস্থার জায়গায় সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা অবশ্যম্ভাবী, দেখা গেছে সমাজতন্ত্রের চূড়ান্ত শ্রেষ্ঠত্ব।

১৯৬৯ সালে অনুষ্ঠিত কমিউনিস্ট এবং শ্রমিক পার্টিগুলির আন্তর্জাতিক সম্মেলন থেকে বলা হয়েছিল: 'সাম্রাজ্যবাদ থেকে উদ্ধার পাবার সম্ভাবনা দেখিয়ে দিয়েছে সমাজতন্ত্র। উৎপাদনের উপকরণে সাধারণের মালিকানা এবং শ্রমজীবী জনগণের ক্ষমতার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত এই নতুন সমাজব্যবস্থা জনগণের স্বার্থে অর্থনীতির পরিকল্পিত, সংকটমুক্ত বিকাশ নিশ্চিত করে; নিশ্চিত করে শ্রমজীবী জনগণের সামাজিক এবং রাজনীতিক অধিকারসমূহ; সাচ্চা গণতন্ত্র, সমাজের পরিচালনায় জনগণের যথার্থ অংশগ্রহণ, ব্যক্তির সর্বাঙ্গীণ বিকাশ এবং জাতিসমূহের সমান অধিকার আর মৈত্রীর উপযোগী অবস্থা সৃষ্টি করতে সক্ষম। বাস্তবেই প্রমাণিত হয়েছে যে, মানবজাতির সামনেকার মৌলিক সমস্যাগুলোর সমাধান করতে পারে একমাত্র সমাজতন্ত্রই।'

সমাজতান্ত্রিক এবং পুঁজিতান্ত্রিক বিশ্বব্যবস্থার মধ্যে মৌলিক পার্থক্যগুলো

সমাজতান্ত্রিক বিশ্বব্যবস্থার উদ্ভব হয়েছে এবং তার বিকাশ ঘটছে পুঁজিতান্ত্রিক বিশ্বব্যবস্থা থেকে একেবারে ভিন্ন উপায়ে। ক্রমাগত বেশিসংখ্যক দেশকে পুঁজিতান্ত্রিক বিশ্ববাজারের ঘূর্ণিস্রোতের মধ্যে টেনে নিয়ে এবং সারা পৃথিবীতে পুঁজিতান্ত্রিক শোষণের সম্পর্কের প্রসার ঘটিয়ে পুঁজিতন্ত্র একটা বিশ্বব্যবস্থা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কোন-কোন দেশের উপর অন্যান্য দেশের আর্থিক আধিপত্য এবং বহু কোটি-কোটি মানুষের উপর মুষ্টিমেয় সাম্রাজ্যবাদী শক্তির ঔপনিবেশিক দাসত্ব পুঁজিতান্ত্রিক বিশ্বব্যবস্থার আর্থনীতিক সম্পর্কগুলোর বৃদ্ধি ঘটিয়েছিল।

সমাজতন্ত্র একটা বিশ্বব্যবস্থা হয়ে উঠল কতকগুলো দেশে পুঁজিতান্ত্রিক শোষণের সম্পর্ক দূর করে এই দেশগুলির মধ্যে নতুন সম্পর্ক স্থাপন করার ফলে, এটা হল বন্ধুত্বের সহযোগিতা এবং ভ্রাত্রোচিত পারস্পরিক সহায়তার সম্পর্ক। পৃথিবীতে সমাজতন্ত্র দেখা দিল কতকগুলি দেশের একটা সংহত গোষ্ঠী হিসেবে — এই দেশগুলির মধ্যে সম্পর্কের বনিয়াদ হল মার্কসবাদ-লেনিনবাদের নীতিগুলি, প্রলেতারীয় আন্তর্জাতিকতা।

পুঁজিতন্ত্র জাতিগুলিকে বিভক্ত করে, কিন্তু সমাজতন্ত্র তা করে না, — পূর্ণ সমানতা, বন্ধুত্বসুলভ সহযোগিতা এবং পারস্পরিক সহায়তার ভিত্তিতে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তুলে সমাজতন্ত্র জাতিগুলিকে সম্মিলিত করে। সমাজতান্ত্রিক বিশ্বব্যবস্থাটাকে আরও শক্তিশালী করে তোলাতে অংশগ্রহণ করে সমস্ত সমাজতান্ত্রিক দেশ। সোভিয়েত ইউনিয়নের

অস্তিত্ব, তার অভিজ্ঞতা এবং সহায়তা আন্তর্জাতিক সমাজতান্ত্রিক গোষ্ঠীর অন্যান্য দেশে সমাজতন্ত্র গড়ার কাজ অনেকটা সহজ করে দেয়।

আগে-না-জানা, নতুন আন্তর্জাতিক রাজনীতিক, আর্থনীতিক এবং সাংস্কৃতিক সম্পর্ক মূর্ত হয়েছে সমাজতান্ত্রিক বিশ্বব্যবস্থার মধ্যে। সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন-সম্পর্কের প্রকৃতি থেকেই এবং সমাজতন্ত্রের আর্থনীতিক নিয়মাবলি থেকে তার উদ্ভব।

সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির ঐক্য এবং সংহতি সমাজতন্ত্রের সাধনসাফল্যগুলির একটা নিশ্চয়তা

সমাজতান্ত্রিক বিশ্বব্যবস্থাটা তার অঙ্গ-দেশগুলির সমষ্টিমাত্র নয়। মানবজাতির জীবনে এটা মূলগতভাবেই নতুন একটা ব্যাপার, সেটা সমাজতন্ত্রের বিপুল পরাক্রমবৃদ্ধি ঘটিয়েছে। সেই ১৯২০ সালেই লেনিন অতি চমৎকার ভবিষ্যদ্বাণী করে দেখিয়েছিলেন ‘একক বিশ্ব অর্থনীতি সৃষ্টি হবার দিকে ধারাটা, সে-অর্থনীতি সমস্ত দেশের প্রলেতারিয়েতের দ্বারা একটা অখণ্ড সমগ্র সত্তা হিসেবে এবং একই পরিকল্পনা অনুসারে নিয়ন্ত্রিত। এই ধারাটা পুঁজিতন্ত্রের আমলেই ইতোমধ্যে বেশ স্পষ্ট দৃষ্টিগোচর হচ্ছে, সেটা সমাজতন্ত্রের আমলে আরও বিকশিত এবং পূর্ণাঙ্গ হয়ে উঠবেই।’

এই ধারাটা মূর্ত হয়েছে সমাজতান্ত্রিক বিশ্বব্যবস্থার মধ্যে, এই বিশ্বব্যবস্থাটা পৃথিবীজোড়া সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির অগ্রদূত। সমাজতান্ত্রিক বিশ্বব্যবস্থার দৃঢ়তা এবং অলঙ্ঘনীয়তার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটা হেতু হল ভ্রাতৃপ্রতিম সমাজতান্ত্রিক

দেশগুলির পরস্পরের নিকটবর্তী হবার প্রক্রিয়াটা, তাতে অবশ্য কিছু কিছু বাধাবিঘ্ন নেই, এমন নয়।

কমিউনিজমে পেঁছবার পথ চিহ্নিত করে দিয়ে সোভিয়েত ইউনিয়ন সমগ্র সমাজতান্ত্রিক গোষ্ঠীর কমিউনিজমের দিকে অগ্রগতিটাকে সহজতর এবং ত্বরিত করছে। সোভিয়েত ইউনিয়নে কমিউনিজম গড়ার কাজ সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির বিশ্ব গোষ্ঠীর আর্থনীতিক পরাক্রম এবং প্রতিরক্ষাক্ষমতা বাড়িয়ে তুলছে। সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশের মধ্যে আর্থনীতিক এবং সাংস্কৃতিক সহযোগিতা গভীরতর করার, এইসব দেশকে সহায়তা এবং সমর্থন যোগাবার ক্রমাগত বেশি অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি করছে এই কমিউনিস্ট নির্মাণকাজ। এইভাবে, সোভিয়েত ইউনিয়নে কমিউনিজম গড়ার কাজ পুরোপুরিই সমস্ত সমাজতান্ত্রিক দেশের চূড়ান্ত গুরুত্বসম্পন্ন স্বার্থের অনুযায়ী।

সমাজতান্ত্রিক বিশ্বব্যবস্থার ঐক্য মজবুত করে তোলার প্রয়োজনটাকে ধরে এগিয়ে চলেছে সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টি এবং অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশের মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পার্টিগুলি। সাম্রাজ্যবাদের চক্রান্তগুলোর বিরুদ্ধে, সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি করার সাম্রাজ্যবাদী অপচেষ্টার বিরুদ্ধে, সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলিকে পরস্পরের বিরুদ্ধে লাগিয়ে দিয়ে এবং সাম্রাজ্যবাদী অন্তর্ঘাতকেরা, যার সুযোগ নিচ্ছে সেই জাতীয়তাবাদ চাগিয়ে তুলে — এই রাষ্ট্রগুলির ঐক্য ক্ষুণ্ণ করতে সচেষ্ট সংশোধনবাদী এবং সংস্কারবাদীদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের মধ্যে গড়ে উঠছে এই ঐক্য।

২। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির আর্থনীতিক সহযোগিতা এবং পারস্পারিক সহায়তা

সমাজতান্ত্রিক আন্তর্জাতিক শ্রমবিভাগ

সমাজতান্ত্রিক বিশ্বব্যবস্থার বিকাশের ভিতর দিয়ে উদ্ভূত হয়েছে একটা নতুন ধরনের আন্তর্জাতিক শ্রমবিভাগ।

সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির বিস্তৃত আর্থনীতিক, বৈজ্ঞানিক এবং প্রযুক্তিগত সহযোগিতার ধারায় বিকশিত হচ্ছে সমাজতান্ত্রিক আন্তর্জাতিক শ্রমবিভাগ। সমাজতান্ত্রিক বিশ্বব্যবস্থার প্রত্যেকটি দেশের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য, প্রাকৃতিক সম্পদ এবং যোগ্যতাসম্পন্ন কর্মিবাহিনীর প্রাপ্তিসাধ্যতার বিষয় এতে বিবেচনায় রাখা হয়। প্রত্যেকটি সমাজতান্ত্রিক দেশে এবং সমগ্রভাবে সমাজতান্ত্রিক বিশ্বব্যবস্থায় আর্থনীতিক এবং সাংস্কৃতিক জোয়ার দ্রুততর করতে এই শ্রমবিভাগ বহুলাংশে সহায়ক।

সমাজতান্ত্রিক আন্তর্জাতিক শ্রমবিভাগ সামাজিক উৎপাদনের ফলপ্রদতা বাড়িয়ে তুলছে এবং বৈজ্ঞানিক আর প্রযুক্তিগত অগ্রগতি ত্বরিত করছে, এইভাবে সমস্ত সমাজতান্ত্রিক দেশে চড়া হারে অর্থনীতির বৃদ্ধি এবং জীবনযাত্রার মানের উন্নতি ঘটাচ্ছে।

আন্তর্জাতিক সমাজতান্ত্রিক শ্রমবিভাগের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে, পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদনের অরাজকতার জায়গায় সমাজতন্ত্রের কায়েম করা সচেতন, যুক্তিসম্মত আর্থনীতিক ব্যবস্থাপনের পরিধি বিস্তৃততর হচ্ছে। এর ফলে, প্রত্যেকটি সমাজতান্ত্রিক দেশের এবং গোটা বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক গোষ্ঠীর শক্তি বেড়ে চলছে। প্রলেতারীয় আন্তর্জাতিকতা এবং

ভ্রাত্রোচিত পারস্পরিক সহায়তার লেনিনীয় নীতিগুলির ভিত্তিতে আন্তর্জাতিক সমাজতান্ত্রিক শ্রমবিভাগের সুবিধাগুলোকে ক্রমাগত বেশি-বেশি করে কাজে লাগাবার ফলে সমাজতান্ত্রিক বিশ্বব্যবস্থার শক্তি বাড়ছে।

সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির মধ্যে আর্থনীতিক সহযোগিতার বিকাশ

সমাজতান্ত্রিক বিশ্বব্যবস্থার বৃদ্ধি এবং শক্তিসঞ্চয়ের সঙ্গে সঙ্গে, এই বিশ্বব্যবস্থার অঙ্গ-দেশগুলির মধ্যে আর্থনীতিক সহযোগিতা বিকশিত হচ্ছে এবং তার রূপ হয়ে উঠছে ক্রমাগত বেশি নিখুঁত। গোড়ায় এই দেশগুলির আর্থনীতিক সহযোগিতার প্রধান রূপ ছিল দ্বিপক্ষীয় বহির্বাণিজ্য এবং বৈজ্ঞানিক আর প্রযুক্তিগত বিনিময়। কোন-কোন দেশকে অন্যান্য দেশের দেওয়া ক্রেডিট রূপের সহায়তাও চলত ক্রমাগত বেশি-বেশি পরিমাণে।

সমাজতান্ত্রিক বিশ্বব্যবস্থার বৃদ্ধি ঘটে চলার সঙ্গে সঙ্গে, দেখা দিল অন্যান্য রূপের আর্থনীতিক সহযোগিতা। ১৯৪৯ সালে স্থাপিত 'পারস্পরিক আর্থনীতিক সহায়তা পরিষদ' এ ব্যাপারে ক্রমাগত বৃহত্তর ভূমিকায় আসতে থাকল। এই 'পরিষদ' ভ্রাতৃপ্রতিম দেশগুলির মধ্যে আর্থনীতিক, বৈজ্ঞানিক এবং প্রযুক্তিগত সহযোগিতা উন্নয়নের বিভিন্ন সুপারিশ রচনা করে এবং শিল্প, পরিবহণ, বাণিজ্য, আর্থ যোগসূত্র এবং কারেন্সি হিসাবনিকাশের নতুন-নতুন রূপ নির্ধারণ করে।

সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির আর্থনীতিক উন্নয়ন পরিকল্পনা সংসাধন, বৈজ্ঞানিক আর প্রযুক্তিগত অগ্রগতি এবং জীবনযাত্রার মানের সমানে উন্নতির জন্যে এই দেশগুলির মধ্যে আর্থনীতিক সহযোগিতা এবং ভ্রাত্রোচিত

পারস্পরিক সহায়তার অবদান বিপুল। সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে এবং নিজেদের মধ্যে বিস্তৃত আর্থনীতিক সহযোগিতার কল্যাণে ইউরোপীয় সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি ইতিহাসের নিরিখে স্বল্প সময়ের মধ্যে নিজেদের কয়লা আর ধাতু শিল্প গড়তে পেরেছে, স্থাপন করেছে নিষ্কর্ষী শিল্পের বহু শাখা, বিদ্যুৎশক্তি শিল্প এবং ইঞ্জিনিয়রিং আর রাসায়নিক শিল্পের কোন-কোন নতুন শাখা। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগোষ্ঠীতে উৎপাদনের পরিসর বেড়ে গেছে, ডজন-ডজন নতুন শাখা স্থাপিত হয়েছে, হাজার-হাজার নতুন ধরনের জিনিস বিপুল পরিমাণে উৎপাদন করা হয়েছে।

পুঁজিতন্ত্রের সঙ্গে আর্থনীতিক প্রতিযোগিতায় সমাজতন্ত্রের শক্তি বাড়াবার জন্যে একটা প্রবল উপাদান হল সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির আর্থনীতিক সহযোগিতা। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির আর্থনীতিক সহযোগিতা এবং পারস্পরিক সহায়তা দৃঢ়তর এবং সম্প্রসারিত করার যৌথ প্রচেষ্টার সঙ্গে প্রত্যেকটি সমাজতান্ত্রিক দেশের অর্থনীতি উন্নয়নের ব্যবস্থাবলি সমন্বিত করার ভিতর দিয়ে সমাজতান্ত্রিক বিশ্ব অর্থনীতির আরও ঊর্ধ্বগতি ঘটানো হচ্ছে।

সমাজতান্ত্রিক বিশ্বব্যবস্থার যা বৃদ্ধি ঘটছে, তাতে আর্থনীতিক আর রাজনীতিক দিক দিয়ে ভ্রাতৃপ্রতিম দেশগুলির পরস্পরের আরও কাছাকাছি এসে পড়া দরকার হচ্ছে। তাদের জাতীয় আর্থনীতিক পরিকল্পনাগুলির সমন্বয় এবং ১৯৭০ সালে ‘পারস্পরিক আর্থনীতিক সহায়তা পরিষদে’ গৃহীত সমাজতান্ত্রিক আর্থনীতিক একীকরণের আরও বিকাশের দীর্ঘমেয়াদী বহুমুখী কর্মসূচির ভিত্তিতে ঐ কাজটা করা হচ্ছে।

সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির আর্থনীতিক সহযোগিতার প্রধান-প্রধান ধরন

সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির মধ্যে আর্থনীতিক সহযোগিতার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ধরনগুলির মধ্যে আছে: পারস্পরিক বাণিজ্য, উৎপাদনে বিশেষীকরণ এবং সহযোগ, বৈজ্ঞানিক এবং প্রযুক্তিগত বিনিময়, বিভিন্ন রকমের উৎপাদনের যৌথ সংগঠন।

সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির মধ্যে আর্থনীতিক সহযোগিতার ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ একটা স্থানে রয়েছে উৎপাদনে বিশেষীকরণ এবং সহযোগের উদ্দেশ্যে নেওয়া ব্যবস্থাবলি। প্রত্যেকটি অংশগ্রহণকারীর স্বার্থের সঙ্গে পুরোপুরি সংগতি রাখার ভিত্তিতেই গড়ে-বেড়ে চলেছে উৎপাদনে সমাজতান্ত্রিক বিশেষীকরণ এবং সহযোগ। উৎপাদনে বিশেষীকরণ এবং সহযোগে প্রাকৃতিক সম্পদের আরও সুষ্ঠু সদ্ব্যবহার হয়, প্রত্যেকটি দেশের অর্থনীতিতে বল সঞ্চারিত হয় আরও বেশি মাত্রায়, সংশ্লিষ্ট প্রত্যেকটি দেশে যেসব শিল্পের জন্যে পরিবেশ সবচেয়ে অনুকূল, সেগুলিকে আরও দ্রুত হারে সম্প্রসারিত করা যায়। এর ফলে, উৎপাদনকর সামর্থ্য এবং দক্ষ কর্মিবাহিনীর সবচেয়ে যুক্তিসম্মত সদ্ব্যবহারের সুযোগ আসে, টেকনিকাল মান এবং উৎপাদনের পরিধি বাড়ে, অ্যাসেম্বলি-লাইন এবং বিপুল-ধারাবাহিক উৎপাদন সংগঠিত হয়।

সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে প্রযুক্তিগত অগ্রগতি ত্বরিত করতে এই দেশগুলির বৈজ্ঞানিক এবং প্রযুক্তিগত সহযোগিতা চূড়ান্ত গুরুত্বসম্পন্ন। সমাজতান্ত্রিক বিশ্বব্যবস্থার সম্পদ-সংস্থানের যুক্তিসম্মত সদ্ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্যে

একটা গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হয়ে উঠছে তত্ত্বগত আর ফলিত গবেষণা এবং ডিজাইনের ক্ষেত্রে তাদের প্রচেষ্টার সমন্বয়।

সমাজতান্ত্রিক বিশ্বব্যবস্থা থাকার ফলে, সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি বিভিন্ন জটিল কাজ সমাধা করতে পারে যৌথ প্রচেষ্টায়।

সোভিয়েত ইউনিয়ন, পোল্যান্ড, জার্মান গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র, চেকোস্লোভাকিয়া এবং হাঙ্গেরির মধ্যে পাতা 'দ্রুঝবা' (মৈত্রী) নামে বিশাল তৈলবাহী নলপথটির নির্মাণ হল সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির মধ্যে আর্থনীতিক সহযোগিতার একটা বিশেষ লক্ষণীয় দৃষ্টান্ত। ভলগার তৈল নলপথে ওদার, ভিস্তুলা আর দানিউবের তীরে পাঠাতে খরচা পড়ে রেলপথের খরচার একটা ভগ্নাংশমাত্র। এই নলপথ ব্যবহারকারী প্রত্যেকটি দেশ এই বিশাল প্রকল্প নির্মাণে নিজ অংশ দিয়েছে।

সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির আর্থনীতিক উন্নয়নের মাত্রা কাছিয়ে আসছে

সমাজতান্ত্রিক বিশ্বব্যবস্থার অস্তিত্ব, ভ্রাতৃপ্রতিম দেশগুলির মধ্যে আর্থনীতিক সহযোগিতার বিকাশ এবং আন্তর্জাতিক সমাজতান্ত্রিক শ্রমবিভাগের কল্যাণে এই দেশগুলির আর্থনীতিক মানের মধ্যেকার তফাতটাকে ঘুচিয়ে দেবার বাস্তব সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে, — ঐ তফাত এইসব দেশ পেয়েছিল পুঁজিতান্ত্রিক আমল থেকে।

বৃহৎ এবং ক্ষুদ্র দেশগুলির পূর্ণ সমানতাই সমাজতান্ত্রিক আন্তঃরাষ্ট্রীয় সম্পর্কের ভিত্তি। পারস্পরিক সহায়তা এবং অভিজ্ঞতা বিনিময়, বিশেষত, বৈজ্ঞানিক আর প্রযুক্তিগত

সাধনসাফল্যগুলির পারস্পরিক বিনিময়, এবং প্রাকৃতিক সম্পদ উন্নয়নের ক্ষেত্রে সহযোগিতার ফলে, সমাজতান্ত্রিক বিশ্বব্যবস্থার দেশগুলির আর্থনীতিক উন্নয়নের মাত্রা পরস্পরের কাছাকাছি এসে যাচ্ছে।

আগে-অনগ্রসর দেশগুলি সমাজতান্ত্রিক বিশ্বব্যবস্থার কাঠামের মধ্যে স্বল্প সময়েই অগ্রসর সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির মাত্রার অনেকটা কাছাকাছি এসে গেছে — সেটা ঘটল এই অগ্রসর দেশগুলির সহায়তার কল্যাণে। কিন্তু, সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে উৎপাদন-বলগুলির উন্নয়নের মাত্রা এখনও একই নয়। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির সাধারণ আর্থনীতিক মান উন্নীত করে পরস্পরের কাছাকাছি এনে ফেলার কাজটা করা হচ্ছে প্রধানত নিম্নলিখিত উপায়ে: প্রত্যেকটি দেশের আভ্যন্তরিক সম্পদ-সংস্থানের পূর্ণ সদ্ব্যবহার, আর্থনীতিক ব্যবস্থাপনের ধরন আর প্রণালীর উন্নতিবিধান, সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনের লেনিনীয় নীতি আর প্রণালীগুলির সামঞ্জস্যপূর্ণ প্রয়োগ, সমাজতান্ত্রিক বিশ্বব্যবস্থার সুবিধাগুলোর ফলপ্রদ সদ্ব্যবহার।

৩। দুই বিশ্বব্যবস্থার মধ্যে আর্থনীতিক প্রতিযোগিতা

দুই ব্যবস্থার মধ্যে শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানের নীতি এবং আর্থনীতিক প্রতিযোগিতা

পুঁজিতন্ত্র থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের প্রক্রিয়াটা ইতিহাসের একটা দীর্ঘকালপর্যায় জুড়ে। এই সময়ে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলি থাকছে পুঁজিতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির পাশাপাশি। পরস্পরবিরোধী দুই সমাজব্যবস্থার যুগপৎ অস্তিত্ব

একটা অকাট্য ঐতিহাসিক বাস্তবতা — সমসাময়িক যুগের একটা বিষয়গত অনিবার্য ব্যাপার। তার থেকে প্রশ্ন ওঠে: বিভিন্ন সমাজব্যবস্থাসম্পন্ন দেশগুলির মধ্যে সম্পর্কটা হবে কী রকম?

মার্কসবাদ-লেনিনবাদ এই শিক্ষাই দেয় যে, বিভিন্ন সমাজব্যবস্থাসম্পন্ন দেশগুলোর মধ্যে শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানের লেনিনীয় নীতিই সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির পালন করা চাই অবিচলিতভাবে। এই নীতিতে এটা বিবেচনায় আছে যে, প্রত্যেকটা দেশের মানুষ তাদের সমাজব্যবস্থা বেছে নেবে স্বাধীনভাবে। কোন-একটা দেশের ভিতরকার অবজেক্টিভ এবং সাবজেক্টিভ অবস্থা পুঁজিতন্ত্র থেকে সমাজতন্ত্রে এগিয়ে যাবার পক্ষে পরিপক্ক হলে, একমাত্র তবেই সে-দেশ ঐভাবে এগিয়ে যায়।

সঙ্গে সঙ্গে, শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানের নীতি উৎপীড়ক এবং উৎপীড়িতের মধ্যে সম্পর্কের ক্ষেত্রে খাটে না, তাও সুস্পষ্ট। বুর্জোয়া আর প্রলেতারিয়েতের মধ্যে শ্রেণীসংগ্রামের ক্ষেত্রে, উপনিবেশ আর নির্ভরশীল দেশগুলির জাতীয়-মুক্তি সংগ্রামের ক্ষেত্রে, সমাজতান্ত্রিক আর বুর্জোয়া মতাদর্শের মধ্যে সংগ্রামের ক্ষেত্রে কোন শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান হতে পারে না। শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানের নীতিতে বুঝায় যে, আলোচ্য দেশগুলির মধ্যে সাধারণ-স্বাভাবিক আর্থনীতিক সম্পর্ক গড়ে-বাড়িয়ে তোলা সম্ভব এবং আবশ্যক। তদনুসারে, সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি পুঁজিতান্ত্রিক ব্যবস্থার দেশগুলির সঙ্গে পরস্পরের সুবিধাজনক ধারায় আর্থনীতিক সম্পর্ক গড়ার পক্ষে, তাতে কোন বৈষম্য থাকবে না, কোন পক্ষের অধিকারসংকোচন চলবে না।

সহ-অবস্থান বলতে বুঝায় দুই বিশ্বব্যবস্থার মধ্যে শান্তিপূর্ণ আর্থনীতিক প্রতিযোগিতা। অর্থনীতিই শুধু

নয় — সমাজজীবনের অন্যান্য দিকও জুড়ে এই প্রতিযোগিতা। তবে, এই প্রতিযোগিতার প্রধান ক্ষেত্রটা অর্থনীতিই।

দুই ব্যবস্থার মধ্যে আর্থনীতিক প্রতিযোগিতার বিকাশ

সমাজতন্ত্র এবং পুঁজিতন্ত্রের মধ্যে আর্থনীতিক প্রতিযোগিতা চলে আসছে দুটো প্রধান পর্বের ভিতর দিয়ে। সোভিয়েত ইউনিয়ন যখন ছিল পৃথিবীর একমাত্র সমাজতান্ত্রিক দেশ, তাকে পুঁজিতান্ত্রিক দুনিয়ার বিরুদ্ধে প্রতিযোগিতা চালাতে হত একারই চেষ্টায়, সেটা ছিল প্রথম পর্ব। তারপরে, একটামাত্র দেশের গণ্ডি পেরিয়ে সমাজতন্ত্র হয়ে উঠল একটা বিশ্বব্যবস্থা, পুঁজিতন্ত্র এবং সমাজতন্ত্রের মধ্যে প্রতিযোগিতাটা হয়ে দাঁড়াল দুই বিশ্বব্যবস্থার মধ্যেকার প্রতিযোগিতা — সেই হল দ্বিতীয় পর্বের শুরু।

সোভিয়েত ইউনিয়নে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে সমাজতান্ত্রিক আর্থনীতিক ব্যবস্থা পুঁজিতন্ত্রের সঙ্গে প্রতিযোগিতার সেই প্রারম্ভিক পর্বেই নিজ শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করেছিল। দ্বিতীয় পর্বে, ভৌগোলিক এবং আর্থনীতিক পরিধির বিপুল প্রসারের ফলে, এই প্রতিযোগিতার কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য দেখা দিল। অতি স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠল সমাজতন্ত্রের সুবিধা এবং সাফল্যগুলি। এবার আর সোভিয়েত ইউনিয়নের আর্থনীতিক জয়গুলিই শুধু নয়, সমাজতান্ত্রিক গোষ্ঠীর সমস্ত দেশেরই আর্থনীতিক নির্মাণকাজে অগ্রগতি এবং তাদের মধ্যেকার নতুন ধরনের সম্পর্ক দেখিয়ে দিচ্ছে উৎপাদন-বলগুলোর দ্রুত বৃদ্ধি আর উন্নতির জন্যে

সমাজতান্ত্রিক আর্থনীতিক ব্যবস্থায় অন্তর্নিহিত সম্ভাবনা কী বিপুল।

দুই সমাজব্যবস্থার মধ্যে প্রতিযোগিতা এবং সংগ্রামের অবস্থায় সমাজতন্ত্রের বৈষয়িক বলগুলোর বৃদ্ধি বজায় রাখা চূড়ান্ত গুরুত্বসম্পন্ন। সমাজজীবনের সমস্ত ক্ষেত্রে সাম্রাজ্যবাদের উপর বিজয় দ্রুত সংসাধন এবং সংহত করার জন্যে তার গুরুত্ব অপরিসীম।

সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সবার একই সংগ্রামে সমাজতান্ত্রিক বিশ্বব্যবস্থার প্রধান অবদান হল তার ক্রমবর্ধমান আর্থনীতিক পরাক্রম। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির দ্রুত আর্থনীতিক অগ্রগতি, যা পুঁজিতান্ত্রিক দেশগুলির চেয়ে ত্বরিত, বৈজ্ঞানিক আর প্রযুক্তিগত অগ্রগতির কোন-কোন ক্ষেত্রে সমাজতন্ত্রের সর্বাগ্রবর্তী অবস্থান, সোভিয়েত ইউনিয়নের মহাকাশের পথ চিহ্নিত করে দেবার ঘটনা, এসব সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির মানুষের সৃজনশীল ক্রিয়াকলাপের ফল, তা সাম্রাজ্যবাদের শক্তিগুলোর বিরুদ্ধে এবং শান্তি, গণতন্ত্র আর সমাজতন্ত্রের শক্তিগুলির অনুকূলে পাল্লা ভারি করে দেবার নিষ্পত্তিকর উপাদান।

উন্নয়নশীল দেশগুলিকে আর্থনীতিক সহায়তা

সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার দেশগুলি আর ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যগুলোর ধ্বংসস্তূপের উপর গড়ে ওঠা নবীন সার্বভৌম রাষ্ট্রগুলির মধ্যে দ্রুত বেড়ে চলা আর্থনীতিক সহযোগিতা দুই সমাজব্যবস্থার মধ্যে আর্থনীতিক প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে ক্রমাগত বেড়ে চলা একটা ভূমিকায় এসে গেছে। সমাজতান্ত্রিক বিশ্বব্যবস্থার অস্তিত্ব এবং সাম্রাজ্যবাদের শক্তিহানির ফলে, এই

দেশগুলির যুগযুগান্তরের অনগ্রসরতা আর গরিবি কাটিয়ে ওঠা এবং আর্থনীতিক স্বাধীনতা অর্জন করা সহজতর হয়ে উঠছে।

আর্থনীতিক উন্নয়নের হারে সমাজতন্ত্র রয়েছে আগে-আগে, বৈজ্ঞানিক আর প্রযুক্তিগত অগ্রগতির কতকগুলি মূল বিভাগে সমাজতন্ত্র পুঁজিতন্ত্রকে ছাড়িয়ে গেছে — এটা নবীন সার্বভৌম দেশগুলির পক্ষে বিরাট গুরুত্বসম্পন্ন। উৎপাদনের উপকরণের যোগান দেওয়া এবং টেকনিকাল সহায়তা, ঋণ, ক্রেডিট, ইত্যাদি দেবার ক্ষেত্রেও অগ্রসর পুঁজিতান্ত্রিক দেশগুলির একচেটিয়া ছিল, সেটা ঐ হেতু অতীতের ব্যাপার হয়ে গেছে।

নবীন সার্বভৌম রাষ্ট্রগুলি, যারা রাজনীতিক স্বাধীনতা অর্জন করেছে দীর্ঘ কঠোর সংগ্রামের ভিতর দিয়ে, তারা ক্রমবর্ধমান আর্থনীতিক সহায়তা এবং সর্বতোমুখী সমর্থন পাচ্ছে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির কাছ থেকে। ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার ভয়ঙ্কর উত্তরাধিকার কাটিয়ে ওঠার জন্যে এইসব দেশের সামনে যেসব জরুরী সমস্যা দেখা দেয়, সেগুলির সমাধানে ঐ সহায়তা বিশেষ গুরুত্বসম্পন্ন।

সমাজতান্ত্রিক বিশ্বব্যবস্থার দেশগুলি নবীন সার্বভৌম রাষ্ট্রগুলিকে যোগায় আবশ্যক যন্ত্রপাতি এবং অন্যান্য জিনিস, সরঞ্জাম কেনার জন্যে এবং টেকনিকাল সহায়তা বাবত দেনা মেটাবার জন্যে অনায়াসের শর্তে ক্রেডিট দেয়। সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র থেকে এইসব দেশকে দেওয়া সহায়তায় কোনরকমের রাজনীতিক কিংবা সামরিক শর্ত থাকে না।

সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সঙ্গে নবীন সার্বভৌম দেশগুলির বন্ধুত্বের সম্পর্ক

এই দেশগুলির মুক্তি আর স্বাধীনতা মজবুত করার জন্যে, সামাজিক প্রগতির পথ ধরে এগোবার জন্যে একটা নিষ্পত্তিকর উপাদান। সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি দেশে-দেশে জনগণকে আবার পদানত করতে সচেষ্ট রয়েছে, আর তার বিপরীতে, সমাজতান্ত্রিক বিশ্বব্যবস্থার দেশগুলি ঔপনিবেশিক দাসত্ব থেকে জাতিগুলির মুক্তির প্রক্রিয়াটিকে আন্তরিকভাবে সমর্থন করছে, এটাকে তারা পুঁজিতান্ত্রিক শোষণের জগৎটার পতনের জন্যে প্রয়োজনীয় একটা মুখ্য পূর্বাবস্থা বলে মনে করে।

পাঠকদের প্রতি

বইটির বিষয়বস্তু, অনুবাদ ও অঙ্গসজ্জার বিষয়ে আপনাদের মতামত পেলে প্রকাশালয় বাধিত হবে। অন্যান্য পরামর্শও সাদরে গ্রহণীয়।

আমাদের ঠিকানা:

প্রগতি প্রকাশন, ২১ জুবোভস্কি বুলভার, মস্কো, সোভিয়েত ইউনিয়ন

Progress Publishers 21, Zubovsky Boulevard Moscow,
Soviet Union